ভক্ত-প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তগোস্বামী

অর্থাৎ

শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীলোকনাথ গোস্বামী

এবং

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

এই

সপ্ত গোস্বামীর জীবনবৃত্ত

—:০:—

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র-সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

১৯২৭

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী,
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
শ্রীনারসিংহ প্রেসে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

যত্র নামে সাদরে উৎসর্গ করিলাম। তাহার
উৎ যে নির্ব্বিঘ্ন সাধকদিগের দৈন্যমণ্ডিত মধুর
লেখনী-মুখে চিত্রিত করিবার প্রয়াস
দৌলতপুর কলেজে ...নের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আপনার
প্রথিতযশা উকীল, ... ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল;
...ও তাহা আছে; তাঁহারাও
অগ্রজ-প্রতিম পূজনীয়, ... তপোবন করিয়া

মহামহাধ্যাপক

শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী

এম, এ, বি, এল মহোদয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

মহাত্মন্

আজ ত্রিশ বৎসর গত হইল, একটি দিনের কথা ভুলিতে পারি নাই। সে ১৩০৩ সালের আষাঢ় মাস, ২৯শে, রবিবার, রথযাত্রার দিন। ঐ দিন আপনার এক পত্র পাইয়া আমি রাজসাহী হইতে ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় আসিতে ছিলাম। সে পত্রে দুই এক ছত্রে কিছু আশ্বাস-বাণী ছিল, তাহা দরিদ্র-সন্তানের নৈরাশ্যময় জীবনে কিছু আশার আলোক দিয়াছিল। সেদিন ষ্টীমারের পাটাতনে বসিয়া আমরা যখন কান্তকবির নিজমুখের কোমলকান্ত গল্পলহরী শুনিতে শুনিতে মহানন্দে বিভোর ছিলাম, এমন সময়ে পদ্মার বক্ষে পক্ষিবৎ উড়িয়া আসিতে আসিতে, বেলা ২টার সময় আমাদের সেই ষ্টীমারখানি একটি চড়ায় ঠেকিয়া অচল হইল; অমনি যাত্রিগণের ভিতর তুমুল কাতর কোলাহল উত্থিত হইল। যত দূর চক্ষু যায়, কিছুক্ষণ কোন যান মাত্র আমাদের নেত্র-পথে পড়িল না। অবশেষে আমরা চাদর ঘুরাইয়া ডাকিতে ডাকিতে

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী
নেং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

বড় খালি নৌকা ষ্টীমারের
যাত্রীর যাইবার স্থান ছিল
ধবা সঙ্গে স্ত্রীলোক বা শিশু
লোক কোন প্রকারে জিনিষ-
র্ঘনিশ্বাসের লক্ষ্য স্থল হইয়া, সেই
দামুকাদিয়া ঘাটের দিকে যাত্রা করিলাম।

ায়, তখন আকাশতল কৃষ্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন হইল, দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে অশনিপাত হইতে লাগিল। ছাতির তলে ভিজিতে ভিজিতে আমরা কখনও বিপদ-সঙ্কুল কূলের কাছে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের নিম্ন দিয়া, কখনও বীচি-বিক্ষুব্ধ পদ্মাবক্ষের মধ্য-স্থল দিয়া, তীব্রবেগে ছুটিতে ছিলাম; কিন্তু সূচীভেদ্য অন্ধকারে কোথায় যাইতে ছিলাম জানি না, জীবনের আশা কাহারও ছিল না। শ্রীভগবানকে আমি মনে মনে ডাকিতে ডাকিতে শুধু ভাবিতে ছিলাম, আমার নিজ জীবনও সেইরূপ তরঙ্গাকূল, কূল কখনও পাইব কিনা, ভরসা নাই। কিন্তু দয়াময়ের অপার করুণায় অবশেষে বাত্যা থামিল, রাত্রিশেষে অতি কষ্টে কূলও পাইলাম, আসিলাম কলিকাতায়। আপনি স্নেহের কোলে আশ্রয় দিলেন, সোদর-স্নেহে প্রতিপালন করিলেন। জীবনে কোন দিন সে কথা ভুলি নাই। আপনার চরণ প্রান্তও কখনও ছাড়ি নাই। আপনারই প্রদর্শিত আদর্শের পাছে চলিতেছি, আপনারই সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠানের সৌষ্ঠব ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনের জন্য জীবন ভরিয়া প্রাণপণে খাটিতেছি, এবং দেহের বল জলের মত ব্যয় করিলেও কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি নাই। আজ সেই একটি দিনের কথা স্মৃতিপথে লইয়া, আমার যাবতীয় শিক্ষা ও দীক্ষা, শক্তি ও সাধনা, বিপুল শ্রম ও গভীর গবেষণার নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ আপনার পবিত্র নামে সাদরে উৎসর্গ করিলাম। তাহার আর একটি কারণ এই, যে নির্ব্বিণ্ণ সাধকদিগের বৈরাগ্যমণ্ডিত মধুর চরিত্র-কথা ইহাতে অশক্ত লেখনী-মুখে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, ত্যাগই তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আপনার কর্ম্ম-কল্লোলময় গার্হস্থ্য-জীবনও সেই ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল; তাঁহাদেরও যেমন শাস্ত্রনিষ্ঠা ছিল, আপনারও তাহা আছে; তাঁহারাও যেমন সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শনের জন্য বৃন্দাবনকে তপোবন করিয়াছিলেন, আপনিও সেই আদর্শের অনুসরণে তপোবনের উদ্বোধন-কল্পনা লইয়া জীবন যাপন করিতেছেন। ধ্যানই কার্য্যের নিয়ামক, কৃতকার্য্যতা ভাগ্যায়ত্ত। এক্ষণে আপনি স্বকীয় উদারতা-গুণে, আপনার চিরাভ্যস্ত স্নেহের প্রশ্রয়ে আশ্রিত দাসের এই ভক্তির উপহার গ্রহণ করিলে, কৃতার্থ হইব।

দৌলতপুর (খুলনা)
১লা পৌষ, ১৩৩৩

প্রণত
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

ভূমিকা।

"ভক্ত-প্রসঙ্গ" গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। বৎসরাধিক-কাল মুদ্রাযন্ত্রের গ্রাসে থাকিয়া এই পুস্তক আজ্ লোক-লোচনের পথবর্ত্তী হইতে চলিল। যাঁহারা নব বৃন্দাবনের প্রকৃত উদ্ভাবন-কর্ত্তা, যাঁহারা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বৃন্দারণ্যে গিয়া ভক্তির আবাদ করিয়াছিলেন, যাঁহারা তীর্থোদ্ধার, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং শাস্ত্রসঙ্কলন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃন্দাবন-প্রবাসী সুবিখ্যাত সর্ব্বত্যাগী সাধনভজন-নিরত গোস্বামীদিগের মধ্যে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী এবং ষড়্গোস্বামী নামে পরিচিত শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ দাস—এই ভক্তাগ্রগণ্য সপ্তগোস্বামীর সুমধুর জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই গ্রন্থে একত্র সঙ্কলন করিতে একান্ত চেষ্টা করিয়াছি। চেষ্টা করিয়াছি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না এবং আমার চেষ্টা করাও নিতান্ত অনধিকার-চর্চ্চা, ইহাই প্রকৃত কথা। আমি একান্ত অভাজন, বৈষ্ণবতার হিসাবে অনাচারী এবং অনধিকারী, এবং বিষয়ের গুরুত্বের হিসাবে মূর্থ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ; এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আমি পদে পদে মর্ম্মে মর্ম্মে ইহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া নিয়ত আক্ষেপ করিয়াছি। আমি বিনয়ের অনুরোধে একথা বলিতেছি না, সত্যের অনুরোধে অকপট ভাবে ইহা প্রকাশ করিতেছি। যে অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা, যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও শাস্ত্র-সন্ধান ব্যতীত নির্ব্বিণ্ণ নৈষ্ঠিক ভক্ত-গণের সংগোপিত চরিত্র প্রকটিত করা যায় না, আমার তাহা নাই। সুতরাং আমি যতই সতর্ক ও সচেষ্ট থাকি না কেন, যতই সাধ্যাতীত ভাবে বিপুল পরিশ্রম বা গভীর সূক্ষ্মানুসন্ধান করি না কেন, আমার লিখিত গ্রন্থে যে নানাবিধ বৈষ্ণবাপরাধ, সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস

ঘটিতে পারে বা ঘটিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তজ্জন্ত আমি যুক্তকরে, সাশ্রুনেত্রে ও বিনীত বচনে সকল ভক্ত পাঠকের নিকট কৃপা-ভিখারী। আশাকরি, তাঁহারা আমার সর্ব্ববিধ ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, সকলপ্রকার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিবার উপদেশ দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

প্রধানতঃ তিনটি কারণে আমি এই ভক্ত-প্রসঙ্গে হস্তার্পণ করিয়াছি। প্রথমতঃ উপন্তাস-প্লাবিত আধুনিক বঙ্গে যদি পাঠকদিগের চিত্ত এই জাতীয় ভক্ত-চরিত্রের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্যে কিছু চেষ্টা করিয়াছি। আজকাল আমাদের দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র মাসে মাসে রাশি রাশি উপন্তাস ও গল্পগুজবের পুস্তক প্রসব করিতেছে; মাসিক পত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষুদ্র গল্পে পূর্ণ থাকে; রঙ্গিন চিত্রে শোভিত ও তরলভাষায় লিখিত কত সুলভ সংস্করণের গল্পের বই রেলযাত্রীর পথশ্রান্তি বিদূরিত ও চক্ষুঃ-ক্লান্তি বিবর্দ্ধিত করিতেছে। সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশের মত রেলওয়ের উপন্তাস রেলপথের পরিসমাপ্তির সঙ্গে পরিত্যক্ত হয় না; দরিদ্র বাঙ্গালী উহা গৃহে লইয়া স্বজনকে উপহার দেন এবং নিজে উহার গরল আত্মগত ও আদর্শগত করেন; জাতিধর্ম্ম বা শালীনতার গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া কত উলঙ্গ ও অসামাজিক বিচিত্র চিত্র আমাদিগকে চমকিত করে, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না করিয়া প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়, ধর্ম্মপথের দিগ্দর্শন না দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথ উন্মুক্ত করে। এই জন্ত সাহিত্য বা সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইতেছে। উচ্চাঙ্গের উপন্তাস যে দুই চারিখানি লিখিত হইতেছে না বা উহা পাঠ করা দোষাবহ, তাহা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই, উপন্তাস-পাঠকের বুভুক্ষা খাস্ত ব্যতীত নিবৃত্ত হইবে না, কিন্তু সে খাস্ত এমন হওয়া চাই, যাহাতে আদর্শ সংরক্ষিত এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগরিত হয়। সে ক্ষেত্রে ভক্ত-চরিত্রই একমাত্র সাধন এবং

উহা নীরস না হইয়া উপন্যাসের মত সরস ও সরল ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। আমি সেই জাতীয় চেষ্টা করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থে বৈষ্ণব ভাগবতদিগের চরিত্র-কথা শুনাইতে গিয়া বিপুল বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি বঙ্গীয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার সুযোগ হইতে পারে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব-সাহিত্যের মত এমন সমৃদ্ধভাণ্ডার জগতের অপর কোন সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। এই বৈষ্ণব-সাহিত্য অশ্রুজলের কালীতে লেখা, সে লেখায় যেমন আছে, ভক্ত-হৃদয়ের তেমন অকপট অভিব্যক্তি, তেমন সত্যনিষ্ঠা, তেমন অবিমিশ্র ভক্তি-কাহিনী, তেমন ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালীর আত্ম-গৌরবের এমন নিদর্শন আর নাই। প্রসঙ্গক্রমে আমি সর্ব্বত্রই সংক্ষিপ্ত দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া আদর্শের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছি। উহাতে কোনও ধর্ম্মপিপাসুর চিত্তও যদি এই সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রবর্ত্তিত হয়, আপনার চির গৌরবময় সম্পদ চিনিয়া লইবার প্রবৃত্তি জাগে, তাহা হইলে আমার সকল চেষ্টা সার্থক হইবে।

তৃতীয়তঃ এই সকল চরিত্র চিত্রণ করিতে গিয়া পরকে নূতন কিছু শিক্ষা দিব, এমন দুরাকাঙ্ক্ষা আমি করি নাই; এই আলোচনা দ্বারা আমি নিজের আত্মশুদ্ধিই কামনা করিয়াছি। মহাজনদের চরিত্র গৌরদীপ্ত চন্দনের মত আপনিই সমুজ্জ্বল; উহা দেখিতে বা বুঝিতে গেলেই উহার প্রভায় আপনার চিত্তের ঘনীভূত অন্ধকার অন্ততঃ কতকাংশে দূরীভূত করিবার সুযোগ ঘটিতে পারে, এই জন্যই আমার এই ক্ষুদ্রপ্রয়াস। যাহা হউক, যে কারণেই বা যে ভাবেই আমি এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি না কেন, আমার দুর্ব্বলতা আমি জানি, সুধীবর্গ আমার দুরভিমানের জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন! অগ্নিতে পুড়িয়া কৃষ্ণ লৌহও রক্তবৎ হয়, উহা লৌহের গুণ নহে, অগ্নিরই প্রভাব-শক্তি, এই মাত্র আমার ভরসা।

আর একটি কারণে আমি সপ্তগোস্বামীর অন্ততঃ প্রথম তিন জনের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। আমি যে যশোহর-খুলনার ইতিহাসের লুপ্ত গৌরবের অনুসন্ধানে জীবনপাত করিয়াছি, এই তিনজন সেই প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। প্রথমতঃ হরিদাস ঠাকুরের জন্মপল্লী খুলনা জেলায় এবং তাঁহার সাধনাসন ছিল যশোহরে; এজন্য তাঁহার জীবন-কাহিনীই ভক্ত-প্রসঙ্গ গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড। এই দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর জন্ম-গৌরবে যশোহর জেলার একটি নগণ্য পল্লী পবিত্র হইয়াছিল এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের বসতিও একসময়ে যশোহরের অন্তর্গত প্রেমভাগ গ্রামে ছিল। শ্রীজীব গোস্বামী উহাদেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। এই জন্য যশোহর-খুলনার ঐতিহাসিক স্বরূপেও এই কয়েক-জনের জীবনী আমার আলোচ্য ছিল।

আমি সপ্তগোস্বামীর জীবনবৃত্ত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু অলৌকিক চারিত্র গৌরবে ইহাদের জীবন এমন উজ্জ্বল প্রতিভা-সম্পন্ন যে, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি উহাদের সান্নিধ্যলাভ করিতে সমর্থ নহে। আমি দূর, অতিদূর হইতে ইঁহাদের চরিত্র দেখিয়াছি। উত্তুঙ্গ শৈলমালা দর্শনকালে যেমন নিকটে গেলে সম্পূর্ণ প্রকৃত দৃশ্য কাহারও নয়ন-পটে সম্যক্ প্রকটিত হয় না, উহাদিগকে উড্ডীয়মান পক্ষীর চক্ষু দিয়া দূর হইতে দেখিতে হয়, নতুবা সমগ্র দৃশ্যের মোটামুটি জ্ঞান হইতে পারে না, আমিও সেইভাবে এই চরিতমালা দূর হইতে দেখিয়াছি; ফলতঃ সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিশিষ্ট অনুভূতি না হইলেও, যতই অস্পষ্ট হউক, বিরাট বিষয়ের একটা ক্ষীণাভাসমাত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকগণ সেই দূরদৃষ্টিলভ্য ক্ষীণাভাস গ্রহণ করিয়া, তৎপরে সাধ্যমত নিজ নিজ চেষ্টায় এক একটি চিত্রের নিকটবর্ত্তী হইবেন। যদি আমার গ্রন্থ কাহাকেও দূর হইতে চিত্র দেখাইয়া, নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি ধন্য হইব।

দূর হইতে দেখিলে, শৈল-শ্রেণীর মত আমার এই সপ্তগোস্বামীর সকল চিত্রই একই ভাবে উন্নত বা বিস্তৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সকলেই সর্ব্বত্যাগের গৌরবে প্রতিভাময়, দৈন্যের বেশে, কঠোরতার অলঙ্কারে এবং জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত; সকলে সমান না হউন, পণ্ডিত সকলেই বটে, ভক্তাগ্রগণ্য সকলেই সত্য। কিন্তু শাস্ত্রতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনা লইয়া সকলে একনিষ্ঠ থাকিলেও, এই সাতজনের প্রত্যেকের এক এক বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে। উঁহাদের এক এক ভাবের নিষ্ঠা দেখিয়া, প্রত্যেককে এক প্রকার চিহ্নিত করিতে পারি। শ্রীলোকনাথের ঐকান্তিক সেবা-নিষ্ঠা, শ্রীসনাতনের অকুণ্ঠিত শাস্ত্র-নিষ্ঠা, শ্রীরূপের প্রগাঢ় রসমাধুর্য্য-নিষ্ঠা, শ্রীশ্রীজীবের গভীর তত্ত্ব-নিষ্ঠা, শ্রীগোপাল ভট্টের সুতীব্র আচার-নিষ্ঠা, শ্রীরঘুনাথ ভট্টের একাগ্র ভাগবত-নিষ্ঠা এবং সর্ব্বশেষে শ্রীরঘুনাথ দাসের কঠোর ভজন-নিষ্ঠা—এই নৈষ্ঠিক ভক্ত সাধকদিগকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে পাঠকগণ উহার আভাস পাইবেন।

আমি বৎসরাধিক কাল ধরিয়া শয়নে স্বপনে, এমন কি পানাহার কালেও এই দেবতা কয়েকটির চিন্তা করিয়াছি, ধ্যান করিয়াছি, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র গুলির স্বরূপ-চিত্র কল্পনা-নেত্রে দর্শন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সময় ও ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য ও সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থকারগণের প্রমাণোক্তি ব্যতীত কিছু লিপিবদ্ধ করি নাই। যতক্ষণ সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই, ক্ষুদ্রবৃহৎ বহুগ্রন্থ ও বিভিন্ন মত লইয়া বিচার করিয়াছি, হয়ত একটি কথার জন্য দুইদশ দিনের মধ্যেও কিছু লিখিতে পারি নাই। প্রমাণ স্বরূপ স্থানে স্থানে অনেক গ্রন্থের ভাষা মূল প্রবন্ধে বা পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি, বিস্তার ভয়ে দীর্ঘ প্রস্তাবনার অবতারণা না করিলেও

আকর-স্থানের পরিচয় স্পষ্টভাবে দিয়াছি। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সে সব স্থানের সম্পূর্ণ অংশ পাঠ করিলে স্বকীয় ধারণা স্থিরীকৃত করিতে পারিবেন। কোন কোন স্থলে সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিচার-ক্রম না দেখাইয়া সংক্ষেপে সরল ভাষায় বিচার ফল-মাত্র দিয়াছি। কারণ, সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করারই জন্য আমি বিষয়ের অনুপাতে যত সহজ ভাবে আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে পারি, সাধ্যমত তাহার ত্রুটি করি নাই। যদি কোন স্থলে একটি প্রসঙ্গের সম্যক্ ধারণা জন্মাইবার নিমিত্ত কিছু অবান্তর তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকি, তাহা আবশ্যক বোধেই করিয়াছি, পাণ্ডিত্যের ব্যপদেশে করি নাই। কারণ, আমার মত আর কেহ জানেন না যে, আমি পণ্ডিত নহি, সাধারণ গল্প-লেখক মাত্র। সে গল্প রচনা মহাজন দিগের পদানুসরণ করিয়া যত সরল ভাষায় করিতে পারি, তাহার অন্যথা করি নাই। কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কিনা, তাহার বিচারক সহৃদয় সুধীবর্গ।

এই সাতজন মহাপুরুষের জীবনবৃত্ত লিখিতে গিয়া আমাকে উঁহাদের পারিপার্শ্বিক আরও অনেক ভক্তের প্রসঙ্গ তুলিতে হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনীও বৈচিত্র্যময়, অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ এবং ভক্ত-সমাজের আদর্শ স্থানীয়। উঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী যুগকে অসাধারণ ভাবে আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী। শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে প্রকারান্তরে ব্রজ মণ্ডলের গুরুস্থানীয় করিয়া বসাইয়া ছিলেন; তাঁহারই শিষ্য শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতারের মত বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করেন। শ্রীলোক-নাথ গোস্বামী সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দাবনে গিয়া অসংখ্য তীর্থোদ্ধার করিয়া নব বৃন্দাবনের প্রথম পত্তন আরম্ভ করেন; তাঁহারই একমাত্র প্রিয়-

ষ্য নরোত্তম ঠাকুর অকর্ষিত এবং প্রতপ্ত উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে ভক্তির ন্যা প্রবাহিত করেন। শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনে প্রধানতঃ তত্ত্ব-মাংসায় ব্যস্ত থাকিলেও তদীয় শিষ্য শ্যামানন্দ পশ্চিম বঙ্গ ও উড়িষ্যায় হু পতিত জনের উদ্ধারকর্ত্তা হন। সপ্ত গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর ঙ্গদেশীয় ভক্ত-কবিরা প্রধানতঃ এই তিন জনের জীবন কথাকে মুখ্য বিষয় করিয়া ভক্তিরত্নাকর" "প্রেম-বিলাস", "কর্ণানন্দ" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। অথচ সাধারণ পাঠক দিগের জন্য বঙ্গ-ভাষায় এই তিন প্রধান ভক্তের সংযোগ-সম্বন্ধ বিবৃত করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থ প্রচারিত হয় নাই। আমার এই রোগক্লিষ্ট, জরাতুর ও ক্লান্ত জীবনে যদি সময়ে কুলায়, ভক্ত-প্রসঙ্গ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া ক খণ্ডে এই ত্রিমূর্ত্তির চিত্র-রচনা করিবার একান্ত বাসনা আছে। উহা পূর্ণ হইবে কিনা, যিনি পূর্ণ করিবার একমাত্র কর্ত্তা, তিনিই বলিতে পারেন। বর্ত্তমান খণ্ডে প্রসঙ্গতঃ যতটুকু দরকার, আমি তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীরূপ সনাতনের মত অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত ও কবিদিগের অতীব দুরূহ গ্রন্থ নিচয়ের সমালোচনা করা কোনক্রমে আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, অথচ জীবন-বৃত্তের সম্পূর্ণতার অনুরোধে উহার কিছু আভাষ না দিলে চলে না। সুতরাং স্থূলকথায় সেই মহামনাষী দিগের উদ্দেশ্যেরও যতটুকু আমি বুঝিতে পারিয়াছি, অতি সংক্ষেপে তাহাই মাত্র দিয়াছি। সাধারণ পাঠকদিগের জন্যই এই ভক্ত-চরিত লিখিত, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতের জন্য নহে। তবে বিষয়ানুরূপ করিবার উদ্দেশ্যে ভাষার যতটুকু গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়, আমি তাহারই চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। করিতে গিয়া ভাষা যাহাতে নীরস কর্কশ না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছি, ফল আমার শক্তি এবং ভাগ্যের অনুরূপই হইয়াছে, তাহার উপর আমার

কোন কথা নাই। বিনয়ের খনি কবিরাজ গোস্বামী যাহা অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন, আমার বেলায় তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

"আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী।"

আমিও সেইরূপ এই ভক্ত-চরিত্র-সমুদ্রের কণামাত্র পান করিবার প্রয়াসী হইয়া এই ক্ষুদ্র চরিতাখ্যায়িকা লিখিয়াছি ইহাতে আমার কৃতিত্বের পরিচয় কিছু নাই, অনর্থক আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট আছে। যে শাস্ত্র জ্ঞানের বলে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া চলে, যে লিপি-কুশলতার ফলে হৃদয়ের আবেগময়ী ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে হয়, তাহার বিন্দুমাত্রও আমার নাই, ইহাই বারংবার বলিতেছি। আমি সভয়ে সজলনেত্রে দেবতার প্রতীকে তুলিকার্পণ করিয়াছিলাম, গ্রন্থ-সমাপ্তি কালেও বুঝিতে পারিতেছি না, চিত্রকার্য্য কোনক্রমে শেষ হইল কিনা। ভক্ত-পাঠকেরা কৃপা করিয়া অস্পৃশ্যের এই স্পর্শাপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি নির্বিষ্ট পাঠকের পদরেণু মস্তকের ভূষণ করিয়া ধন্য হইব।

এই গ্রন্থ-রচনা কালে আমি যে সকল মহাগ্রন্থের আলোচনা করিয়াছি, যাহা হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া আত্মমত সমর্থন বা গঠন করিয়াছি, তাহার উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বত্র যথাস্থানে আছে, পৃথক্ দিবার প্রয়োজন দেখি না। গ্রন্থোক্ত কোন কোন চরিত্র লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় যে সব নাটক নভেল রচিত হইয়াছে, তৎপ্রতি আমি দৃষ্টি করি নাই বটে, কিন্তু জীবন-চরিত রূপে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক ভক্তলেখকগণ কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আমি দেখিয়াছি কোন কোন গ্রন্থ হইতে আমি ঋণ গ্রহণ করিয়াছি এবং তজ্জন্য সেই সকল গ্রন্থকার বা প্রবন্ধ-লেখকদিগের নিকট নিরতিশয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কাহারও কোন ব্যক্তিগত অনুকূল মতের সন্ধান পাইলে, তাহা মাথায় করিয়া লইয়া

স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছি। আমার আকর-গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মতই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছি; উহার অভাব হইলে তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী ভক্তজনাদৃত অন্য গ্রন্থের শরণাপন্ন হইয়াছি। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ত বটেই, ঈশান নাগর-কৃত শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ এবং জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলও উল্লেখযোগ্য; আর পরবর্ত্তী যুগের নরহরি চক্রবর্ত্তি-প্রণীত "ভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তম-বিলাস", নিত্যানন্দ দাস-বিচরিত "প্রেম-বিলাস", মনোহর দাস কৃত "অনুরাগবল্লী" কৃষ্ণদাসকর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত "ভক্তমাল" এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে মহাত্মা শিশির কুমারের "অমিয় নিমাই চরিত", "নরোত্তম-চরিত" ও "প্রবোধানন্দ-গোপাল ভট্ট" এবং শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ কৃত "শ্রীমৎদাস গোস্বামী", ভক্ত-লেখক শ্রীঅচ্যুত বাবুর "গোপালভট্ট-চরিত" আমার পথ-প্রদর্শকরূপে সমাদর করিয়াছি। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত-লিখিত "বৃন্দাবন-কথা" এবং শ্রীব্রজমোহন দাস-প্রকাশিত "শ্রীব্রজদর্পণ" আমাকে অনেক সন্ধান দিয়া চিরানুগৃহীত করিয়াছে। উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত সকল গ্রন্থাধিকারীর নিকটই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিতেছি।

একান্ত ইচ্ছা এবং প্রভূত চেষ্টা থাকিলেও আমি এই মুদ্রিত গ্রন্থকে সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় মুদ্রাকরের পক্ষে বোধ হয় তাহা সম্ভবপর নহে। পুস্তকখানি বৎসরাধিক কাল যন্ত্রস্থ ছিল। সব সময়েই যে ছাপার কার্য্য চলিয়াছে তাহা নহে, মুদ্রাকরের সুযোগ মত সময়ে সময়ে দৈবক্রমে কয়েক ফর্ম্মা করিয়া কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। আমাকে বহুদূরে মফস্বলে বসিয়া প্রতি ফর্ম্মার দুইটি করিয়া প্রুফ নিজেই দেখিতে হইয়াছে এবং দ্বিতীয় প্রুফের সঙ্গে মুদ্রণের আজ্ঞা দিতে

হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে শেষ ভুলগুলি সম্পূর্ণ সংশোধিত হইল কিনা, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পারি নাই। দুই একটি অক্ষরের বিচ্যুতি যাহা হইয়াছে, পাঠকেরা সহজে ধরিতে পারিবেন। কিন্তু কয়েক স্থলে তারিখের ভুল ঘটিয়াছে, তজ্জন্য শুধু মুদ্রাকর নহে, আমি নিজেও দায়ী। বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা অতীব দুষ্কর ব্যাপার। স্থলে স্থলে উহার সমাধানই করিতে পারি নাই, তবে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কয়েকটি বিশেষ ভ্রান্তির কথা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, পাঠকেরা উহা সংশোধন করিয়া পড়িবেন।* আমার অজ্ঞাতসারে বা অজ্ঞানতা দোষে আরও নানাবিধ ভ্রান্তি যে ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। সহৃদয় পাঠকবর্গ দয়া করিয়া জানাইলে বারান্তরে সবিচারে উহা সংশোধন করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই, এই গ্রন্থ রচনা কালে অশেষ ভক্তিভাজন লোকনাথ-বংশাবতংস মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহোদয় নিয়ত আমাকে আশীষ ও আশ্বাস দানে উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য ভক্তিপ্রণত হইয়া তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কতিপয় পাঠকেরও এবম্বিধ ভক্ত-চরিত পাঠে প্রবৃত্তি হয়, আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

দৌলতপুর কলেজ
১লা পৌষ, ১৩৩১

ভক্তচরণ সভয় শরণাগত
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

* ৯১ পৃ ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "১৪৩৮ শক, ১৫১৭ খৃঃ" স্থলে ১৪৩৭ শক, ১৫১৬ খৃঃ হইবে; ১২২ পৃঃ নোটের শেষ পংক্তিতে এবং ২৪১ পৃঃ ৬ষ্ঠ পংক্তিতে ১৫০৪ স্থলে ১৫০০ হইবে। ১৭১ পৃঃ ১ম পংক্তিতে "শ্রীরূপ" স্থলে শ্রীসনাতন এবং ২য় পংক্তিতে "সাক্ষাৎ পাইয়া"র পর "শ্রীরূপ" বসিবে। ২৪৬ পৃঃ ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "দূরীকরণ" স্থলে "দৃঢ়ীকরণ" এবং ২৫৮ পৃঃ নোটে ৩য় পংক্তিতে "১৫১৮ শকে" হইবে।

সূচী-পত্র।

বিষয় … পত্রাঙ্ক

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

“শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈক সেবাসম্পৎ সমন্বিতং।
পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথ প্রভুং ভজে॥”

উক্ত শূরসেন বংশীয় প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়নৃপতি যযাতির পুত্র যদুর অধস্তন যাদবগণ মথুরার অধিবাসী হন। ঐ যাদবদিগের বৃষ্ণি-শাখায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তথনকার মথুরার রাজা কংস যাদবদিগের ভোজ-বংশীয় অন্য শাখাভুক্ত। কংস ও শ্রীকৃষ্ণের সংঘর্ষকাল হইতে মথুরা ও বৃন্দাবন উভয় স্থানের প্রসিদ্ধি বাড়ে। বৃন্দাবন মথুরারই একাংশ বলিলে চলে। ইহা পূর্ব্বেও ছিল, এবং এখনও আছে; মধ্যে কতকাল ইহার কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। দ্বাপরযুগ হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলার আদি-ক্ষেত্ররূপে পুণ্যসলিলা যমুনার উভয় কূলে বহু দূর বিস্তৃত অসংখ্য পল্লীর রেণু-পরমাণু একরূপ অসামান্য পবিত্রতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অর্জ্জুন-পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়া ভ্রাতৃগণ সহ মহাপ্রস্থান করেন, তথন মথুরা-মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে তিনিই রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। বজ্রনাভ মাতৃ-আজ্ঞায় প্রপিতামহের স্মৃতি-পূজা চিরস্থায়ী করিবার জন্য, ৺গোবিন্দ, ৺মদন গোপাল ও ৺গোপীনাথ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহের সৃষ্টি করিয়া উঁহাদের পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল সমূহ তীর্থক্ষেত্ররূপে প্রকাশিত হয়। পরে সর্ব্বধ্বংসী কালের কঠোর হস্তের ক্রীড়া-কৌশলে কথন্ কি ভাবে সে কীর্ত্তি-চিহ্নগুলি বিধ্বস্ত হইয়া লোকলোচনের অন্তরাল-বর্ত্তী হয়, যুগযুগান্তরের অন্তরালে বসিয়া তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

দ্বাপর যুগ বিগত হইলে কলি আসিল। ক্রমে হিন্দুর ধর্ম্ম যজ্ঞসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল, কর্ম্মীর অভাবে যজ্ঞের ফলশ্রুতি বিফল হওয়ায় কর্ম্মকাণ্ড মজ্জাহীন হইতে লাগিল। বহুকাল পরে মগধে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম দেখা দিল; ত্যাগ ও অহিংসার আদর্শ দেশময় ব্যাপ্ত হইল। হিন্দুত্বের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষ চলিল, বৌদ্ধধর্ম্মের সংযম নিয়মের সহিত সেবাব্রতের

সম্মিলন হওয়ায় নূতন ভাব-তরঙ্গ পরবর্ত্তী কালে ভারত প্লাবিত করিয়া দেশ দেশান্তরে বিস্তারিত হইতে লাগিল। চৈনিক পরিব্রাজকেরা মথুরাকে বৌদ্ধনগরী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সংঘর্ষের ফলে হিন্দুর কত প্রাচীন তীর্থ শ্মশানে পরিণত হইল, কত নূতন স্থান বৌদ্ধ-পতাকার নিম্নে স্তূপ ও মন্দিরাদিরূপে শিরোত্তলন করিয়া গৌরব ঘোষণা করিল। মথুরা মণ্ডলে এই সংঘর্ষ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। হিন্দু বৌদ্ধের কলহ যে মথুরা-ধ্বংসের অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃন্দাবন কিন্তু পৌরাণিক যুগেও বনই ছিল। স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত মথুরাখণ্ডে দেখিতে পাই—

"বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দসমন্বিতম্ ॥"

আর ৮৪ ক্রোশ পরিমিত স্থান লইয়া এই বিশাল বন অবস্থিত। এখনও ইহার দ্বাদশটি বন ও চতুর্ব্বিংশ উপবন তীর্থস্থানে পরিণত। পূর্ব্বকালে এই সব বনভাগে মুনির আশ্রম ছিল, সাধকেরা নিজমনে সাধন ভজন করিতেন, আর জঙ্গলের মধ্যে আভীর প্রভৃতি অনুন্নত এবং অন্য বন্য-জাতির বাসভূমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। শেষে পশ্চিমসীমান্তের গিরিপথ দিয়া যখন মুসলমান-বাহিনী ধন লুণ্ঠনের প্রত্যাশায় দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল, মথুরা নগরীর উপকণ্ঠে বলিয়া সে সব আক্রমণের ফল বৃন্দাবনের উপর ফলিতেছিল। গজনীপতি মাহমুদ যখন বহুদিন ধরিয়া মথুরা লুণ্ঠন করেন, দেব-বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া দুর্ভেদ্য অভ্রভেদী মন্দির সমূহ ভূমিসাৎ করেন, তখন বৃন্দাবনও ফলভোগে বঞ্চিত হয় নাই। বৃন্দাবন-পরিক্রমার অন্তর্গত একটি বনের নাম মহাবন। উহার রাজা মাহমুদের নিকট পরাজিত ও পদানত হইয়াও রক্ষা পান নাই; তিনি যখন প্রজা-বর্গের দারুণ হত্যাকাণ্ড সম্মুখে দেখিলেন, তখন নিজ স্ত্রীপুত্রের হত্যাসাধন

করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা নিজের উদ্ধার সাধন করেন। সে দৃশ্য দেখিয়া বৃন্দাবন হইতে বহুলোক পলায়ন করে। ক্রমে পাঠানেরা দিল্লী গৌড় প্রভৃতি নানাস্থানে রাজতক্ত পাতিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের জঙ্গল আরও শ্বাপদ-সঙ্কুল হইয়া রহিল। তীর্থানুসন্ধিৎসু নির্ভীক সাধুরা ব্যতীত সে বনে আর কেহ ভ্রমণ করিতে আসিতেন না, সে জঙ্গলে শুধু বন্যেরাই বাস করিত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব যখন বৃন্দাবন দর্শনে আসেন, তখন বৃন্দাবন শুধু অরণ্যই ছিল। তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীতে বৃন্দাবনের যে রসময়ী ললিতকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেবল প্রেম-রসিকের কল্পনারই সামগ্রী। এখন যেমন শ্রীবৃন্দাবন নির্ব্বিঘ্ন ভক্ত সাধকের শেষাশ্রয়রূপে জনকোলাহলের মধ্যেও শান্তিনিকেতনে পরিণত হইয়াছে, পাঠান রাজত্ব-কালে তাহার সে দশা ছিল না।

বাঙ্গালীর একটা বড় গৌরবের কথা এই, তাঁহারাই বৃন্দাবনের বন-জঙ্গলের আবাদ করিয়া ভক্তির পত্তন করিয়াছিলেন। নির্ভীক বাঙ্গালী নাবিক একদিন ভারতসাগরীয় দ্বীপোদ্বীপে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে জানিতেন; সাগরপারস্থ বিদেশীকে ভাষা ও ধর্ম্ম দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে পারিতেন। নির্ভীক বাঙ্গালী কৃষক ব্যাঘ্রাদি-হিংস্র-সঙ্কুল সুন্দরবন আবাদ করিয়া এখনও শস্যক্ষেত্রে সোনা ফলাইতে জানেন। আর সেই অভিযানপরায়ণ বাঙ্গালী ভক্ত সুদূর অতীতের কুক্ষিতল হইতে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সমুদ্ধার করিয়া, মোক্ষফলের প্রাপ্তি-পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। কোন্ কালে কোন্ বলে বাঙ্গালী দুর্ব্বল, তাহা কেবল অতীত-বিমুখ লেখকগণেরই প্রগল্‌ভতার মন্তব্যগত।

বাঙ্গালী যখন এই নব বৃন্দাবনের সৃষ্টি করেন, তখন বাঙ্গালা দেশের এক সুবর্ণযুগ। পাঠান বিজয়ের উদ্দাম আক্রোশ প্রশমিত হইয়াছে;

পাঠান নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। তখন বিখ্যাত হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন; দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত; অন্নপণ্য সর্ব্বত্র সুলভ; শিল্পকলার সমধিক উন্নতিতে বঙ্গদেশ খ্যাত। হুসেনের রাজদরবার প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দু অমাত্য এবং কৃতী কবি ও পণ্ডিত দ্বারা সমলঙ্কৃত। নবদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি বহুস্থানের শিক্ষাসদনে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর জ্ঞান-পিপাসা মিটিতেছিল। বাঙ্গালী কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিল না। একমাত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে নানাবিধ ব্যভিচার ও অবনতি দেখা যাইতেছেল। এমন সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হইল। পরিণত বয়সে তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সকল সমস্যা ও সকল বিকারের অভিনব সমাধান হইয়াছিল। ইহাই, শুধু বঙ্গীয় কেন, ভারতীয় ইতিহাসের একটি নবযুগ। সে যুগে ইতিহাসের যে নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্থায়িভাবে বৃন্দাবনে বাস না করিলেও, তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই ব্যবস্থায়, তাঁহার প্রেরিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের একাগ্র চেষ্টায় শ্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালীর নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ঔপনিবেশিকদিগের একমাত্র সাধনা—ভক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবাদের ভিত্তিপত্তন এবং লীলা-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন।

সেই ঔপনিবেশিকদিগের অগ্রদূত হইয়াছিলেন—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী; ছায়ার মত তাঁহার সহচর ছিলেন, অন্য এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী। ক্রমে গৌড়াধিপের অমাত্যপদ পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল বেশে সেই বনবাসী হইয়াছিলেন সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং উঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিতকুলপতি শ্রীজীব গোস্বামী। দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বাঙ্গালী ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রকার ভক্তপ্রবর শ্রীগোপাল ভট্ট এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিলেন ভাগবত

শ্রীবৃন্দাবন ধাম

১ পৃঃ

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

নব বৃন্দাবনের পূর্ব্বকথা।

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। অতি প্রাচীনতম যুগ হইতে এদেশে আদি সভ্যতার প্রথম বিকাশ হইয়াছিল। অবস্থান ও অবস্থার গুণে, নিসর্গ সুন্দরীর সুদৃষ্টি-প্রভাবে এদেশের অধিবাসীকে আধ্যাত্মিক করিয়াছিল। তাহারই ফলে, এই দেশের রমণীয় শৈলসানুতলে, প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বতীর কূলে বা হাস্যময়ী প্রকৃতির চিরহরিত বৃক্ষবল্লরীর শীতল ছায়ায়, যখন যেখানে নানা ঘটনা-সূত্রে শ্রীভগবানের লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, সেই স্থানকেই পুণ্যতীর্থ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীর মত তীর্থদর্শনের পিপাসা কোন জাতির নাই। সেই পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া, প্রকৃতির বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রচ্ছদপটে ইষ্টমূর্ত্তির সত্তানুভব জন্য ভক্ত সাধকেরা তীর্থে তীর্থে সমবেত হইতেন, কত জনে সর্ব্বত্যাগী হইয়া সেইস্থানে ভবলীলা সমাপ্ত করিতেন। তাঁহাদের পদরেণুতে, তাঁহাদের নয়নাশ্রুতে, তাঁহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে তীর্থসমূহের শক্তিসম্পদ বৃদ্ধি পাইত, গৌরব-প্রতিভা পরাকাষ্ঠায়

পৌঁছিত। তীর্থসমূহের মৃত্তিকায় ও জল-বাতাসে ভক্ত-সম্প্রদায়ের বৈদ্যুতিক শক্তি অলক্ষ্যে লুকাইয়া থাকিত। যুগযুগান্তর ধরিয়া এই শক্তির সঞ্চয় হইত; তাই পরমপিতার কারুণ্য ও পক্ষপাতিতা এই সকল স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হইত। সেই সব প্রাচীন যুগে, গৃহী ধনজন ছাড়িয়া বনে আসিতেন, জীবনের অপরাহ্নে বনেই বাস করিতেন, তথায় জীবন শেষ করিতেন। অরণ্যেই এদেশের ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছিল, অরণ্যেই এদেশের সারগ্রন্থ "আরণ্যক" শাস্ত্র বা উপনিষদ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ঋষিগণের সভা বসিত নৈমিষারণ্যে, সাধুগণের সাধনপীঠ ছিল আনন্দকানন কাশীধামে বা শ্রীবৃন্দাবনে। এমন কত অরণ্য, কত বনই যে এদেশের সাধনাসন ছিল, তাহা বলিবার নহে। [এ]খানে আমরা বৃন্দাবনের কথাই বলিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবন হিন্দুভারতের একটি প্রধান তীর্থধাম। ইহা ব্রজমণ্ডল বা [প্র]াচীন শূরসেন রাজ্যের অন্তর্গত। এই প্রদেশে যখন পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির [বস]তি হয় নাই, তখন মধু নামে এক দৈত্য বাস করিত। এই মধুর [পু]ত্র লবণ মহারাজ রামচন্দ্রের রাজত্বকালে তদীয় ভ্রাতা শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক বিজিত ও নিহত হয়। তখন হইতে সেই মধু দৈত্যের নির্ম্মিত নগরী—[ম]ধুপুরী বা মধুরা আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থল হয় * এবং তথায় আর্য্যবংশীয় শূরসেন জাতির বসতি হয়। মধুরা নামের অপভ্রংশেই মথুরা হইয়াছে। এক সময়ে ইহার শক্তি সমৃদ্ধি এত বর্দ্ধিত হয় যে, ইহার অনুকরণে দাক্ষিণাত্যে এই নামে একটি দ্বিতীয় নগরী স্থাপিত হয়। এখনও সে নগরী মধুরা বা মাদুরা নামে পরিচিত থাকিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

---

* "ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব নির্ম্মিতা।" রামায়ণ; উত্তরকাণ্ড। ৮৩

* হরিবংশে (৯৫) আছে, শত্রুঘ্ন মথুরা নামেই পুরী নির্ম্মাণ করেন। রামায়ণে মথুরা নাম নাই, মধুরা নামই আছে। হরিবংশ ও মহাভারতে মথুরা নামই দেখা যায়।

[পা]ঠক পরম ভাগবত শ্রীরঘুনাথ ভট্ট। আর শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধানের পর [বৃন্দা]বনে আসিলেন সপ্তগ্রামের লক্ষাধিপতির পুত্র, সর্ব্বত্যাগী, কায়স্থকুল [ভূ]ষণ শ্রীরঘুনাথ দাস। ক্রমে আরও কতজন আসিয়াছিলেন, খ্যাতিমণ্ডিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ গোস্বামী আখ্যাও পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহারাই সর্ব্বপ্রথম এবং গোস্বামিপাদগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহাদের মধ্যে শ্রীভূগর্ভের কথা বাদ দিলে, অপর সাতজন গোস্বামীই শ্রীবৃন্দাবনের গুরুসম্প্রদায়ের আদিপুরুষ। ক্রমে আমরা এই সাতজনের কথাই বলিব। তন্মধ্যে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী সর্ব্বাগ্রে বৃন্দাবনে আসেন বলিয়া তাঁহার কথাই সর্ব্বাগ্রে বলিয়া লইতেছি।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

"শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎসমন্বিতং।
পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথপ্রভুং ভজে॥"

[১]

পিতৃ-পরিচয়।

১৪৩১শক। অগ্রহায়ণ মাস। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। তিনি তখনও সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তিনি অল্প বয়সে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়াছে, নবদ্বীপ নগরে চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনাও করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার আয়োজন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ৺গয়াধামে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপাস্য দেবতা করিয়াছেন এবং তাঁহার মাধুর্য্যলীলা বিকাশই নিজ জীবনের প্রধান সাধনা বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন তখন তাঁহার কল্পনা-নেত্রে সমুদ্ভাসিত। সেক্ষেত্রের লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধার না করিলে আদর্শ প্রদর্শিত হইবে না, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত স্মৃতি-কাহিনী দুর্ব্বল ও মলিন হইয়া পড়িবে, ইহাই মনে করিয়া তিনি বৃন্দাবনধামের সমুদ্ধারের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। গানে,

কীর্ত্তনে, এমন কি, নাট্যাভিনয়ে এই বৃন্দাবনলীলা লইয়াই তিনি ৺নবদ্বীপে ব্যস্ত ছিলেন। নিজের অদূর ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন, তাহা তখনও স্থির ছিল না, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি মন টানিতেছিল। এমন সময়ে শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক প্রতিভান্বিত ভক্ত ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার সঙ্গ-পিপাসু হইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের সিদ্ধান্ত স্থির হইল। উপযুক্ত পাত্র সমাগত হইবামাত্র তিনি সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য এই লোকনাথকে তখনই বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। তাঁহাকে দু'দশদিনের জন্যও নবদ্বীপে অপেক্ষা করিতে দিলেন না। এই লোকনাথ কে, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিব।

যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমায় তালখড়ি গ্রামে, পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর ঔরসে ও সীতাদেবীর গর্ভে লোকনাথ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী-প্রণীত প্রসিদ্ধ "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে দেখিতে পাই:—

"যশোহর দেশেতে তালখেড়া গ্রামে স্থিতি
মাতা সীতা, পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।* (১ম তরঙ্গ)

* নরহরির অন্য গ্রন্থ "নরোত্তম-বিলাসে" (১ম বিলাস) তালগড়ি আছে। তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া নিত্যানন্দ দাসের "প্রেম-বিলাসে" (৭ম বিলাস) এবং আধুনিক কালে দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (৪র্থ সং, ৩২১ পৃঃ) তালগাড় নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা তালখড়ি হইবে; স্বর্গীয় শিশির কুমারের "শ্রীনরোত্তম-চরিতে" (১পৃঃ) তালখড়ি-জাগলি গ্রাম উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তালখড়ির সংলগ্ন কোন জাগলি গ্রাম ছিল কিনা জানি না। এখন নাই। তালখড়ির দুই ক্রোশ পূর্ব্বদিকে জাগলা নামে একটি গ্রাম আছে।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থে বর্ত্তমান তালখড়ির প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যদিগের বংশাবলীতে পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ও তৎপুত্র লোকনাথের নাম আছে। লোকনাথ যে চৈতন্যের পার্ষদ তাহাও তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশে প্রবাদ চলিতেছে।

এই তালগেঁড়া বা তালগড়ি প্রকৃতপক্ষে তালখণ্ডী বা তালখড়ি গ্রাম। উহা মাগুরা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কুলীন। তাঁহার বংশীয়ের "কাচ্‌নার মুখ্‌টি, ত্থাকরের সন্তান" বলিয়া পরিচিত। এই পরিচয়ের অর্থ কি, বলিতেছি।

কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষ বঙ্গীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয়দিগের আদি। তৎপুত্র শ্রীগর্ভ গঙ্গাতীরে মুখটি গ্রামে বাস করেন বলিয়া মুখ্‌টি গাঞি (গ্রামীণ) বা সহজ ভাষায় মুখটি আখ্যা পান। শ্রীগর্ভের অধস্তন ১১শ পর্য্যায়ে * উৎসাহও গরুড় মহারাজ বল্লাল সেনদেবের সভায় নির্দ্দোষ কুল-মর্য্যাদা পান। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে উৎসাহের পুত্র আহিত ও অভ্যাগত প্রধান কুলীন বলিয়া স্থিরীকৃত হন। লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র পূর্ব্ববঙ্গাধিপ রাজা দনোজমাধব ধন ও রাজসম্মান দ্বারা কুলীনদিগকে প্রতিপালন করিতেন। উল্লেখিত আহিতের পৌত্র শিয়ো বা শিরোভূষণের তিন পুত্র ছিল:—নৃসিংহ, রাম ও ত্থাকর (বা দিবাকর) তন্মধ্যে নৃসিংহ দনোজ মাধবের মহাপাত্র বা মন্ত্রী ছিলেন। "ফুলের মুখুটী" কবি কৃত্তিবাস এই নৃসিংহ ওঝার বৃদ্ধ প্রপৌত্র। তৎপ্রণীত রামায়ণের আত্মবিবরণ হইতে জানা যায়, পূর্ব্ববঙ্গে বিপ্লব জন্য নৃসিংহ গঙ্গাতীরে আসিয়া ফুলিয়া ক্রমে বাস করেন। † মধ্যম

---

* বংশধারা* এই :—শ্রীহর্ষ—শ্রীগর্ভ—শ্রীনিবাস—মেধাতিথি—আবর—ত্রিবিক্রম—কাক—বাঁধূ—গুয়ী বা প্রাণেশ্বর—মাধবাচার্য্য—কোলাহল—উৎসাহ ও গরুড়।

† "বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর।"
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সং, ১২৩ পৃঃ

সমসুদ্দীন ফিরোজ শাহ যখন লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের রাজা (১২৯৭-১৩১৮ খৃঃ) তখন তাহার দ্বিতীয় পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ সুবর্ণ গ্রাম জয় করেন। সেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় আনুমানিক ১৩১০ খৃঃ অব্দে নৃসিংহ ফুলিয়ায় আসেন।

ঠা রামও সেইখানে আসেন এবং কনিষ্ঠ স্থাকর বা দিবাকর কাঞ্চন পল্লী বা কাচনা গ্রামে বসতি করেন। এইজন্য স্থাকরের অধস্তন বংশধরেরা "কাচনার মুখটি স্থাকরের সন্তান" নামে প্রচারিত। স্থাকরের চারি পুত্র চক্রপাণি, হলধর, নীল ও সারঙ্গ। সারঙ্গের কয়েক পুত্রের মধ্যে দুইজনের নাম পাওয়া যায়—বিজয় ও ধর্ম্ম। ধর্ম্ম যশোহর জেলায় নড়াইল মহকুমায় চিত্রানদীর তীরবর্ত্তী তালেশ্বর গ্রামে উঠিয়া যান।* ধর্ম্মের পুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুত্র জগন্নাথ ঘটক, তৎপুত্র গোবিন্দ এই স্থানেই বাস করেন। গোবিন্দের পুত্র পদ্মনাভ বা পরমানন্দ নানা উৎপাতে তালেশ্বরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তথা হইতে উঠিয়া গিয়া মাগুরার নিকটবর্ত্তী

* নড়াইল হইতে ৬।৭ মাইল দূরে চিত্রাতীরে মাঝপাড়া নামক পুরাতন ব্রাহ্মণ-পল্লী বর্ত্তমান। ইহারই সংলগ্ন একটি খালের অপর পারে তালেশ্বর গ্রাম। সেখানে এখন কয়েকঘর নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস আছে, ব্রাহ্মণের বাস নাই। সম্ভবতঃ মাঝপাড়াও তখন উক্ত তালেশ্বর গ্রামের একাংশ ছিল, মধ্যপাড়া এখন মাঝপাড়া নামে খ্যাত হইয়াছে। "মাঝপাড়ার ভরদ্বাজ" বংশীয় ভট্টাচার্য্যগণ সমাজে খ্যাতিসম্পন্ন এবং তাঁহারাও তালখড়ির ভট্টাচার্য্যগণের অন্য শাখা। ভট্টাচার্য্যগণের পাণ্ডিত্য-গৌরবে এক সময়ে মাঝপাড়া কাশীর সহিত তুলিত হইত। তন্মধ্যে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য সমধিক বিখ্যাত। উঁহারাও কাঁচনার মুখটি, স্থাকরের সন্তান। এই মুখটি বংশীয় কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে "পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার" লিখিয়াছেন, সেস্থান এই তালেশ্বর হওয়া বিচিত্র নহে। তালখড়ি বা মাঝপাড়ার ভট্টাচার্য্যগণ যে বংশীয়, তাহাদের অন্য শাখা চন্দনী-মহল প্রভৃতি স্থানে সসম্মানে বাস করিতেছেন। সম্ভবতঃ স্থাকর বা দিবাকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের বংশধরগণও এই সময় এতদঞ্চলে বাস করেন, এবং তদ্বংশীয়রা পাঠান বীর খাঁ জাহানালির অত্যাচারে পীরালি হইয়া যান, এখন তাহাদের বংশধরেরা চেঙ্গুটিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছেন।

তালখড়ি গ্রামে বাস করেন। + পূর্ব্ববাসস্থান তালেশ্বরের স্মৃতিরক্ষার্থ তালখণ্ডী নাম হয় বা চতুর্দ্দিকে তালবৃক্ষের শোভাময় প্রাচুর্য্য জন্ত ঐরূপ নাম হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

তালখড়ি অবস্থানের পর সাতাদেবীর গর্ভে পদ্মনাভের ৪টি পুত্র হয়। তন্মধ্যে লোকনাথ তৃতীয়। * পুত্রগণের নাম ভবনাথ, প্রগল্‌ভ বা পূর্ণানন্দ, লোকনাথ ও রঘুনাথ। তন্মধ্যে লোকনাথ আকুমার ব্রহ্মচারী এবং অপুত্রক। জ্যেষ্ঠ ভবনাথের ধারা যশোহরের অন্তর্গত জয়দিয়া প্রভৃতি স্থানে আছেন। কাশ্মীরের রাজমন্ত্রী নীলাম্বর ও তাঁহার খ্যাতনামা ভ্রাতা ও কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব জজ ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ভবনাথের অধস্তন পুরুষ।

+ নৃসিংহের ফুলিয়ার আসিবার তারিখ ১৩১০ খৃঃ ধরা হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ৫ পুরুষ পরে পদ্মনাভ। ৫ পুরুষে আনুমানিক ১৫০ বৎসর ধরিলে পদ্মনাভের সময় ১৪৬০ খৃঃ হয়। পদ্মনাভ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট, অদ্বৈত প্রভুর জন্ম ১৪৩৪ খৃঃ সুতরাং পদ্মনাভের জন্ম সন আঃ ১৪৫০ খৃঃ ধরা যায়। ঠিক ঐ সময়ে ভৈরব-তীরে পয়ঃগ্রাম কস্‌বায় পাঠান দলপতি খাঁ জাহান আলির শাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সে স্থান হইতে পীরালির অত্যাচার আরব্ধ হয়। সবিশেষ বিবরণ মৎ-প্রণীত "যশোহর-খুলনার ইতিহাস", ১ম খণ্ডে (২৯৫-৩১২ পৃঃ) দিয়াছি। ধর্ম্মের বসতি স্থান হইতে পয়ঃগ্রাম বেশী দূরে নহে। সম্ভবতঃ রামের সন্তানগণকে পীরালি হইতে দেখিয়াই, পদ্মনাভ তালেশ্বর ত্যাগ করিয়া আরও উত্তর দিকে তালখড়ি বাস করেন। আর এক ভাবে গণনা করিয়াও এই ঘটনার সময় নিরূপণ করা যায়। কৃত্তিবাস পণ্ডিত শিক্ষা সমাপন করিয়া পাণ্ডুয়ার রাজা গণেশের রাজসভায় অভিনন্দিত হন এবং তাঁহারই উপদেশে রামায়ণ রচনা করেন। গণেশের রাজত্বকাল খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ১৪১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত। কৃত্তিবাসের রাজসাক্ষাৎকাল ১৪০৮-৯ খৃঃ ধরিলে, তাঁহার দুই পুরুষ পরবর্ত্তী পদ্মনাভের সময় ১৪৬০ ধরা অযৌক্তিক হয় না।

* ৺ শিশির কুমারের "নরোত্তম চরিতে" এবং দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" (৩২১ পৃঃ) লোকনাথকে পদ্মনাভের একমাত্র পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহা সত্য নহে।

গলভের বংশ আদ্যোপান্ত পণ্ডিতের বংশ; তাঁহারা এখনও "তালখড়ির ভট্টাচার্য্য" নামে প্রসিদ্ধ এবং সেইস্থানে বাস করিতেছেন। তালখড়ি নিবাসী কিন্তু সম্প্রতি কাশীবাসী প্রথিতযশা পণ্ডিত ও অধ্যাপক এবং ন্যায়দর্শন-বাৎসায়ন ভাষ্যের অনুবাদক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পদ্মনাভ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ; রঘুনাথের ধারা জানি না। বল্লালী কুলীন উৎসাহ হইতে লোকনাথের বংশের উর্দ্ধতন ও অধস্তন বংশলতিকা দিতেছি:—

(১২) উৎসাহ মুখটি

[শ্রীহর্ষ হইতে ১২শ পর্য্যায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ আদি কুলীন]
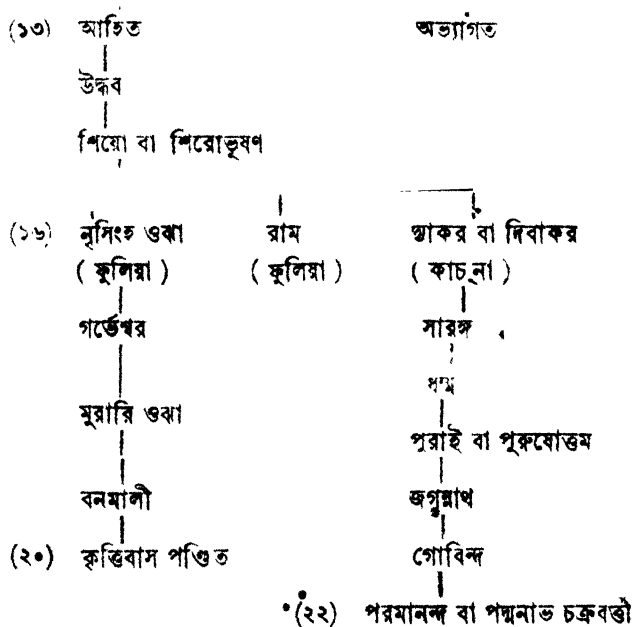
(২২) পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী

(২৩) ভবনাথ — পূর্ণানন্দ বা প্রগল্‌ভ — লোকনাথ গোস্বামী — রঘুনাথ

- ভবনাথ
  - রূপনারায়ণ
    - রঘুদেব (সুরাই মেল)
      - বলরাম
        - কৃষ্ণকিঙ্কর
          - রাম কুমার
            - দেবনাথ
      - রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী
      - রামভদ্র
        - রাজারাম
          - সহস্ররাম
            - নন্দকুমার
- পূর্ণানন্দ বা প্রগল্‌ভ
  - রমাকান্ত
    - রত্নগর্ভ
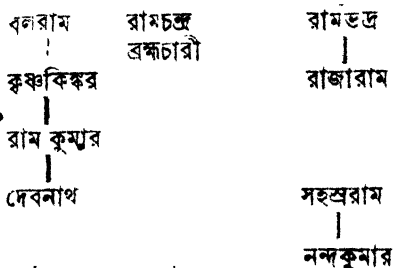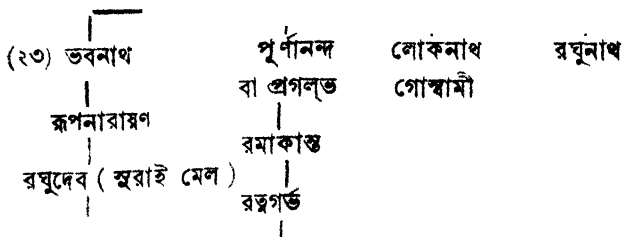
(৩০) নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় — ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

- ঋষিবর মুখোপাধ্যায়
  - সৃষ্টিধর
    - (৩১) শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।*
  - মনোরঞ্জন

পদ্মনাভ যখন পাঠার্থী বালক, তখন নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চ্চার একটি প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মনাভ শিক্ষালাভের জন্য সেখানে আসিয়াছিলেন। ফুলিয়ায় তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের বসতি; উহারই সন্নিকটে শান্তিপুরে

* তালখড়ি ভট্টাচার্য্য বংশের বিবরণ জন্য শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত "ব্রাহ্মণ বংশ-বৃত্তান্ত" (১১৩-৪ পৃঃ), লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত "সম্বন্ধ-নির্ণয়," ২৭১ পৃঃ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১৪৫, ১৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দ্বৈতাচার্য্যের গৃহ। শ্রীঅদ্বৈত অসাধারণ পণ্ডিত, "বেদ-পঞ্চানন"-উপাধি-ধারী বিখ্যাত অধ্যাপক। পদ্মনাভ আসিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া পরে তাঁহার কৃপালাভ করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বয়সে পদ্মনাভ অপেক্ষা সম্ভবতঃ ৫।৬ বৎসরের বড় হইতে পারেন, কিন্তু বিদ্যায় তিনি অতি অল্প-বয়স হইতেই অনেক বড়। পদ্মনাভ তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হন। পদ্মনাভ সম্বন্ধে নরোত্তম-বিলাসে আছে—"প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে।"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবে বঙ্গদেশে যে ভাবের বন্যা বহিয়াছিল, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মাতার দীক্ষা গুরু। তিনি নিত্য তুলসী-গঙ্গাজলে ইষ্টপূজা করি-বার সময় তদানীন্তন দেশময় ধর্ম্মগ্লানি নাশ করিবার জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্য কাতর প্রার্থনা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরীপুরী। এই ঈশ্বরপুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীঅদ্বৈতও মাধবেন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অদ্বৈত ও গৌরাঙ্গ উভয়ই মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন। গৌরাঙ্গ হইতে নিমাই বা নিমানন্দ সম্প্রদায় নামে এক পৃথক শাখা হইয়াছে।* শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সে সময় কঠোর জ্ঞান-চর্চ্চা হইতে লোকের মন ভক্তিশাস্ত্রের দিকে ফিরাইয়া আনিতে ব্রতী হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনুরক্তদিগকে ডাকিয়া আনিয়া প্রত্যহ রীতিমত তাহাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। ইহারই নাম হইয়াছিল—"অদ্বৈত-সভা।" তিনি কখনও শান্তিপুরে কখনও নবদ্বীপের নিজ বাসাবাটীতে থাকিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। পদ্মনাভ ও শ্যামাদাস প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুচরগণ এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতেন।* শ্রীভাগবত ব্যাখ্যার পর কীর্ত্তন

* ভক্তি রত্নাকর ৫ম, ৩১২ পৃঃ।

হইত, পদ্মনাভ সে কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, তাঁহার প্রকৃতি অলৌকিক, তিনি যখন কীর্ত্তনে যোগ দিতেন, তখন তাহার ভক্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন। "অদ্বৈত-প্রকাশে" আছে—ভক্তিযুক্ত পদ্মনাভ "ভাগবত-রসগানে সদা উন্মত্ত" ছিলেন।

"দিবানিশি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত অতিশয়
দেখি সে নেত্রের ধারা কেবা ধৈর্য্য হয়॥" (নরোত্তম-বিলাস)

এই নেত্র-ধারায় বিগলিত হইয়া অচিরে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য পদ্মনাভকে মন্ত্র-শিষ্য করিয়া লন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁহার "পরমানন্দ" নাম হয়। দীক্ষার পর পরমানন্দ তালখড়িতে আসিয়া বাস করেন এবং মধ্যে মধ্যে শান্তিপুর-নবদ্বীপে আসিয়া ভক্তি-চর্চ্চা করিতেন। গৃহে বসিয়াও তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেন, নবদ্বীপের ভক্তিধারার আস্বাদন দেশের লোককে ভোগ করিতে দিতেন। যেমন পদ্মনাভ, তেমনই তাঁহার স্ত্রী সীতাদেবী পরম ভক্তিমতী ছিলেন। *

"যৈছে পদ্মনাভ তৈছে তাঁর পত্নী সীতা।
পরম বৈষ্ণবী যেঁহো অতি পতিব্রতা॥" (নঃ বিঃ ১ম)

এমন আদর্শ দম্পতীর গৃহে না হইলে কি ভক্ত-সাধকের আবির্ভাব হয়? পদ্মনাভ যখন অদ্বৈত-চরণপ্রান্তে ভক্তিরসে বিভোর, সেই সময়ে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের জন্ম হয়। ইনিই লোকনাথ, উত্তরকালে তাঁহার আদর্শ ভক্ত জীবনের জন্য তিনি লোকপাবন হইয়াছিলেন।

---

* পদ্মনাভ অনেক সময়ে সস্ত্রীক শান্তিপুরে গুরু গৃহে আসিতেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নীর নাম সীতা, তাঁহার নিজ পত্নীর নামও সীতা। উভয় সীতায় মধ্যে অগাঢ় সৌহৃদ্য ছিল। পদ্মনাভ-পত্নী সীতার মৃত্যুর বহুকাল পরে অদ্বৈত-পত্নী সীতার তিরোভাব ঘটে। "সীতা-চরিত্র" নামে শেষোক্ত সুচরিত্রা রমণীর একখানি জীবন-চরিত আছে। কেহ কেহ বলেন, লোকনাথ গোস্বামী উহার রচয়িতা। ইহা বিচিত্র নহে।" "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ৩২১ পৃঃ।

(২)

বাল্যশিক্ষা ও বৈরাগ্য।

লোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়সে ২।৩ বৎসরের বড় ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মকাল—১৪০৭ শকের ফাল্গুন বা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী। সুতরাং লোকনাথের জন্ম ১৪০৫ শকে বা ১৪৮৩।৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, ধরিতে পারি। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বহু বৎসর পূর্ব্বে পদ্মনাভ শান্তিপুর হইতে তালখড়িতে আসিয়া গৃহস্থ হইয়াছিলেন। পঠদ্দশায় শান্তিপুরের লোকে তাঁহাকে "যশোরিয়া" বলিয়া উপহাস করিত।* পাঠ শেষ করিয়া এই যশোরিয়া পণ্ডিত শেষে নিজ ভবনে টোল খুলিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে গুরুগৃহে যাইতেন, সে অঞ্চলের সকল সংবাদ জানিতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখিয়াছি, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদ্যার্জ্জনের জন্য পূর্ব্বদেশে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ৫০ বৎসর পরে সে হাওয়া বদলাইয়া গিয়াছিল। এখন যেমন কলিকাতা সহর বঙ্গের সদর শীর্ষস্থান, তখন নবদ্বীপের অবস্থাও তাহাই। সেখানে কোন ঘটনা ঘটিলে, তাহা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িত। সুতরাং দেশের কোণে তালখড়িতে বসিয়া পদ্মনাভ শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলার অনেক কথা শুনিতেন।

প্রথম হইতেই লোকনাথ প্রতিভাসম্পন্ন বালক, তিনি পিতার টোলে শিক্ষারম্ভ করিলেন; শেষে ১৪।১৫ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য হইলেন। তিনি লোকনাথের

---

*"যশোরিয়া খ্যাত যাঁর তব কৃপাপাত্র" অ, প্র, ১২৩ পৃঃ

পতার গুরু, এখন বয়স ৬৫ বৎসর, কিন্তু যুবকের ন্যায় উৎসাহশীল, যন তাঁহার অর্দ্ধেক বয়সও হয় নাই। লোকনাথ তাঁহার চরণপ্রান্তে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। ঈশান নাগর নামক এক নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ বালক পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন; তাহার গৃহে পুত্রবৎ পালিত হইয়া, তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ ও পরে দীক্ষালাভ করিয়া ধন্য হন। প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবেরও কৃপালাভ করেন। ঈশান ছায়ার মত অদ্বৈত প্রভুর পাছে পাছে ঘুরিয়া অবশেষে তাঁহার অন্তর্ধানের পর বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার যে জীবন-চরিত রচনা করেন, তাহা বৈষ্ণব সমাজে মহামান্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ। ঈশান-রচিত সেই কবিত্বপূর্ণ "অদ্বৈত প্রকাশ" হইতে আমরা লোকনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলামৃত পদ্মনাভের অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। তিনি পুত্রকেও শ্রীঅদ্বৈতের নিকট ঐ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের নিকট আসিয়া,

"লোকনাথ কহে মোর পিতার সম্মত।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়োঁ কৃষ্ণলীলামৃত॥"

(অ, প্র, ১২শ)

আচার্য্যপ্রভু তাহাতেই সম্মত হইয়া লোকনাথকে শিষ্যরূপে গ্রহ করেন। তখন লোকনাথ গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে সটীক শ্রীমদ্ভাগবত পড়িলেন। এই গদাধর পরে শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত অন্তরঙ্গ শিষ্য হইয়াছিলেন। লোকনাথ ও গদাধরের পাঠ শুনিয়া আচার্য্য প্রভুর আর একটি শিষ্য মহানন্দে শ্লোকার্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ। এই সময়ে তিনি প্রভু অদ্বৈতের নিক

বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।* লোকনাথ সেই পরম সুন্দর বিদ্যার্থীর রূপ ও অসামান্য প্রতিভায় একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গদাধর ও লোকনাথ উভয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী; ভাগবতে তাঁহাদের অপূর্ব্ব ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ

"শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গের গুণে অতি চমৎকার
লোকনাথের হৈল ভাগবতে অধিকার॥"

ভাগবতে অধিকার লাভের ফল হাতে হাতে ফলিল; লোকনাথ কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। শুধু তাহাই নহে, একদিন তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে লইয়া গিয়া নিজেই তাঁহাকে মন্ত্র-দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার পর হইতেই তাঁহার শুদ্ধ প্রেম-ভক্তির উদয় হইল। তখন প্রভুপাদ তাঁহাকে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান শিখাইবার জন্য নিজ শিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৌরাঙ্গও তাঁহাকে হাতে পাইয়া একেবারে আত্মসাৎ করিলেন।

"এত কহি প্রিয় শিষ্যে গৌরে সমর্পিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মসাথ কৈলা॥"

তদবধি লোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট চিরবিক্রীত হইয়া গেলেন এবং তাঁহার ভাবী জীবনের কর্ম্মপথ উন্মুক্ত হইয়া রহিল।

* শ্রীগৌরাঙ্গ পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ করিয়া প্রথমে গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যের নিকট চারিবর্ষকাল ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার, দুই বৎসরকাল বিষ্ণু মিশ্রের নিকট স্মৃতি ও জ্যোতিষ, দুই বৎসরকাল সুদর্শন পাণ্ডিতের নিকট ষড় দর্শন, দুই বৎসরকাল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নের পর ১৭শ বর্ষ বয়সে শ্রীঅদ্বৈতের নিকট বেদ পাঠ করিতে আসেন তখন লোকনাথের বয়স ১৯ বৎসর। "অদ্বৈত প্রকাশ", ১২শ.

কিছুদিন পরে লোকনাথ পণ্ডিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গরূপী তাঁহার সেই সতীর্থটি তাঁহার হৃদয়পটে যে রেখাঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জন্মেও মুছিল না। লোকনা ক্রমে বড় পণ্ডিত হইলেন। "প্রেম-বিলাসে" আছে—"এমন পণ্ডিত সম নাহি সেই দেশে।" সে দেশ মূর্খের দেশ ছিল না; সে পণ্ডিতের দেশেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাড়িয়াছিল। "নরোত্তম বিলাসে" দেখিতে পাই তাঁহার "অল্প বয়সে বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।" সে দেশে তখন তাঁহার তুল্য পণ্ডিত কেহ ছিল না। শুধু পণ্ডিত নহেন লোকনাথ আজন্ম ভক্ত।

"শ্রীলোকনাথের ভক্তিপথে মহা আর্ত্তি।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যেন করুণার মূর্ত্তি॥"

বৈরাগ্য তাঁহার প্রতি কার্য্যে ও কথায় ব্যক্ত হইত। এমন ছেলে গৃহে থাকিবে না, বলিয়া মাতা সীতাদেবীর আশঙ্কা হইয়াছিল। সে আশঙ্কা মিথ্যা নহে। শিশির কুমার সত্যই লিখিয়াছেন, "সংসারে ঔদাস্য, অতিশয় পাণ্ডিত্য, কৃষ্ণ কথায় রুচি, ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন এ সমস্ত দেখিয়া সকল লোকে তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।" শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিমন্ত্রের বার্ত্তা তাঁহার কর্ণে পৌছিয়াছিল। এমন সময়ে সেই গৌরাঙ্গদেব স্বয়ংই তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন।

(৩)

পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই, যখন তাঁহার বয়স ১৮
সের এবং সেই অল্প বয়সে যখন নূতন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের
স্থার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন তিনি নিজ জন সহ একবার
াত্রেজে পূর্ব্ববঙ্গভ্রমণে গিয়াছিলেন। সে সময় তিনি নবদ্বীপ হইতে
র্ব্বদিকে গিয়া পদ্মা নদী পার হন, এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু তিনি
ান্ পথে কিভাবে অগ্রসর হন, তাহা ঠিক ভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।
খনও তঁাহার জীবন তেমন খ্যাতি-মণ্ডিত হয় নাই বলিয়া তৎপ্রতি
হার ভক্তগণের একাগ্র দৃষ্টি পড়ে নাই, উহারা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের
চ এই অংশের সকল ঘটনা ও সকল রটনার খুঁটিনাটি বিবরণ লিখিয়া
খেন নাই।

তালখড়ির ঠিক উত্তর ধারে বারাঙ্গনা নামে একটি নদী আছে;
ন তাহার স্রোত না থাকিলেও খাত আছে, বারাঙ্গনা নামে প্রসিদ্ধিও
ছে। তালখড়ির ভট্টাচার্য্য-বংশে একটি প্রবাদ আছে যে, একদা
গৌরাঙ্গদেব যখন ভক্তমণ্ডলী সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ বারাঙ্গনা
ীর ধার দিয়া যাইতেছিলেন, তখন লোকনাথকে ডাকিয়া লইয়াছিলেন।
াস-দীক্ষা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেন,
হার কয়েক বৎসর পরে তিনি গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কানাই নাটশালা বা
কেলি হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পদ্মাতীরে আসিয়া নরোত্তম
ায়া ডাকিয়া ছিলেন, এইরূপ গল্প আছে। তখনও প্রসিদ্ধভক্ত নরোত্তম
সের জন্ম হয় নাই। সেইরূপ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বারাঙ্গনা তীরে
সিয়া নরোত্তমের ভবিষ্যৎ-গুরু লোকনাথকে ডাকিয়া নিজ পরিকরে

গণ্য করিয়াছিলেন—ইহা গল্প নহে, প্রকৃত সত্য কথা। "অদ্বৈত-প্রকাশে" ঐ সময়ে তাঁহার তালখড়িতে আসিবার কথা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে।

যশোহরের অন্তর্গত বোধখানা অতি প্রাচীন পল্লী। সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ একবার আসিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু এই পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় ব্যতীত পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার কখনও এ সব দেশে আসিবার উল্লেখ নাই। কোন স্থানে তাঁহার আগমন হইলেই সে অঞ্চলের লোক ধন্য হইত এবং উত্তরকালে তাঁহার প্রকট অবস্থা দেখিয়া সে কথা সাগ্রহে মনে করিয়া রাখিত, পুরষানুক্রমে তাহা বিস্মৃত হইত না। সুতরাং এরূপ প্রবাদ থাকিলে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। বোধখানার প্রবাদ, অদ্বৈত-প্রকাশের বর্ণনা ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে আমরা পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের একটি পথের আভাস দিতেছি। আমাদের মনে হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ গণ সহ নবদ্বীপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, দক্ষিণ মুখে প্রথমতঃ পুরাতন "গৌড়বঙ্গের রাজপথে" অর্থাৎ পরবর্ত্তী যুগে যাহা "বাদশাহী সড়ক" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল সেই রাস্তায় শান্তিপুর, ফুলিয়া দিয়া, চূর্ণী নদী পার হইয়া, রাণাঘাটে আসেন এবং পরে পূর্ব্বমুখে বনগ্রামের পথে বোধখানায় আসিয়া কপোতাক্ষী নদী পার হন। তৎপরে যশোহরের অন্তর্গত বারবাজার ও নলডাঙ্গার মধ্য দিয়া তালখড়ির পার্শ্ব দিয়া নব গঙ্গা ও মধুমতী নদী অতিক্রম করিয়া ভূষণায় প্রবেশ করেন। তালখড়ির পার্শ্ববর্ত্তী বারাঙ্গনা নদীর ধার দিয়া যাইবার কালে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই লোকনাথের সন্ধান করেন লোকনাথ ও তাঁহার আগমন সংবাদ পূর্ব্ব হইতে পাইয়া, তাঁহার পিতা পদ্মনাভকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য অগ্রসর হইতে বলেন। পদ্মনাভের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে কখনও দেখা না হইলেও তাঁহাকে তিনি চিনিয়া ছিলেন, কারণ তিনি লোকনাথের পিতা। অদ্বৈত-প্রকাশে

দেখি, পদ্মনাভ গলায় বস্ত্রদিয়া নিজগণ সহ শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্বর্দ্ধনা করতঃ ব্যাড়ীতে লইয়া যান।

"পদ্মনাভ তাঁরে সৎকার কৈলা বিধিমত।
মহাপ্রভু তথি বাস কৈলা দিন কত॥"

সে আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তালখড়িতে কয়েকদিন বাস করিলেন। ভক্ত লোকনাথ যাহা চান, তাহা পাইলেন। তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুত এই সঙ্গে ছিলেন। সকলে মিলিয়া স্নান ভোজন ও কীর্ত্তন নর্ত্তনে যে কত আনন্দ করিলেন, তাহা বলিবার নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সকলের মুখে। নিমাই বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণের টিপ্পনী নবদ্বীপ হইতে নকল করিয়া আনিয়া পূর্ব্ববঙ্গের টোলে টোলে পড়ান হইত। তালখড়ি তখনও পণ্ডিতের স্থান; বিশেষতঃ নিমাই পণ্ডিতকে দেখিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে "ধনী মান্য জ্ঞানী" আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিয়া জুটিলেন। রাত্রিতে দীপালোকে পণ্ডিতবর্গের এক মহতী সভা হইল। যথা অদ্বৈত প্রকাশে :—

"রাত্রে মহাসভা কৈলা মিলি বিজ্ঞজন;
চতুর্দ্দিকে দীপ জ্বলে যৈছে মণিগণ॥"

উপস্থিত মহাপণ্ডিত তর্কচূড়ামণির সহিত তর্কশাস্ত্রের বাগ্‌যুদ্ধ চলিল, পূর্ব্ব পক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া গৌরাঙ্গ নিজ মত স্থাপন করিয়া জয়ী হইলেন, সকলে এতদিন নিমাই বিদ্যাসাগরের নাম জানিতেন, অদ্য তাহার দৈবী বিদ্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের নিকট হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; তাহা শুনিয়া ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন।

সে অঞ্চলে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিষ্ঠা চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। তাহাতে পদ্মনাভ ধন্য হইলেন।

"পদ্মলাভ চক্রবর্ত্তীর অতি ভাগ্যোদয়।
যার ঘরে শ্রীচৈতন্যের হইল বিজয়॥" অ. প্র. ১৩শ

এইরূপে কয়েকদিন আনন্দোৎসব করিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া ফরিদপুরের পথে পদ্মাতীরে উপনীত হইলেন। সেখানে কয়েক দিন অধিষ্ঠান ও পদ্মাস্নান করিয়া, পর পারে বিক্রমপুরের অন্তর্গত সুরপুর ও সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। বিক্রমপুরে তাঁহার সহিত রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামীর পিতা পরম ভক্ত তপন মিশ্রের সাক্ষাৎ হয়। তপন মিশ্র তাঁহারই আদেশে কাশীপ্রবাসী হন। সে কথা স্থানান্তরে বলিব। সুবর্ণগ্রাম হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বগণ সহ ব্রহ্মপুত্র তীরে এগার সিন্দুর গ্রামে যান এবং পরে ভেটাদিয়া গ্রামে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে কয়েকদিন ভিক্ষা নির্ব্বাহ করেন।* এই লক্ষ্মীনাথের ভ্রাতা পুরুষোত্তম, তাঁহার

"সন্ন্যাস আশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত রসের সাগর॥"

ভেটাদিয়া হইতে মহাপ্রভু শ্রীহট্টে আসেন এবং তথায় তদীয় প্রপিতামহের স্থান বুরুঙ্গা বা বরগঙ্গায় গিয়া তাঁহার পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ও তৎপত্নীর সঙ্গে দেখা করেন। উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী ছিল শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত দত্তরালি গ্রামে। কিন্তু তিনি এ সময়ে

---

* যেই লক্ষ্মীনাথ ভক্ত পণ্ডিত প্রধান।
দিন চারি তার ঘরে প্রভুর বিশ্রাম॥
লক্ষ্মীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌর হরি।
কিছুদিনে শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি॥

প্রেম-বিলাস, ২৪শ

রুঙ্গাস্থিত জ্ঞাতিভ্রাতৃগণের আহ্বানে তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। জন্য গৌরাঙ্গ বুরুঙ্গাতে আসিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করেন, এ গ্রায় ঢাকা দক্ষিণ যান নাই। † এই বুরুঙ্গাই তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের াষ সীমা। এই স্থান হইতে তিনি যেন কেমন ব্যস্ত হইয়া, প্রায় ই পথে, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লোকনাথকে তিনি তাল-তে নিজ গৃহে রাখিয়া যান। ইহার পর কয়েক বৎসর লোকনাথের তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ এ যাত্রায় যেন চতু-ীর পরিদর্শকের মত যেখানে বহু বিদ্যার্থীর সমাগম, যেখানে পণ্ডিত লীর বসতি, সেখানেই অবস্থান ও শিক্ষাদান করিয়া আসিলেন এবং ণ্ডিত্যের মর্য্যাদাস্বরূপ বহুধনরত্ন ও বস্ত্রাদি উপহার পাইয়া নবদ্বীপে রলেন।

† উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথই শ্রীচৈতন্যের পিতা। দত্তরালিতেই জগন্নাথের জন্ম যে গর্ভে চৈতন্যের জন্ম হয়, সে গর্ভাবস্থায় শচীদেবী এই স্থানে ছিলেন, পরে পে আসেন। উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কলাবতী শচীদেবীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সে গর্ভের পুত্র যেন একবার ঢাকা দক্ষিণে আসে। সে কথা গৌরাঙ্গ মাতার শুনিয়াছিলেন। পিতামহীর বাক্যরক্ষা বোধ হয় তাহার পূর্ব্ববঙ্গে আগমনের হেতু। জগন্নাথ মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র-কৃত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী ইহার উল্লেখ আছে। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত," চতুর্থ ভাগ, ২৫১ পৃঃ, বিশ্বকোষ, ৪৫৪ পৃঃ, শিশির কুমার গৌরাঙ্গের শ্রীহট্টে আসিবার কথা স্বীকার করেন অ, নি, চ, ১ম খণ্ড, ৬২ পৃঃ। শ্রীযুক্ত অচ্যুত বাবু বলিতে চান, সন্ন্যাস দীক্ষার শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচল যাত্রার পূর্ব্বে শান্তিপুরে কিছুকাল ছিলেন, তখন ঢাকা দক্ষিণে আসিয়াছিলেন। দত্তরালিতে তাঁহার আগমন চিহ্ন চিরস্থায়ী জন্য উপেন্দ্র মিশ্রের গৃহে পূর্ব্বতন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তিও হয়। উহা এক্ষণে "ঠাকুর বাড়ী" বলিয়া পরিচিত। তথায় প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

(৪)

লোকনাথের গৃহত্যাগ

পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-নাট্যের ও বহু পরিবর্ত্তন হয়; তিনি অলৌকিক ভাবাবেশে নূতন দেবতা হইয়া গিয়াছিলেন। লোকনাথের নিজপল্লীতে যখন অকস্মাৎ উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল, তখন কি দিব্য প্রেরণাই লোকনাথের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিল, তিনি তখন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সাধকেরা বৈরাগ্যের অঙ্কুর লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, ক্রমে তাহার পরিণতি হয়। লোকনাথও ক্রমে সংসার-ত্যাগের জন্য, নবদ্বীপের নূতন ভাব-বন্যায় ঝাঁপ দিবার জন্য, ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিলেম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি বিবাহ করেন নাই। এমন সময়ে তাঁহার পিতামাতা উভয়ে ক্রমে দেহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। একদিন অগ্রহায়ণ মাসে (১৪৩১ শক) শীতে গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, নিশীথ রাত্রিতে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখনই তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে জন্মের মত গৃহত্যাগ করিলেন।* যথা "নরোত্তম-বিলাসে":-

---

* যদিও প্রেম-বিলাসে দেখিতে পাই, লোকনাথের গৃহত্যাগের পরদিন তাঁহার মাতা অত্যন্ত রোদন করিলেন, তবুও নরোত্তম-বিলাসের উক্তি অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। প্রেম-বিলাস পরবর্ত্তী গ্রন্থ এবং উহার অধিকাংশ স্থলই নরহরি কৃত ভক্তি-রত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাসের অনুকরণে লিখিত। ঐতিহাসিকতা হিসাবে প্রেম-বিলাসের মূল্য কম। মহাপ্রভু গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি কাহাকেও পিতামাতা থাকিতে গৃহত্যাগ করিতে অনুমতি দেন নাই, পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিলে লোকনাথকেও তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবন যাইতে বলিতেন না। শ্রীপ্রভু কখনও বেদ কর্ত্তব্যাচারের অবমাননা করিয়া কায করেন নাই।

"পিতামাতা অদর্শন হৈলে কতদিনে।
মনের বৃত্তান্ত জানাইলা বন্ধু গণে ॥
বিষম সংসার-সুখ ত্যজি মলপ্রায়।
প্রভু সন্দর্শনে যাত্রা কৈলা নদীয়ায় ॥"

লোকনাথ বড় ব্যাকুল হইয়া সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। দব্রজে ৮ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিবার পর রাত্রি প্রভাত হইল। পরদিন সন্ধ্যার সময় শ্রান্তক্লান্ত দেহে নবদ্বীপে পৌছিয়া প্রভুর বাটীর সন্ধান করিলেন। তখন প্রভুর এক প্রেমোন্মাদের অবস্থা। তিনি বৃন্দাবন লইয়াই পাগল। কখনও রাধাকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইয়া বৃন্দাবনের জন্য রোদন করেন, কখনও ভক্তগণকে লইয়া বৃন্দাবন-লীলার নানাপ্রসঙ্গে নাটকাভিনয় করেন, বৃন্দাবনের শ্রীনন্দ-যশোদা, যমুনা-গোবর্দ্ধন, এমন কি, ধবলী শ্যামলী গাভীর কথা বলিয়া চিৎকার করেন। তাঁহার মন তখন উড়ু উড়ু, কখন্ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। কৃষ্ণমেঘের বর্ষণের পূর্ব্বাবস্থাই গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর। এইরূপ অবস্থায় সেদিন নিজবাটীতে গৃহের বারান্দায় বসিয়া গদাধর, শ্রীরাম, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-কথায় বিভোর আছেন, এমন সময় লোকনাথ গিয়া উপস্থিত। প্রভু তখনই তাঁহাকে চিনিয়া, চিরপরিচিতের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকনাথ, তুমি আসিয়াছ?" এবং পিঁড়া হইতে নামিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অমনি লোকনাথের হৃদয় শীতল হইল এবং সকল পথের শ্রান্তি ও সকল মনের আর্ত্তি নিমেষে বিদূরিত হইল।•

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু লোকনাথকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি এখনই বৃন্দাবনে যাও, আমিও শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সেখানে তোমার সহিত মিলিত হইব। শ্রীবৃন্দাবনধাম আজ্ অরণ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, তুমি গিয়া

তথাকার লুপ্ত লীলা-ক্ষেত্র সমূহের সমুদ্ধার কর।" পরদিন তি লোকনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া অনেক প্রবোধ দিলেন। লোকন তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। প্রভু তাঁহাকে বেশী দি অপেক্ষা করিতে দিলেন না; লোকনাথ ত সংসার-বন্ধন কাটিয়া প্রস্তু হইয়াই আসিয়াছেন। তবে এতদিন যাঁহার কৃপালাভের জন্য তি কত ধ্যান করিয়াছেন, আজ তাঁহাকে পাইয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু কি করিবেন, প্রভুর সঙ্ক অচঞ্চল, তাঁহার আদেশ অপরিবর্ত্তনীয়; তাঁহার একাগ্র প্রেরণার নিক লোকনাথের সকল কাতরোক্তি পরাজিত হইল। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন "লোকনাথ, আমি তোমাকে একাকী বৃন্দাবনে পাঠাইতেছি না; ক্রমে আরও ভক্তগণ যাইবেন, আমি যাইব, সকলে মিলিয়া শ্রীবৃন্দাবনের লীলাক্ষেত্র প্রকাশিত করিব, ভক্তিশাস্ত্রের সাহায্যে লীলা-তত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রচারিত করিব।" অবশেষে লোকনাথ প্রভু-পদে আত্মসমর্পণ করিয়া যাত্রা করিবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন। প্রভুর সহিত সঙ্গোপন সদালাপে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা উভয়ই হইল। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া কি করিতে হইবে, প্রভু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং অক্ষয় বটের সন্নিকটে চীরঘাটে * গিয়া কেলিকদম্বকুঞ্জে বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। প্রেম-বিলাসে আছে:—

"চীরঘাট বাসস্থলী কদম্বের সারি।
তার পূর্ব্ব পাশে কুঞ্জ পরম মাধুরী॥

* চীরঘাট অর্থাৎ বস্ত্রহরণের ঘাট। যেখানে কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নী ব্রতপরায়ণা গোপবালিকাগণের বস্ত্রহরণ করিয়া শ্রীভগবানে সর্ব্বস্বার্পণ শিক্ষা দিয়া ছিলেন, ইহা সেই ঘাট। ঘাটের উপায় কেলি-কদম্ব বৃক্ষের কুঞ্জের কথা শ্রীবৃন্দাবন পরিচয় সূচক বহু গ্রন্থে আছে।

তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে।
বাসকর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে॥
বাসস্থলী বংশী বট নিধুবন স্থান।
ধীর সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম॥*
যমুনাতে স্নান কর, অযাচক ভিক্ষা।
ভজন স্মরণ কর, জীবে দেহ শিক্ষা॥

৭ম বিলাস, ৪৫ পৃঃ

লোকনাথ পাঁচদিন মাত্র নবদ্বীপে ছিলেন। তৎপরে বিদায় গ্রহণ লে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া পড়িলেন। পণ্ডিত গোসাঁই গদাধর প্র প্রভৃতি যাঁহারা সেখানে ছিলেন, সকলে সজল নেত্র হইলেন; াধর প্রভুর একজন শিষ্য ভূগর্ভ সেখানে ছিলেন। তিনি লোকনাথ পেক্ষা বয়সে কিছু ছোট। কি শুভক্ষণেই এই সুকুমার চরিত্র ব্রাহ্মণ াকের সহিত লোকনাথের দেখা হইয়াছিল। ভূগর্ভ তাঁহার সঙ্গে াবনে যাইতে চাহিলেন। প্রভুর তাহাতে আপত্তি হইল না, তাই াধর তাঁহাকে যাইতে অনুমতি না দিয়া পারিলেন না। অকস্মাৎ বং কৃপায় প্রাণের সঙ্গী পাইয়া লোকনাথের হৃদয়ে বল হইল। ন সম্বলবিহীন, কপর্দ্দকশূন্য বন্ধুদ্বয় নিষ্কিঞ্চন বেশে জন্মের মত বঙ্গভূমি াগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুরও এ জীবনে আর দেখা হয় নাই।

---

* শ্রীবৃন্দাবনে "ধীর সমীর" নামে একটি তীর্থস্থানই আছে; এই স্থানের বায়ু সতত ন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়। এই স্থানে নাকি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার জন্য অপেক্ষা াছিলেন। গীতগোবিন্দে আছে, "ধীর সমীরে, যমুনাতীরে, বসতি বনমালী"। াচন্দ্র "আনন্দ মঠে" অন্য ভাবে এই পংক্তির অনুকরণ করিয়াছেন। বংশী বট । বটবৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার পূর্ব্বে বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন। স্থল বলিয়া ভক্তগণ এ স্থান দর্শন করেন।

[৩]

শ্রীবৃন্দাবনে কঠোর সাধনা।

নবদ্বীপ ছাড়িয়া লোকনাথ ও ভূগর্ভ দুই বন্ধুতে প্রাচীন গৌড়বঙ্গে পথে উত্তর মুখে চলিলেন। তাঁহারা মনের আনন্দে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে পথ বাহন করিতে লাগিলেন। কখনও গৌরাঙ্গের লীলা-কাহিনী উচ্চস্বরে গান করিতে করিতে, কখনও বা বৈষ্ণবোচিত দৈন্যে অশ্রু-জলে ভাসিতে ভাসিতে, পথ চলিতে ছিলেন। অবশেষে তাঁহারা রাজমহলে উপনীত হইয়া, স্থানীয় লোকের নিকট বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন অনেকে গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী সোজা বড় রাস্তায় গেলে দস্যুর উৎপাতের ভ দেখাইল। সুতরাং তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভাবিয়া তাজপুরে পথে চলিলেন। প্রথমতঃ রাজমহল হইতে একটু দূরে গঙ্গা পার হই পূর্ণিয়া দিয়া কতদিন পরে অযোধ্যায় পৌছিলেন, তথায় তীর্থ স্নানা করিয়া ক্রমে লক্ষ্ণৌ আসিলেন; লক্ষ্ণৌ হইতে ২৩ দিনে আগ্রায় পৌছি যমুনা দর্শন করিলেন। এই যমুনার কূলে তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীবৃন্দাব ভাবিতে ভাবিতে উভয় বন্ধু অশ্রুসিক্ত হইয়া যমুনা স্নান করিলেন এখান হইতে গোকুল বেশী দূর নহে। অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় দুই দিনে মধ্যেই দুইজনে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। ১৪৩১ শকের অগ্রহা মাসে তাঁহারা যাত্রা করিয়া প্রায় তিনমাস পরে ফাল্গুন মাসের শে শ্রীধাম পৌছিলেন।

একই উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া, একই ভাবে অনুপ্রাণিত ও এক পথের পথিক হওয়ায় লোকনাথ ও ভূগর্ভের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্য জন্মিয়াছিল, উভয়ের দেহ প্রাণ এক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে "নরোত্তম-বিলাসে":—

"তনু মন এক ইথে কিছু ভিন্ন নয়।
পরম অদ্ভুত এই দোহার প্রণয়॥"*

ন্দাবনে আসিয়া লোকনাথ যেমন গোস্বামী আখ্যা পাইয়াছিলেন, ভূগর্ভ াকুরও সেইরূপ গোস্বামী হন। বৈষ্ণব গ্রন্থ নিচয়ে যেখানে লোকনাথ সইখানেই ভূগর্ভের নাম একত্র উল্লেখিত হইয়াছে। †

"তেঁহ প্রেমময় মহা পণ্ডিত গভীর
লোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন শরীর॥"

াই টুকু মাত্র পরিচয় আছে। ভূগর্ভ আচার্য্য ও পণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রচর্চ্চা রিতেন, লোকনাথের পাশাপাশি কুটীর বাঁধিয়া সাধন ভজন করিতেন। তনি শ্রীবৃন্দাবনেই দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন। কেহ কেহ তাঁহার শিষ্য হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ ভক্ত তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন বা তিনি কোন বিগ্রহ সেবা এবং গুরুকুঞ্জ

---

* কবি কর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গৌরগণোদ্দেশদীপিকাদি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-পরিকরগণকে শ্রীকৃষ্ণ লীলায় সখিগণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দনুসারে লোকনাথ ছিলেন পূর্ব্বাবতারে মঞ্জুলালী বা লীলামঞ্জরী এবং ভূগর্ভ ঠাকুর ছলেন নান্দীমুখী বা প্রেমমঞ্জরী। মঞ্জুলালী ও নান্দীমুখী অথবা লীলামঞ্জরী ও মমঞ্জরী সখিদ্বয়ের যেমন প্রীতি ছিল, এ জন্মে ইহাদের দুইজনের সেইরূপ একান্ত নষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। "প্রেম-বিলাস" এমনও বলিয়াছেন যে, তাহাই দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হাদিগের মিলন ঘটাইয়া ছিলেন ;—

"মঞ্জুলালী নান্দীমুখী হয় মহাপ্রীত।
গৌরাঙ্গ দিলেন সঙ্গ জানি সুনিশ্চিত॥

† দৃষ্টান্ত স্বরূপ "বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী" (বঙ্গবাসী সংস্করণ)-ভুক্ত "নরোত্তম-বিলাস" ়, ৯২, ১৫৫, ১৫৭ ও ১৮৬ পৃঃ "ভক্তিরত্নাকর" (মুর্শিদাবাদের ২য় সং) ২৪২, ২৪৯, ২, ৪৮৪, ৫৬১ পৃঃ প্রেমবিলাস ৭৪, ১২৪, ১৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্থাপন করেন, এমন বর্ণনা পাই না। যেদিন তিনি লোকনাথের স
হন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন যেমন প্রচ্ছন্ন, শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার পর
জীবনও তেমনই প্রচ্ছন্ন। এখন হইতে আমরা তাঁহার নিকট বি
লইয়া মুখ্যভাবে লোকনাথের অনুসরণ করিব।

লোকনাথ ভূগর্ভের সঙ্গে ব্রজমণ্ডলে আসিয়া প্রথমতঃ মথুরায়
পরে বন মধ্যে অধিষ্ঠান করতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থান সমূহ খুঁজি
বেড়াইতে লাগিলেন। বনাচ্ছন্ন কত স্থানই দেখেন, শৈবালা
কত জলাশয়ই দেখেন, কিন্তু কে বলিয়া দিবে, কোথায় কি ছি
পুরাণে যে সব বর্ণনা আছে, তাহার সহিত কতকটা স্থানের মিল কি
এবং সাধুসন্ন্যাসীর নিকট সংবাদপ্রার্থী হইয়া তাঁহারা কতক কতক চিনি
লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর যে সব লোক কাননে প্রান্তরে বাস করি
তাহারা বহুদিনের বাসিন্দা নহে, তাহাদের মধ্যে বংশানুক্রমে কে
জনশ্রুতি ছিল না। অনেক সময়ে সেই নবাগত ভক্তদ্বয়ের নিক
তাহারাই সংবাদ শুনিয়া লইত। দুই বন্ধুতে যে সব লীলাস্থলের
জানিতেন, অথচ স্থান নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না, সেখা
উভয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া যমুনা বা বৃক্ষলতিকার নিকট সংবাদ জিজ্ঞা
করিতেন। তাঁহাদের কাতর অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া লোকে বিস্মি
হইয়া থাকিত। পূর্ব্বে যখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাব
দর্শনে আসেন, তাঁহারাও এইরূপে কাঁদিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহা
স্বল্পসময়ে শুধু তীর্থস্থানদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, প্রকৃত তা
উদ্ধার করিতে আসেন নাই। সে চেষ্টা করিবার ভার লইয়া আসি
ছিলেন, লোকনাথ ও ভূগর্ভ। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞাপালন
আপনাদের তৃপ্তিসাধন জন্য অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছু কিছু তথ্
সন্ধান করিয়া লিখিয়া রাখিতেছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার কিছুদিন পরে লোকনাথ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার আসিবার দুই মাস পরে (১৪৩১ শক) প্রভু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণের জন্য বহির্গত হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া লোকনাথ ও ভুগর্ভের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসমূর্ত্তি দেখেন নাই; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখিবার জন্য তাঁহারা পাগল হইলেন। বৃন্দাবনে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, উভয়ে প্রভুর অনুসন্ধানে দক্ষিণ দেশে চলিলেন। তখনকার দিনে এমন অনুসন্ধান করা বড় কঠিন কাজ ছিল। ফলও তাহাই হইল; দুইজনে সকল দাক্ষিণাত্য ঘুরিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। এদিকে প্রভু প্রায় দুই বৎসর পরে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া, তথায় আর দুই বৎসর (১৫১১-১৩ খৃঃ) অবস্থান করিলেন। পর বৎসর শান্তিপুর ও গৌড় পর্য্যন্ত গিয়া রূপসনাতনকে কিরূপে আত্মসাৎ করিলেন, তাহা পরে বলিব। সে বৎসর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না, নীলাচলে ফিরিলেন। পর বৎসর (১৫১৪ খৃঃ) নীলাচল হইতে ঝাড়িখণ্ডের জঙ্গল পথে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন আসিলেন। তথায় কত লীলাক্ষেত্র অশ্রুসিক্ত করিয়া দর্শন করিলেন, কত স্থানে প্রেমোন্মত্ত মূর্ত্তি দেখাইয়া বৃন্দাবন-বাসীকে পাগল করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু তখনও লোকনাথ ও ভুগর্ভ দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দেখা হইল না। তিনি যখন মথুরা ছাড়িয়া প্রয়াগে আসিলেন, তখন শ্রীরূপের সহিত দেখা হইল। এমন সময়ে লোকনাথ ও ভুগর্ভ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, প্রভু আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বড় বেশী দূর যান নাই। উভয়ে ক্লান্ত হইলেও পাগলের মত প্রয়াগের দিকে ছুটিলেন। পথে

আসিয়া লোকনাথ এক স্বপ্ন দেখিলেন, যেন প্রভু আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন :—

"তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি।
বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি॥
প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল॥"

নরোত্তম-বিলাস, ১৬পৃঃ

স্বপ্নদর্শন করিয়া লোকনাথ যে বাণী শুনিলেন তাহাতে দারু বা পাষাণ দ্রবীভূত হয়। লোকনাথ আশ্বস্ত ও নিরস্ত হইলেন। তখন হইতে তাঁহার যেন সংকল্প হইল 'বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' তিনি আর কখনও শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, ছত্রবনের পার্শ্বে পুরাতন উমরাও গ্রামে শ্রীকিশোরীকুণ্ডের সন্নিকটে কিছুদিন নির্জ্জন স্থানে বাস করিলেন। সেখানে লোকনাথ সৌভাগ্যক্রমে এক পরম সুন্দর শ্রীবিগ্রহ লাভ করিলেন। উঁহার নাম শ্রীরাধাবিনোদ। তিনি একান্ত ভক্তিভাবে প্রাণপণে সেই ইষ্ট দেবতার সেবা করিতে লাগিলেন। লোকনাথের কোন সম্বল নাই, গৃহ নাই; তিনি বনবাসী, কাঙ্গালের কাঙ্গাল। বনবাসীরা তাঁহার জন্য কুটীর বানাইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু তাহা তিনি চাহিলেন না; তিনি বৃক্ষমূলে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীবিগ্রহের জন্য কোন মন্দির নাই, তাঁহাকে বৃক্ষ-কোটরে রাখিয়া সেবা করিতেন; তুলসী জলে পূজা করিতেন, শাকান্নে ভোগ দিতেন, পুষ্পশয্যায় শয়ন করাইয়া বৃক্ষপল্লবে বাতাস করিতেন। কিন্তু লোকনাথের কার্য্য ছিল তীর্থের সন্ধান করা, তজ্জন্য তাঁহাকে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। এমন অবস্থায় ঠাকুরটিকে কি করেন,

তাহাই সমস্যা হইল। অবশেষে এক ঝোলা প্রস্তুত করিলেন, তাহারই মধ্যে ঠাকুরকে বসাইয়া কণ্ঠমালার মত গলে ঝুলাইয়া নানাস্থানে ঘুরিতেন। আবার সময় মত দু'বেলা প্রায়ই সেই কিশোরীকুণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া, যেখানে ঠাকুরকে পাইয়াছিলেন সেইস্থানের নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষকোটরে ঠাকুরকে বসাইয়া সজলনেত্রে তাঁহার সেবা করিতেন।* ভূগর্ভ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ক্রমে এই দুই অপূর্ব্ব চরিত্র ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি স্থানীয় লোকের ভক্তি বাড়িতে লাগিল। বনবাসীরা উঁহাদের সেবার জন্য ফলমূল আনিয়া দিত; কিন্তু উঁহারা যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহাই মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিতেন। তাঁহাদের কোন ভোগ-বাসনা, কোন সঞ্চয়-বুদ্ধি ছিল না। লোকনাথের আদর্শ ভক্তজীবনের বর্ণনা "ভক্তিরত্নাকরে" এইরূপ আছে :—

"যে বৈরাগ্য তাঁর তা' কহিতে অন্ত নাই।
শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাই ॥
ফলমূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়।
যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয় ॥
বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষ তলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্ব্বাস ॥
আপনি হইতা সিক্ত অতি বৃষ্টি নীরে।
ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে ॥
অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া ॥"

৫ম তরঙ্গ, ২৪৮ পৃঃ

---

* এখন এই স্থানের নাম শ্রীগোকুলানন্দ। তথাকার মন্দিরে লোকনাথের ইষ্টমূর্ত্তি রাধাবিনোদ বিরাজমান আছেন।

এই ভাবে দিন যাইতে লাগিল। তীর্থোদ্ধারের কার্য্য ক্রমে যত অগ্রসর হইতেছিল, লোকনাথের ঘোরাফেরা একটু কমিতেছিল; অবসর পাইয়া সাধন ভজনের কার্য্য একটু বাড়িতেছিল। ক্রমে অন্যান্য ভক্তেরা বৃন্দাবনে আসিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীচৈতন্য প্রয়াগ হইতে শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া ছিলেন (১৫১৪ খৃঃ)। তৎপরে তিনি কাশী যান, সেখানে দীনহীন কাঙ্গালের বেশে শ্রীসনাতন আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় লন; প্রভু উঁহার প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিয়া উঁহাকেও ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। শ্রীরূপের বৃন্দাবনে আসিবার কয়েকমাস পরে সনাতন আসিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই রূপ গৌড়ের দিকে গিয়াছিলেন এবং নীলাচল ঘুরিয়া অনেকদিন পরে বৃন্দাবনে ফিরিলেন। এইজন্য সনাতনের সহিত রূপের দেখা হইল না। সনাতন ও বৃন্দাবনে আসিয়া কিছুদিন পরে নীলাচলে গিয়া প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। সবিস্তর পরে বলিব। এইবার অগ্রে রূপ ও পরে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া স্থায়িভাবে বসিলেন (১৫১৬ খৃঃ)।

তখন ইঁহাদের দুইজনের সঙ্গে লোকনাথের পরম মিত্রতা হইল। আরও ভক্তেরা আসিলেন; কিন্তু লোকনাথ ও রূপসনাতনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ ও প্রধান। লোকনাথ যে সব তীর্থের সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরূপ সনাতনকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের অনুমোদিত করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে ও সমবেত শাস্ত্র বিচারের ফলে ঐ সকল তীর্থের নামকরণ করিলেন। শ্রীমন্নারায়ণ ভট্ট ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খৃঃ) সংস্কৃত ভাষায় "শ্রীব্রজভাব বিলাস" নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে আছে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ৩৩টি বনের আবিষ্কার করেন।* এই গ্রন্থ শ্রীরূপ সনাতনের জীবদ্দশায় লিখিত,

* "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস) ১৭৩ ও ১৮৭ পৃঃ

তখন তাঁহাদের বিনানুমোদনে কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। সুতরাং এই গ্রন্থ হইতে শ্রীলোকনাথের অদ্ভুত কার্য্য কারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরূপ সনাতন দুই ভ্রাতায়ও অনেক নূতন তীর্থের আবিষ্কার এবং শ্রীবিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরে শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামী আসিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থের প্রকাশ করেন। এইরূপে শ্রীচৈতন্য দেব কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত ভক্ত-গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের অসংখ্য লুপ্ত তীর্থের সমুদ্ধার হয় এবং নব বৃন্দাবনের সৃষ্টি হয়।

(৬)

প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ

গৌড়ীয় ভক্তগণ ক্রমেই বৃন্দাবনের নানাস্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বৃক্ষলতিকার অন্তরালবর্ত্তী তাঁহাদের ভজন কুটীরকে কুঞ্জ বলিত; বৃন্দাবন কুঞ্জে কুঞ্জে ভরিয়া গেল, ভক্তের ভজন সঙ্গীতে নিস্তব্ধ অরণ্য মুখরিত হইল। এই সকল ভক্ত সাধকেরা ভিক্ষায় সংগ্রহের প্রয়োজন ভিন্ন বাহিরে আসিতেন না, অসংখ্য তীর্থযাত্রীরা তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া নয়ন সার্থক করিত। লোকনাথও ভূগর্ভের পর রূপ, সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব আসিলেন, কাশী হইতে প্রবোধানন্দ ও রঘুনাথ ভট্ট আসিলেন, দাক্ষিণাত্য হইতে গোপাল ভট্ট আসিলেন। ইহা ভিন্ন শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় তাঁহার

আদেশ ও উপদেশে কত ভক্ত যে বৃন্দাবনে আসিয়া ধন্য হইতেন, তাহা বলিবার নহে। এমন সময়ে নীলাচলে অকস্মাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অপ্রকট হইলেন। তখন রঘুনাথ দাস প্রভৃতি ভক্তগণ ব্রজধামে আসিয়া অবস্থান করিলেন। ইহারা সকলেই যেমন ভক্ত, তেমনই পণ্ডিত; এক এক জন স্থানে স্থানে এক একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখিলেন, ভারতের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের দৃষ্টান্ত জন্য সকল প্রদেশের অঙ্গুলি বৃন্দাবনের পানে ফিরিয়া রহিল।

এখন যেখানে বৃন্দাবনের গোকুলানন্দ আশ্রম, সেইস্থানে বনের মধ্যে লোকনাথের কুঞ্জ ছিল। তাহা পথ হইতে দূরে, বৃক্ষবল্লীর আড়ালে, নিভৃত নিলয়ে স্থাপিত। সহজে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। লোকনাথও বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কুঞ্জ ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতেন না; যাঁহার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহারই ধ্যান-ধারণায় পূজার্চ্চনায় তাঁহার দিবা বিভাবরী অতিবাহিত হইত। তখন রূপ গোস্বামীই ব্রজমণ্ডলের কর্ত্তা, বিপন্নভক্তের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে সেখানে যে একপ্রকার বৈষ্ণব বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, শ্রীরূপ তাহার কর্ণধার। কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবমতের মূল ধ্বংস করিবার জন্য গোস্বামিগণের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিচার বা জয় পরাজয় রূপের ব্যবস্থায় হইত; কোন কিছু নূতন বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, তাহা রূপই সকলের পরামর্শ লইয়া করিতেন। এ সব ব্যাপারে লোকনাথের সময়ক্ষেপ করিতে হইত না। তিনি নিজের সাধন ভজন ও দেবসেবা লইয়াই থাকিতেন।

কিন্তু বৃন্দাবনের সে প্রদীপ্ত প্রভাব বহুদিন রহিল না। শ্রীচৈতন্যে অন্তর্ধানের পরই অনেক কমিয়াছিল, ক্রমে গৌড়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও

অদ্বৈত প্রভুদ্বয় দেহরক্ষা করিলেন। তখন বাহিরের স্রোতের মুখ কতকটা বন্ধ হইয়া গেল। "একে একে নিভিল দেউটি"; বৃন্দাবনে প্রথমে শ্রীসনাতন, পরে অল্পকাল মধ্যে শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী অন্তর্ধান করিলেন। তখন বৃন্দাবন আঁধার হইয়া গেল; সকলের মুখে বিষাদের কালিমা পড়িল, নবোদ্যমের স্ফূর্তি বা গভীর জ্ঞানপ্রতিভা সব নিষ্প্রভ হইয়া গেল। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, বৃন্দাবন হইতে ১০।১২ মাইল দূরে রাধাকুণ্ডের সন্নিকটে কঠোর সাধনায় কাল কাটাইতে ছিলেন; বৃন্দাবন ও সাধারণের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। সেখানে থাকিলেন প্রধান তিন প্রভু শ্রীলোকনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব। অসাধারণ পাণ্ডিত্যে শ্রীজীবের তুলনা নাই, শ্রীরূপের দেহত্যাগের পর তিনিই বৃন্দাবনের কর্ত্তা। বয়সে ও কার্য্যকারিতায় তিনিই সে পদের উপযুক্ত। বৈষ্ণবের ধর্ম্মসংহিতার গ্রন্থকার রূপে ও মহাপ্রভুর মনোনয়নের ফলে শ্রীগোপাল ভট্ট ব্রজপুরীর গুরুস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু প্রভু লোকনাথ বয়সে সকলের বড়, সাধনায় উঁহাদের অগ্রবর্ত্তী, ত্যাগে ও দৈন্যে সকলের বরণীয়।

বৃন্দাবনে যে ভক্তিশাস্ত্র রাশি রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ এই তিন জনের তত্ত্বাবধানে ছিল। কিন্তু উহা প্রচারিত হইবে কিরূপে? যে বঙ্গ হইতে ভক্তির প্রস্রবণ ছুটিয়াছিল, সেখানে হৃদয়-ভূমি সিক্ত করিবার কি ব্যবস্থা হইবে? তিন জনে যখন ইহাই ভাবিতে ছিলেন, তখন অলক্ষ্য সূত্রে উহার পথ খুলিয়া গেল। নীলাচলে ও গৌড়ে প্রভুদিগের তিরোধানের পর নবধর্ম্মের প্রচার পথ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাহা বুঝিয়াছিলেন. তাঁহার প্রেরণার ফলে তাঁহাদের তিন জনের স্থলে কতকটা অভাব পূরণের জন্য তিনজন ভক্তের আবির্ভাব হয়। ইহারা শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। আচার্য্য শ্রীনিবাস ছিলেন

ব্রাহ্মণ, ঠাকুর নরোত্তম কায়স্থ এবং গোস্বামী শ্যামানন্দ ছিলেন সদ্গোপ জাতীয়।* ইহাদের কাহারও সহিত মহাপ্রভু বা রূপসনাতনের দেখা হইল না, অথচ দর্শন লাভের জন্য তাঁহারা সকলেই লালায়িত। তিন জন তিন পথে ছুটিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন গোস্বামীর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীনিবাস হইলেন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য, শ্রীজীব শ্যামানন্দকে দীক্ষা দিলেন। নরোত্তম কিরূপে লোকনাথ গোস্বামীর কৃপালাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই এক্ষণে বলিব। এই তিন ভক্ত শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীজীবের প্রধান চেষ্টায় এই তিন ভক্তদ্বারা ভক্তিগ্রন্থ সমূহ প্রচারিত হয়। রাঢ়-বঙ্গ শ্রীনিবাসের শিষ্যে ছাইয়া যায়; উড়িষ্যার ভক্তিরাজ্যে শ্যামানন্দ প্রাধান্য লাভ করেন। সমস্ত উত্তর বঙ্গ হইতে আসাম পর্য্যন্ত যাঁহার প্রচার ক্ষেত্র ছিল, তিনিই নরোত্তম। ভক্তের জাতিতে কি আসে যায়, ইহাদের সকলেরই বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। এই নরোত্তম লোকনাথের একমাত্র শিষ্য।

বর্ত্তমান রাজসাহী জেলায় গরাণহাটি পরগণার মধ্যে পদ্মাতীরবর্ত্তী খেতরী গ্রামে এক উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ জমিদারের বাস ছিল। তাঁহার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ রায়, উপাধি "দত্ত", কিন্তু নবাবদত্ত উপাধি ছিল মজুমদার। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম পুরুষোত্তম মজুমদার। রাজা কৃষ্ণানন্দের বহুলক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। সে বিপুল ঐশ্বর্য্যে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজপরিবারের বারমাসে তের পার্ব্বণ স্বচ্ছন্দে সমারোহে চলিত।

---

* শ্রীনিবাসের নিবাস ছিল গঙ্গাতীরে চাকন্দিগ্রামে, পরে তিনি যাযিগ্রামে বাস করেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। গঙ্গাধরের পরবর্ত্তী নাম চৈতন্যদাস।

শ্যামানন্দের বাল্যনাম দুঃখী, পরে তাঁহার নাম হয় কৃষ্ণদাস। দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শ্যামানন্দ আখ্যা পান। তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুরের অধিবাসী ছিলেন।

কৃষ্ণানন্দের পত্নীর নাম রাণী নারায়ণী; রাজা যেমন ধার্ম্মিক, রাণী নারায়ণী তেমনি ভক্তিমতী সতীলক্ষ্মী ছিলেন। অনেক কাল সন্তান লাভে বঞ্চিত থাকিবার পর, বহু কাতর প্রার্থনার ফলে তাঁহাদের যে পুত্র লাভ হয়, তিনিই বিখ্যাত ভক্ত নরোত্তম দাস। দাস তাঁহার দৈন্যসূচক বৈষ্ণবোপাধি মাত্র। পিতামাতার আদরের নাম ছিল "নরু"; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নরুর জন্মের বহু বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য যখন গৌড়-রামকেলি হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন এই খেতরীর পথে কুতবপুরে পদ্মাপার হন। সে সময় তিনি সঙ্কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া নরোত্তম বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, ভক্তগণ বলেন সেই শক্তি সঞ্চারের ফলে বহু বর্ষ পরে নরোত্তমের জন্ম হয়। মহাপ্রভুর প্রকট কালেই নরোত্তমের জন্ম হয় বটে, কিন্তু নরু তাঁহাকে দেখেন নাই। তবুও বাল্য হইতেই শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিলেই নরু শিহরিয়া উঠিতেন, তাহার দেহে কেমন নবভাবের আবির্ভাব হইত। ভক্তির ভাব তাহার সকল অঙ্গে প্রসারিত হইয়াছিল। সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার পর তাহাকে বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া যখন তাহার পিতা বিবাহ দ্বারা তাঁহাকে ভুলাইয়া গৃহে রাখিবার চেষ্টা করিলেন, তখনই নরোত্তম কোন সূত্রে পলায়ন করিয়া, ধর্ম্মোন্মাদে পথের লোককে প্রমত্ত করিয়া, অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত শীর্ণ তনু লইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে তখন জীব গোস্বামী কর্ত্তা, দীন ভক্তের আশ্রয় স্থল। তিনি নরোত্তমকে আশ্রয় দিলেন। রূপ সনাতনের সঙ্গোপনে বিষাদখিন্ন বৃন্দারণ্য তখন অন্ধকারময়। শ্রীজীব রাজকুমার নরোত্তমের পরিচয় জানিলেন; রাজপুত্র বলিয়া তিনি সে আদর যত্ন পাইতেন না, তাঁহার প্রকৃত ভক্তমূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীজীব স্নেহবিগলিত হইলেন। তিনি নরোত্তমকে লইয়া গিয়া দেববিগ্রহ সকল দর্শন করাইলেন, বনের মধ্যে কুঞ্জে কুঞ্জে গোস্বামী প্রভুদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। নরোত্তম রাজার পুত্র,

রাজার মতই তাঁহার রূপ; জীর্ণ দীর্ণ মলিন বেশের মধ্য দিয়া সে রূপে জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছিল। ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি দেখিয়া তত্ত্বদর্শী গোস্বামীরা মুগ্ধ হইলেন। আর লোকনাথের মূর্ত্তি দেখিয়া নরোত্তম আত্ম হারা হইয়া গেলেন। এই সময়ে শ্রীনিবাসের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল শ্রীনিবাস কিছুকাল পূর্ব্বে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সহিত রূপ সনাতনের দেখা হয় নাই। প্রথম দেখার সময় হইতে কোন এব অজানিত দিব্য প্রীতির টানে উভয়ের ভিতর এক চিরসৌহৃদ্য সংস্থাপিত হইয়া গেল। উভয়ের হৃদয় এক, একই উদ্দেশ্যে উভয়ে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন; পরবর্ত্তী জীবনে বঙ্গভূমিতে একই মহাপথে উভয়ের ভক্ত- জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনে ভক্তিসাগর-সঙ্গমে চাক্ষুষ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে চিরমিলন হইয়া গেল। শ্রীনিবাসের সঙ্গে গিয়া নরোত্তম রাধাকুণ্ডে শ্রীযুক্ত দাস-গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং গোবর্দ্ধনে রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি নানাস্থানে ভক্তগণের সঙ্গে ... করিয়া আসিলেন। কিন্তু যেখানেই যান, নরোত্তমের মনোভৃ লোকনাথের পদ-পঙ্কজেই পড়িয়া ছিল। লোকনাথকে প্রথম দর্শ করিবা মাত্র তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হইয়াছিল, উহার ফ তিনি না বুঝিয়া না ভাবিয়া তাঁহার চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্প করিয়াছিলেন।

লোকনাথ ভাবে ভঙ্গিতে এমন কি সরল কথায় নরোত্তমের প্রার্থ জানিয়া ছিলেন। কিন্তু সে প্রার্থনা কেমন করিয়া তিনি পূর্ণ করিবেন যে বংশে তাঁহার জন্ম, সেই তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশীয়েরা কেহ কখন শিষ্য গ্রহণ করেন নাই। এখনও এ বংশে শাস্ত্রপারদর্শী উন্নত চরি ত্যাগী ভক্ত পুরুষ আছেন, কিন্তু কেহ শিষ্য করেন না। শিষ্য করা অনেক দায়িত্ব; পরের ভব-পারের দায়ী হইতে হইলে, নিজের কার্য্যে

নেক ক্ষতি হয়, সংসারের সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না। স্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইবার জন্য লোকনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি কছুতেই কাহাকেও শিষ্য করিবেন না। নরোত্তমকে কত বুঝাইয়া লিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে প্রবোধ মানিল না। তিন বন্ধুর মধ্যে নিবাস ও শ্যামানন্দের দীক্ষা হইয়াছে। নরোত্তম লোকনাথের পানে হিয়া রহিলেন। রাজার পুত্র কঠোর ব্রত অবলম্বন করিলেন, কত নুনয় বিনয় করিয়া অশ্রুজলে কুঞ্জ-কুটীর অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু লাকনাথের দয়া হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না। রোত্তমও প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি একবার যাঁহাকে আত্মসমর্পণ রিয়াছেন, আমরণ তাঁহারই চরণ ব্যতীত অন্যগতি অবলম্বন করিবেন া। জগৎ এই বার দেখিবে, কাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।

নরোত্তমের সাধন-জীবন চলিতে লাগিল। তিনি লোকনাথের কুঞ্জের নতিদূরে বনমধ্যে এক ঝুপড়ী বান্ধিয়া বাস করিলেন; কুটীরে বসিয়া াম জপ ও ভজন করিতেন; সময় পাইলে শ্রীজীবের নিকট ভক্তি-গ্রন্থ কছু কিছু অধ্যয়ন করিতেন; তিনি সর্ব্বদাই গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিতেন, ভগবানের নিকট তাঁহার কৃপালাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা সজলনেত্রে প্রার্থনা রিতেন। অথচ প্রভুর সম্মুখে আসিতেন না, কিছু বলিতেন না, কোন াবে তাঁহাকে বিরক্ত করিতেন না, শুধু সকাল সন্ধ্যায় প্রভুর কুঞ্জের তুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ইষ্ট নামে টহল করিয়া বেড়াইতেন; এই ভাবে অলক্ষ্যে রুদেবের দেহরক্ষী হইয়া সেই বনের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কসে গুরুর কৃপালাভ করিবেন, তাহাই তাঁহার ধ্যান ধারণার এক মাত্র াধনা হইল। অবশেষে, তিনি গুরুসেবা করিবার জন্য এক অদ্ভুত পন্থা উদ্ভাবন করিলেন।

লোকনাথ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া কুঞ্জের কাছে বনের মধ্যে এক

স্থানে বহির্দ্দেশে যাইতেন। রাজকুমার উহারও কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে শেষ রাত্রিতে ঐ স্থানে গিয়া স্থানটি পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন, হাত ছানি করিবার জন্য ভাল মাটি ও জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। ঝাড়ু দিবার ঝাটা গাছি মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। * আর প্রত্যহ সমান ভাবে এই কার্য্য করিয়া নরোত্তম নিজে কত আনন্দ লাভ করিতেন, প্রভুর যদি একটুও তৃপ্তি হয়, এই ভাবিয়া ঝাটা বুকে ঝর ঝর ধারায় তাঁহার আঁখি জল ঝরিত।

"আপনারে ধন্য মানে শরীর সফল।
প্রভুর চরণ প্রাপ্তে এই মোর বল॥
কহিতে কহিতে কাঁদে ঝাঁটা বুকে দিয়ে।
পাঁচ সাত ধারা বহে মুখ বুক বেয়ে॥"

প্রেঃ বিঃ

লোকনাথ প্রত্যহ আসিয়া এই সেবা লক্ষ্য করিতেন, কোন ব্রজবাসী এরূপ করে বলিয়া সন্দেহ হইত, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেন

"যেই স্থানে গোসাঞি করেন বহির্দ্দেশ।
সেই স্থানে যাই করে সংস্কার বিশেষ॥
মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।
নিত্য নিত্য এই মত করেন সেবনে॥
ঝাটা গাছি পুতি রাখে মাটির ভিতরে।
বাহির করি সেবা করে আনন্দ অন্তরে॥"

প্রেম বিলাস, ১১শ উল্লাস,

"মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটি আনে।
ছড়া ঝাটা জল আনে বিবিধ বিধানে॥"

অনুরাগ বল্লী,

না। এই ভাবে বৎসর কাল গেল, শীত বর্ষা সকল ঋতুতে সেই একই ভাবে নরোত্তম গুরুর উদ্দেশ্যে এই ভাবে ফাড়ির সেবা করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রভুর মনে বড় ধাক্কা লাগিল। তিনি ভাবিলেন, যেই এরূপ করুক, উহাতে তাঁহার নিজের পাপ সঞ্চয় হইতেছে, অতএব এরূপ আর করিতে দেওয়া হইবে না। একদিন তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, ছয় দণ্ড রাত্রি থাকিতে, হঠাৎ বহির্দ্দেশে আসিলেন, দেখিলেন কে যেন অন্ধকারে স্থান মার্জ্জনা করিতেছে। নরোত্তমের সরিয়া যাইবার সুযোগ হইল না, এমন সময়ে গোস্বামী প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

উত্তর হইল—"আমি নরোত্তম।"

প্রশ্ন—"তুমিই কি প্রত্যহ এরূপ কার্য্য কর?"

উত্তর—"আজ্ঞা, হাঁ।"

প্র—"কেন কর?"

উ—"প্রভো! কেন করি, তাহা জানি না; মনে করিতে বলে তাই করি। আমি অতি অভাজন, দীনহীন কাঙ্গাল, বৃন্দাবনে আসিয়াই আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এখন আমার অন্য গতি নাই। আমাকে এই গুরুসেবায় বঞ্চিত করিবেন না।"

শুধু ইহাই নহে, নরোত্তম নিতান্ত অপরাধীর মত কোমল স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া তাহার নিজ জীবনের সকল কথার সার ভাগ সজলনেত্রে প্রভুকে বুঝাইয়া বলিলেন, কিরূপে তিনি জন্মের বহু পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি রাজার রাজ্য, সুখের সংসার সব ত্যাগ করিয়া ইষ্ট লাভের জন্য বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, কিরূপে গুরুকৃপাই তাহার একমাত্র পথ। শুনিয়া গদগদ ভাবে প্রভু বলিলেন "নরোত্তম, তুমি ব্রজবাসী ভক্ত, তুমি মহাপ্রভুর কৃপাধিকারী, তুমি এ কার্য্য আর

করিও না, ইহাতে আমার বড় দুঃখ হয়, আমার পাপ হয়। আমি বড় ব্যথা পাইতেছি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিতেছি না।” নরোত্তম নীরব। প্রভু বড় বিপদে পড়িলেন, একদিকে প্রতিজ্ঞা, অন্য পক্ষে এমন ভক্তকে প্রত্যাখ্যান করাও ত বড় শক্ত। ভাবিতে ভাবিতে প্রভু বহির্দ্দেশে গেলেন। নরোত্তম দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রভু ফিরিয়া আসিলেন, মুখ খানি গম্ভীর। নরোত্তম শৌচের জন্য মাটি আনিয়া দিলেন, জল দিলেন, প্রভু গ্রহণ করিলেন, কোন কথা বলিলেন না, আপত্তি করিলেন না। নরোত্তম গলিয়া গেলেন।

লোকনাথ কুঞ্জে আসিলেন, নরোত্তম সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কোন কথাবার্ত্তা হইল না, সেই দিন হইতে প্রভুর প্রসন্নতা দেখা দিল। নরোত্তম সেই দিন হইতে সর্ব্বদা কুটীরে থাকিয়া নানা ভাবে সেবা করিতে লাগিলেন, প্রভূ আপত্তি করিতেন না। এই ভাবে আরও কয়েক মাস পরীক্ষা চলিল। সে নির্ব্বাক পরীক্ষায় শিষ্য উত্তীর্ণ হইলেন। অবশেষে একদিন প্রভু ডাঁকিয়া নরোত্তমকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আকাশের মেঘ কাটিয়া গেল। নির্ম্মল গগনে আনন্দের দীপ্ত রশ্মি দেখা দিল। গুরু শিষ্যের প্রতি সদয় হইলেন।

একদিন লোকনাথ নরোত্তমকে ডাকাইয়া কাছে বসাইয়া তাহাকে শপথ করাইয়া লইলেন, তিনি জীবনে কখনও মৎস্যাদি ভোজন করিবেন না, বিষয় বিলাসাদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেন না, তিনি চিরকুমার থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। এ সকল ব্রতই নরোত্তম কঠোর ভাবে পালন কবিতেছিলেন, সুতরাং তিনি সানন্দ চিত্তে গুরুর সমীপে শপথ করিলেন। তখন লোকনাথ সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন আর স্পষ্ট স্বরে বলিলেন “নরোত্তম! তুমি নরোত্তমই বটে, আজ হইতে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। তোমার মত শিষ্য পাইলে দেবতারাও ধন্য হন, আমি

আমাকে দীক্ষা দিব। সম্মুখে শ্রাবণী পূর্ণিমা, পুণ্য তিথি ; সেইদিন তোমার দীক্ষা হইবে।" উচ্ছ্বসিত আনন্দাবেগে নরোত্তম পদপ্রান্তে পড়িয়া, তাঁহার পা দু'খানি বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিলেন, অশ্রুর প্রবাহে গুরুদেবের পদ ধৌত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর ব্রত উদ্‌যাপিত হইল।

নরোত্তমের আনন্দ আর ধরে না। তিনি দৌড়িয়া গিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে গোস্বামী ও অন্যান্য ভক্তগণকে একে একে আনন্দের সংবাদ দিয়া আসিলেন। সকলেই তাঁহার কঠোর সাধনায় বড় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সকলে আশ্বস্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীজীব গোস্বামী রাজকুমারের ভাগ্য দেখিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল ভক্তবৃন্দ লোকনাথ প্রভুর কুঞ্জে সমাগত হইলেন। প্রকৃষ্ট বিধানে স্নানপূত নরোত্তমের পবিত্র দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইল। গুরুদেব প্রসন্নবদনে শিষ্যের সকল পাপের বোঝা নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ইষ্টমন্ত্র দান করিলেন। সমবেত ভক্তগণ সকলে আনন্দ কোলাহলে কুঞ্জ-কুটীর মুখরিত করিয়া তুলিলেন। ভক্তাগ্রগণ্য শিশিরকুমার লিখিয়াছেন। "নরোত্তমের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত, গলায় ফুলের মালা, প্রেমানন্দে বদন প্রফুল্ল এবং উহা দিয়া আনন্দ ধারা বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে। রাজকুমার বাহিরে আসিয়া জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহান্তগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সকলে তাঁহার রূপ ও তেজ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।" * লোকনাথের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সেই ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গে দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।

* শ্রীনরোত্তম-চরিত, ৩৩ পৃঃ

(৭)

※ দিবাবসান ※

নরোত্তম দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে গুরুদেবের পদ প্রান্তেই রহিলেন প্রভু তাঁহাকে উপাসনার যাবতীয় নিগূঢ় রহস্য এবং সাধন ভজনের প্রণ শিখাইলেন। সখি ভাবে কিরূপে কৃষ্ণ-সাধনা করিতে হয়, কোন্ সখি ভাবে সাধন অঙ্গ কিরূপ হয়, বিরহ মিলনে সেবার কি প্রকরণ ও ফ হয়,—শিষ্যের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বিরলে বসিয়া গুরু তাহাকে আত্মসাৎ করিলেন। * শ্রীরূপের গ্রন্থ সমূহে এই সকল সাধন রীতি ভাবে বর্ণিত আছে এবং কি ভাবে তাহা শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিলেন গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের সার কথা এই :—

"আপনে আচরে ধর্ম্ম কহেন লোকেরে।
তাহারেই আপনে গৌরাঙ্গ কৃপা করে॥"

যিনি আপনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, গৌরাঙ্গ তাহাকে কৃপা দান করিয়া থাকেন। লোকনাথ ইষ্ট সাধনার যে গূঢ়তত্ত্ব আচরণ করিয়া নিত্য সিদ্ধ হইয়াছিলেন, শিষ্যকে তাহাই যথাযথ শিখাই নিজের পথের পথিক করিয়া লইলেন, তাহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব প্রে রাজ্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন! নরোত্তম সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হই গুরুসেবায় নিরত হইয়া বলিলেন :—

"নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
নিত্য বোধচিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥"

* প্রাচীন বৃন্দাবনের সখির অবতার-স্বরূপ যেমন লোকনাথের নাম ছিল" মঞ্জুলালী এমনই তাঁহার শিষ্য নরোত্তমের নাম হইয়াছিল বিলাসমঞ্জরী।

তাঁহার সেই দিবসব্যাপী সেবার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি গুরুদেবের শৌচাদির ব্যবস্থা করিতেন, স্নানান্তে তুলসী পুষ্প আহরণ করিয়া আনিতেন, ৺ঠাকুর পূজার ও ভোগরন্ধনের সকল আয়োজন করিয়া দিতেন, গুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি পাইতেন। প্রভু যখন জপে বসিতেন, বিনিদ্র নরোত্তম তাঁহাকে ব্যজন করিয়া মশা মাছি তাড়াইতেন; প্রভু যখন শয়ন করিতেন, নরোত্তম তখন তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতেন। গুরুসেবায় নরোত্তম আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ভাবে কত দিন, কত বৎসর চলিয়া যাইতেছিল, নরোত্তমের তনুমন পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার নূতন তেজঃ-প্রভায় মানুষকে দেবতা গড়িল। তাহাই দেখিয়া শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে "শ্রীঠাকুর" আখ্যা দিলেন, সকলেই সে উপাধিতে সম্মতি দিলেন, তখন হইতে "শ্রীঠাকুর" বা "ঠাকুর মহাশয়" বলিলে নরোত্তমকেই [illegible]ইত। শিষ্যের গৌরবে লোকনাথ ধন্য হইলেন। লোকে সর্ব্বত্রই [illegible] লাভ করিতে চায়, কেবল পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় [illegible]চ্ছা করে।

লোকনাথ ক্রমে জরাগ্রস্ত স্থবির হইয়া পড়িতেছিলেন; পূজার্চ্চনার সকল রীতি রক্ষা করিতে পারেন না, জপ-সংখ্যাও প্রত্যহ পূর্ণ হয় না। তবুও তিনি স্বাবলম্বনের পূর্ণ মূর্ত্তি, কাহারও অপেক্ষা করিতে চাহিতেন না। নরোত্তম যে এত সেবা করিতেন, তবুও তিনি পরবশ হইলেন না। [illegible]াত্তমের যখন গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা হইল, তিনি তাহাকে অম্লান [illegible]নে অনুমতি দিলেন; অথচ দ্বিতীয় কোন শিষ্য গ্রহণ করিলেন না। [illegible]াত্তমই তাঁহার একমাত্র শিষ্য। লোকনাথের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল, তিনি আপনার কথা কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কোন প্রকারে কেহ তাঁহার কোন গুণ গাথা গায়, তাহা তিনি পছন্দ

করিতেন না। তিনি নিজে কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখেন নাই, * অথচ রূপ সনাতন ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণের গ্রন্থের সাধন-তত্ত্বের অনেক সারাংশ তাঁহার নিকট হইতে গৃহীত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনের সকল ভক্তগণের উপদেশ ও আনুকূল্যে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" রচনা করিতেছিলেন, তখন লোকনাথও তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নিজের কোন প্রসঙ্গ-উল্লেখ করিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই যে বিরাট গ্রন্থে সে যুগের বহু কথা, বহু ঘটনা চোকের জলের কালীতে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকনাথের কোন কথা নাই। সে যুগে এমন আত্মগোপন গোপালভট্ট ব্যতীত গোস্বামীপাদদিগের মধ্যেও আর কেহ করেন নাই। লোকনাথ গোস্বামীর জীবদ্দশায় কোন লেখক তাঁহার কোন কথা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। এই জন্যই লোকনাথ-চরিত্রের অনেক তথ্য মনুষ্য-নেত্রের পথবর্ত্তী হইবার অবসর পাইতেছে না। লোকনাথের মত নিস্পৃহ, সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ অতি বিরল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইবার পর শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনের সকল ভক্তের পরামর্শ লইয়া স্থির করেন যে, রূপসনাতন প্রভৃতি সকল

* লোকনাথ দাস-প্রণীত "সীতা-চরিত্র" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাতে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর জীবন-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন ইনি লোকনাথ গোস্বামী। ইহা বিচিত্র নহে, অদ্বৈত-পত্নীর নামও যেমন সীতা লোকনাথের নিজ জননীর নামও সীতা। শৈশবদশায় অদ্বৈত-গৃহে গুরু-পত্নীর নিকট লোকনাথ মাতৃস্নেহ পাইয়া ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হয়তঃ তাঁহার লিখিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই, এজন্য চৈতন্য চরিতামৃতে তাহার উল্লেখ নাই। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", ৩২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গোস্বামীর রচিত অসংখ্য শাস্ত্র-গ্রন্থ বৃন্দাবনে স্তূপীকৃত হইয়া রহিল, উহা গৌড় দেশে প্রচারিত হইবার কোন সুযোগ হইতেছে না, অতএব এই সকল গ্রন্থরাশি শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন ভক্ত-শিষ্যের সঙ্গে উপযুক্ত যানবাহন ও রক্ষী সহ বঙ্গদেশে পাঠান হউক। লোকনাথও ইহার অনুমোদন করিলেন, এবং গুরুদেবেরা তিন শিষ্যকে যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। গ্রন্থ লইয়া চলিয়া যাইবার সময় আসিলে, নরোত্তম একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া গুরুদেবের সমীপে উপনীত হইলেন। মহাস্থবির লোকনাথের বয়স এই সময়ে একশত বৎসরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। কিন্তু তবুও তিনি সাশ্রুনেত্রে একমাত্র শিষ্যকে বিদায় দিলেন, কারণ জীবের মঙ্গলই এই দূরদর্শী মহান্তগণের জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি বুঝিয়াছিলেন নরোত্তম দ্বারা বহু জীবের মঙ্গল সাধিত হইবে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার কার্য্য অব্যাহত রাখিবার জন্য নরোত্তমের ন্যায় কঠোরব্রতী ভক্ত-সাধকের একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে প্রিয় শিষ্যকে বিদায় দিলেন, তাঁহার কথার ভাবে একটুও মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল না। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই:—"আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ব্রত পূর্ণ হউক; আবার বলি, বিষয় সংস্পর্শ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া ভজনানন্দে দিন কাটাইবে এবং অসংখ্য জীবের মঙ্গল সাধন করিবে। কখনও কাহাকেও শিষ্য করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তোমার পুণ্য-প্রভায় আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহাতে আমি ক্ষুণ্ণ নহি, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। তুমি আমার এক মাত্র শিষ্য, আমি আর কাহাকেও শিষ্য করি নাই। যে কয়দিন জীবিত আছি, আর কাহাকেও শিষ্য করিব না। তুমি জীবের মঙ্গল কর, তাহাতেই আমার আনন্দ হইবে। তোমার আর কখনও বৃন্দাবনে আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমাতে আমাতে আজ

এই শেষ দেখা।"—এই বাণী শুনিবামাত্র নরোত্তম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন যখন চেতনা প্রাপ্ত হইলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের পদধূলি এ পাদুকা লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। *

ইহার পর লোকনাথ আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ১৫ শাকে বা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর অন্তর্ধান ঘটে শ্রীলোকনাথ উহার পূর্ব্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন। তখন তাহার বয় শতাধিক বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। আধুনিক গোকুলানন্দ মঠে তাঁহার সমা আছে ও তাহার পার্শ্বে নরোত্তম ঠাকুরের সাধনাসন প্রদর্শিত হয় উহার সন্নিকটবর্ত্তী মন্দিরে লোকনাথের আরাধ্য দেবতা শ্রীরাধাবিনোদে বিজয়-মূর্ত্তি নিত্যপূজিত হইতেছেন। ঐ মন্দিরে শ্রীরঘুনাথ দাস ঠাকুরে আরাধিত ঠাকুর শ্রীগিরিধারী জীউ এবং ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার পর ভাগবত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেবিত শ্রীগোকুলানন্দ ঠাকু বিরাজমান। বিশ্বনাথের ঠাকুরের নামে এক্ষণে মঠের নাম হইয়াছে গোকুলানন্দ। এই স্থানে গিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্ত আধুনিক বৃন্দাবনে সমুদ্ধারের অগ্রদূত ভক্তাবতার শ্রীলোকনাথ গোস্বামীদেবের স্মৃতি-পূজ করিয়া থাকেন।

সম্পূর্ণ

* শুনিতে পাওয়া যায়, এখনও এই পাদুকাদ্বয় খেতরীর মন্দিরে নিত্য পূজিত হইতেছেন।

গোকুলানন্দ মঠে

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাধি মঠ।

[সম্মুখের গৃহে ঠাকুর নরোত্তমের সাধনাসন আছে

৫২ পঃ

শ্রীসনাতন গোস্বামী

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণ-মণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী

(১)

পূর্ব্ব ভাষ

মানবের মনে অদ্বৈতভাবের চৈতন্য জাগিলে যেমন সে চিরদিন ...্যানন্দ উপভোগ করে, সেইরূপ বঙ্গদেশে একদিন নিদারুণ ধর্ম্মগ্লানি ...স্থিত হওয়ায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কাতর প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্যদেবের ...র্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া একত্রে জুটিয়াছিলেন। ...তিন প্রভুই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক ; তন্মধ্যে কেন্দ্রস্থলে ...ইয়াছিলেন আধুনিক কৃষ্ণমন্ত্রের দীক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তিনি প্রভু এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্য দুইজন প্রভু ; তন্মধ্যে যিনি নবধর্ম্মমতের কল্পনা করিয়া তাহার আয়োজন করেন, তিনি প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য এবং নবমত যিনি বঙ্গের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া কালের প্রয়োজন ... করেন, তিনি প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ। এই তিন জনের মধ্যে ...কেও বাদ দিয়া অন্যের সাধনা বা শক্তিমত্তা বুঝিতে পারা যায় না, ... বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বহুস্থলে এই তিন প্রভুরই মূর্ত্তির একত্র চলিতেছে।

...ঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইঁহারা যে ধর্ম্ম গড়িয়া দেশময় তুমুল ...লন তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ কয় শতাব্দী পার হইতে পারিত, কে জানে ? কারণ বঙ্গের যাঁহারা শক্তিশালী বা সমৃদ্ধিশালী লোক,

সমাজে যাঁহারা কুলীন বলিয়া চিহ্নিত, বঙ্গীয় সমাজের উচ্চস্তরের সে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির অধিকাংশই তখন শাক্তমতাবলম্বী—তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ঘোর শত্রু ছিলেন। পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বংশ-পরম্পরায় যে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্র খ্যাতিসম্পন্ন, ধর্ম্মসাধনা অপেক্ষা আচারনিষ্ঠায় যাঁহাদের অধিক আগ্রহ, তাঁহারা সকলেই নবমতকে অশাস্ত্রীয় এবং অনাচরণীয় বলিয়া উপেক্ষা করিতে ছিলেন। সুতরাং প্রবর্ত্তক প্রভুদিগের অন্তর্ধানের পর, তাঁহাদের ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখা গুরুতর সমস্যার বিষয় ছিল। এদেশে শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত না হইলে কোন ধর্ম্মই টিকিবে না; এই পণ্ডিতের দেশে যেখানে সেখানে তর্ক-যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে না পারিলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—এ রহস্য শ্রীচৈতন্য বুঝিতেন। ভাবের বন্যা জলোচ্ছ্বাস আসিতে পারে, কিন্তু কালে শুষ্ক বালুকায় তাহা শুকাইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাহাকে দৃঢ় মৃত্তিকার খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিলে, উহা স্বপেয় সলিলপূর্ণ গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়া চির পিপাসুর তৃষ্ণা-নিবারণে সমর্থ হইবে না।

এই জন্যই শ্রীচৈতন্য নিজ ভক্তের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া লে পাঠাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বৈষ্ণব মতের শাস্ত্রগঠন ও সঙ্কলন করাই ছিলেন। জগতের সকল জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনিই উপযুক্ত লো নির্ব্বাচনে সুপটু এবং গুণগ্রাহিতায় সূক্ষ্মদর্শী, তিনিই জগতে জয়লা করিয়াছেন। চৈতন্যমতের সাফল্যের ইহাই প্রধান কারণ। তি যাহাদিগকে মোহিনী মূর্ত্তিতে আত্মসাৎ করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করি ছিলেন, তাঁহার সেই বাছা বাছা ভক্তেরা নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের আকর স্থ হইতে রত্নোদ্ধার করিয়া নব প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় মতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট লোকে সর্ব্বপ্রথমে পাণ্ডিত

রাজিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়াছিল, তবে ত নবমতের বিজয়-ত্মকা উড়িয়াছিল! নতুবা আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের কি পরিণতি হইত, ক বলিবে? যে সব সংসারত্যাগী অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী দৈন্যবেশী ন্যাসী ক্তেরা বৃন্দাবনকে কেন্দ্রস্থল করিয়া, তথায় বসিয়া অসংখ্য দার্শনিক গ্রন্থ রথিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি-মূল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে র্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান ছিলেন তিনজন—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী বং উহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন তাঁহার ধর্ম্মকে ভক্তিবাদের সিদ্ধান্তকে সনাতন মতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণিত রিয়াছেন, রূপ সে ধর্ম্মের সাধন-প্রণালীর রূপনির্ণয় করিয়াছেন, জীব বিধ সন্দর্ভে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া সে ধর্ম্মকে চিরজীবী করিয়া গিয়াছেন। * ামরা এক্ষণে এই তিন জনের পরিচয় দিতেছি। শ্রীসনাতন উঁহাদের মধ্যে সে সকলের বড়, প্রথমতঃ তাঁহার জীবনীর সঙ্গে উঁহাদের সকলের ধারণ পিতৃকুল ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রসঙ্গ বলিয়া, পরে পৃথক্ ভাবে ত্যেকের ভক্তি-সাধনা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিব।

(২)

পিতৃ-পরিচয়।

আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট শের কোন অংশে এক রাজা ছিলেন, শ্রীজীব গোস্বামীর নিজবংশ-পরিচয় ইতে জানিতে পারি। † ঐ রাজার নাম শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু। সর্ব্বজ্ঞ ও

* সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভাব প্রান্ত॥" চৈ. চ আদি ৫ম।

† শ্রীজীব গোস্বামী "লঘুতোষণী" নামে শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন রেন; উহার শেষভাগে তিনি যে ভক্তিগর্ভ গুরুগম্ভীর ভাষায় নিজ বংশ-পরিচয়

জগদ্‌গুরু এই দুইটি মধ্যে কোন্‌টি তাঁহার উপাধি, তাহা স্থির করা কঠিন
হয়তঃ তাঁহার প্রকৃত নাম অন্য কিছু ছিল, এই দুইটিই তাঁহার উপাধি
তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ-সমাজে বরণীয় বলি
কোন কোন গুরু-সম্প্রদায়ের মত জগদ্‌গুরু উপাধি-ভূষিত হইতে পারেন
এই কর্ণাট-রাজ ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর যজুর্ব্বেদ

দিয়াছেন, তাহারই সার মর্ম্ম লইয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। কৌতূহ
পাঠকের জন্য স্থানে স্থানে শ্লোকগুলি হইতে দুই এক পংক্তিমাত্র উদ্ধৃত করিব
শ্রীজীব কোথায়ও কোন সময় নির্দ্দেশ করেন নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়; কা
সময় নির্দ্দেশ না করিয়া কোন ঘটনার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকতা রক্ষা করা যায় না
তবুও শ্রীজীবের বর্ণনা হইতে আমরা সমসাময়িক তথ্যের যেটুকু আভাস এবং
বৈষ্ণব গ্রন্থের আলোচনায় যেটুকু সন্ধান পাইয়াছি, সতর্কভাবে তাহার সদ্ব্যবহা
করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, সময়ের উল্লেখ না করিলে বর্ণনার সজীবতা থাকে না
এজন্য সর্ব্বত্র দৃঢ়নিশ্চিত না হইলেও এই চেষ্টার ফলে একটা সময়ের নির্দ্দে
উপস্থাপিত করিলাম; তত্ত্বদর্শী সুধীবর্গ উহার সত্যাসত্য বিনিশ্চয় করিবেন
তবে একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই, বিনা বিচারে কোন মত গ্রহণ বা সিদ্ধা
স্থির করি নাই। শ্রীসনাতনের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে গৌরজীবন শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগ
প্রণীত "শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-রহস্য" ১ম ভাগ এবং শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত কর্ত্তৃক সম্প্র
প্রকাশিত "বৃন্দাবন-কথা" হইতে সময় সম্বন্ধে কিছু সন্ধান পাইয়াছি। পুলিন বা
বলেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ৺রাধারমণ বিগ্রহের পূজারিবংশীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযু
বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট "সেবা-প্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয়" নামক
যে একখানি জীর্ণ প্রাচীন ক্ষুদ্র পুঁথি দেখিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি গোস্বামীপাদদিগে
জন্মমৃত্যু ও সেবা-প্রকাশসম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ পাইয়াছেন; বিশেষ পরীক্ষা করিয়
দেখিয়াছি, বৃন্দাবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এই সকল তারিখ সম
বলিয়া ধরা যায়, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বা স্থানান্তরের ঘটনা সম্বন্ধে এই পুঁথির তারিখে
সহিত অন্য ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না।

ছিলেন। * সর্ব্বজ্ঞের মৃত্যুর পর তৎপুত্র অনিরুদ্ধ কর্ণাট প্রদেশের
হন; তিনি সমগ্র যজুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত এবং সমস্ত নৃপতিবর্গের বরণীয়
। † অনিরুদ্ধের দুই পুত্র ছিলেন; উহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—রূপেশ্বর
হরিহর। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং কনিষ্ঠ
শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অনিরুদ্ধ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে স্বরাজ্য
করিয়া দিয়া পরলোক গমন করেন (১৩৩৮ শক)। শস্ত্র-
যাহা ফল, তাহা ফলিয়াছিল; হরিহর বিদ্রোহী হইয়া জ্যেষ্ঠকে
চ্যুত ও দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িলেন। রাজ্যচ্যুত হইয়া রূপেশ্বর
ধনরত্ন সহ আটটি ঘোটক বাহনে পূর্ব্বদেশে গমন করেন। ‡
শিখরেশ্বর নামক তাঁহার এক পূর্ব্বতন বন্ধু ছিলেন, তিনি কোন
পর রাজা বলিয়া বোধ হয়। § সেই বন্ধুর রাজ্যে বাস করিবার

* রেজে রাজসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ।
শ্রীসর্ব্বজ্ঞজগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়ো গ্রামনীঃ॥" লঘুতোষণী।
দাক্ষিণাত্য বৈদিক কর্ণাটী ব্রাহ্মণ।
যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব হন॥" প্রেমবিলাস, ২৩শ

† "সর্ব্বক্ষ্মাপতি পূজিতোঽখিল যজুর্ব্বেদৈক বিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধ দেব ইত যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্॥" লঘুতোষণী।

মূলে "পৌরস্ত্যদেশং যযৌ" আছে; সেখানে পৌরস্ত্য কোন দেশ বিশেষের
হ, পৌরস্ত্য বলিতে পূর্ব্বদিক বুঝায়। বাস্তবিক পক্ষে রূপেশ্বর পূর্ব্বোত্তর
প্রদেশে আসিয়াছিলেন।

শিখরেশ্বর কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি রাজা গণেশ
ভূমির অন্ত কোন হিন্দু রাজন্য হইতে পারেন। দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণকালে
হিত কর্ণাট রাজকুমার রূপেশ্বরের মিত্রতা স্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে।

সময় পদ্মনাভ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। * পদ্মনাভ সর্ব্বশ
সুপণ্ডিত হন।

"শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম।
পরম সুন্দর সর্ব্বগুণে অনুপম॥
অঙ্গসহ যজুর্ব্বেদাদিক অধ্যয়নে।
পরম অপূর্ব্ব যশঃ বিদিত ভুবনে॥"

ভক্তিরত্নাকর, ১ম, ৩৯

এই সময়ে উত্তরবঙ্গে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা
গৌড়াধিপতি আজম্ শাহের রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসনবিভা
সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন † সম্ভবতঃ সেই সময়ে গণেশের অনু
সুপণ্ডিত পদ্মনাভ গৌড়রাজসরকারে উচ্চ পদ লাভ করেন
পদ্মনাভ নহেন, অন্য পণ্ডিতেরাও এই হিন্দু রাজন্যের শরণা
হইতেছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহ, শ্রীহট্টনিবাসী নরসি
নাড়িয়াল শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া গৌড়ের পার্শ্ববর্ত্তী রামকেলি গ্র
থাকিয়া সংস্কৃত ও পারসীক প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত হন এবং গ
তাঁহাকে উত্তরকালে স্বীয় অমাত্যপদে বরিত করেন। রাজা গ
যে বহুশাস্ত্রদর্শী ছিলেন, তাহাও এই সকল পণ্ডিতগণের সৎসঙ্গ প্রসাদে
সুলতান আজমের পর ক্রমে তাহার পুত্র হামজা শাহ ও পৌত্র শামসুদ্দি

* "তস্যাসৌ শিখরেশ্বরস্য শিবযে সত্যঃ স্বয়ং স্বয়সন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম॥" —লঘুতোষণ

† গৌড়ের ইতিহাস (রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী) ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃঃ বাঙ্গালার ইতি
(রাখালবাবু), ২য় ভাগ, ১৬৪ পৃঃ

‡ শ্রীহট্টের ইতিহাস, ২য় ৩য় খণ্ড ৪ পৃঃ। নৃসিংহ বা নরসিংহ নাড়িয়া
বর্ণনা প্রসঙ্গে লাউড়ীয় কৃষ্ণদাস প্রণীত "বাল্যলীলা সূত্রে" (১০ পৃঃ) আছে :—

"তৎ সৌরভব্যূহ বিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী।"

হন, কিন্তু উভয়েই প্রধান মন্ত্রী গণেশের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তল ান। রাজা গণেশ অল্পদিন মধ্যে স্বীয় অমাত্য নরসিংহের মন্ত্রণাবলে দ্দিনকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন ০৭ খৃঃ) *

"যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।

গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥" অদ্বৈত-প্রকাশ, ১ম

শের রাজত্বকালে পদ্মনাভ, নরসিংহ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহার শোভন করিতেন। কবি কৃত্তিবাস এই সময়ে রাজসভায় সম্বর্দ্ধনা য়াছিলেন। †

গণেশের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লউদ্দীন নামে সিংহাসন দখল করিয়া, পিতার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার া আকাশকুসুমে পরিণত করেন। তখন দনুজমর্দ্দন দেব নামক ন কায়স্থ জাতীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নগর বা পাণ্ডুয়ায় রাজা হন। তখন হিন্দু অমাত্যেরা সকলেই র আশ্রয়তলে রহিয়া যান। কয়েক বৎসর রাজ্য লইয়া ঘোর চলিতে থাকে। সেই সময় পদ্মনাভ স্বীয় পরিবারবর্গকে নিরাপদ রাখিয়া সুরতরঙ্গিণী গঙ্গাতীরে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার দনুজমর্দ্দনের রাজ্যমধ্যে গঙ্গাতীরে নবহট্ট বা নৈহাটিতে আসিয়া

---

* ঘটনার শতবর্ষ মধ্যে লিখিত উক্ত "বাল্যলীলা সূত্রে" গণেশের রাজ্যারোহণের ্ স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে।

"গ্রহ পক্ষাক্ষি শশধৃতিমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়েকচ্ছত্রধৃগভূৎ।"

্গ্রহ=৯, পক্ষ=২, অক্ষি=৩, শশধৃতি=১ অর্থাৎ ১৩২৯ শক বা ১৪০৭ খৃঃ। হের পুত্র কুবেরাচার্য্য বাল্যলীলা-সূত্রের গ্রন্থকার রাজা দিব্যসিংহের (উঁহার দীক্ষার নাম কৃষ্ণদাস) মন্ত্রী ছিলেন; সুতরাং এই তারিখ অবিশ্বাস করিবার নাই। † "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য," ৪র্থ সং, ১৩০-১পৃঃ

বাস করেন (১৪১৭ খৃঃ) ।* এই নৈহাটি কাটোয়ার দেড়ক্রোশ উ
অবস্থিত। নৈহাটি সে সময়ে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল ; শ্রীচৈতন্যের সন্ন
গ্রহণের পর কাটোয়ার প্রসিদ্ধি হয়।

পদ্মনাভ পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত ; তিনি নৈহাটিতে থাকিয়া পুরুষোত্ত
মূর্তিপূজা ও জগন্নাথদেবের সত্রোৎসব বা রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে
ক্রমান্বয়ে পদ্মনাভের ৫টি পুত্র ও ৮টি কন্যা সন্তান হয়। ইষ্টদেব
নামানুসারে তিনি যথাক্রমে পাঁচটি পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন
পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। ইহাদের সকলে
পুত্রসন্তান হওয়ায় ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হয়।

পদ্মনাভ নৈহাটিতে আসিবার পর তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব কা
দনুজমর্দ্দন পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পাণ্ডুয়া হই
বিতাড়িত হন এবং সসৈন্যে পূর্ব্বমুখে চন্দ্রদ্বীপে গিয়া তথায়
রাজ্যস্থাপন করেন। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ বা বর্ত্তমান বরিশালের প্রা
কায়স্থ রাজবংশীয়েরা এই দনুজমর্দ্দনের অধস্তন বংশধর। এই
রাজসিংহাসন লইয়া হিন্দুপাঠানে ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল। দনুজমর্দ্দ
চলিয়া যাওয়ার পর, মুসলমানেরা জালালুদ্দীনের পুত্র আহম্মদ শাহ
রাজা করিলে, হিন্দুরা দনুজের বংশীয় মহেন্দ্রদেবকে অল্প দিনের
রাজতক্তে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার হত্যার সঙ্গে
হিন্দুরাজ্যের কল্পনা তিরোহিত হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে পাঠানে

---

* "ততো দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপ পূজ্যপাদ ক্রমাৎ।
উবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥" —লঘুতোষণ

দনুজমর্দ্দনের যতগুলি স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সকলই ১৩
১৩৪০ শকের। সুস্পষ্ট তারিখযুক্ত প্রথম মুদ্রা আমিই সুন্দরবন মধ্যে পাইয়া
সাহিত্যপরিষদে উপহার দিয়াছি। দনুজমর্দ্দনের সবিশেষ বিবরণ জন্য রাখালব
"বাঙ্গালার ইতিহাস" ২য় খণ্ড ১৭৭-৮১ পৃঃ, "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,"
৩৬৯-৭০ পৃঃ এবং মৎ-প্রণীত "যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২৭৩-৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। তখন নাভের পুত্র মুকুন্দ আসিয়া মন্ত্রিত্বলাভে সমর্থ হন। তিনি পদ্মনাভের গণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রে সর্ব্বোত্তম লন।

মুকুন্দের একমাত্র পুত্র কুমারদেব। তিনি অতি শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদ্মনাভের পুত্রপৌত্রগণের বহু বারবৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য জ্ঞাতি-বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মভীরু রদেব পিতার আদেশে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বসতি করেন। রদেবের প্রকৃতির কথা "ভক্তিরত্নাকরে" এইরূপ আছে:—

শ্রীমুকুন্দদেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল-প্রদীপ পরম শুদ্ধাচার॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়।
কদাচার-জনস্পর্শে অতিভীত হয়॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করয়ে গ্রহণ॥
জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হইল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেইক্ষণে॥"

এই সময়ে "পীরালির" অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন যাইতেছিল। ষতঃ নবদ্বীপ অঞ্চলেই এইরূপ অত্যাচার অধিক হইতেছিল। রদেবের মত কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দু সে অঞ্চলে বাস করা য বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তিনি বাক্‌লায় চলিয়া যান।

"যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটি ছাড়িলা।
কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈলা॥"

প্রেমবিলাস, ২৩শ, ২২২পৃঃ

বাকলায় তখন দনুজমর্দ্দনের বংশীয় হিন্দু রাজগণের প্রবল প্রতাপ সেখানে এ জাতীয় অত্যাচার ছিল না। রাজা দনুজমর্দ্দন তাঁহা পূর্ব্বপুরুষের পৃষ্ঠপোষক। সেই পরিচয়ে তিনি তথায় বাসভূমি পাইলেন এইস্থানেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ তিন পুত্রের জন্ম হয় উঁহাদের নাম- অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। আনুমানিক ১৩৮৬ শকের (১৪৬৫ খৃঃ জ্যৈষ্ঠমাসে অমর, ১৩৯২ শকে (১৪৭০ খৃঃ) সন্তোষ এবং ১৩৯৫ শ (১৪৭৩ খৃঃ) বল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনজনেরই নাম শ্রীচৈতন্যদে পরিবর্ত্তন করিয়া যথাক্রমে সনাতন, রূপ ও অনুপম রাখিয়াছিলেন সেইনামেই তাঁহারা এত পরিচিত, যে পূর্ব্বনাম অনেকে জানেনই না আমরাও এখন হইতে তাঁহারা যে যে নামে সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলে সেই সেই নামে তাঁহাদিগকে অভিহিত করিব। বল্লভ বা অনুপমে একমাত্র পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী, তিনি সনাতন ও রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র বল্লভের জন্মের অব্যবহিত পরে কুমারদেব অকালে পরলোক গম করেন। কিন্তু যে অসামান্য প্রতিভা ও লোকাতীত চরিত্র তাঁহা সংক্ষিপ্ত জীবনে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাঁহার পুত্রগণের পার বয়সে উহাই জ্বালাময়ী শিখায় পরিণত হইয়া জগতকে পবিত্র করিয়াছিল তেমন পিতা না হইলে রূপসনাতনের মত পুত্রলাভ ঘটে না কুমারদেবের মৃত্যুকালে তাঁহার পিতা মুকুন্দ তখনও গৌড়রাজসরকা উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। রাজধানীর সন্নিকটে রামকেলি গ্রা তাঁহার বাসাবাটী ছিল। মুকুন্দ তাঁহার পৌত্রগণকে রামকেলি লইয়া গিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইস্থানে বল্লভের একমা পুত্র শ্রীজীবের জন্ম হয়। পরপৃষ্ঠায় বংশাবলী প্রদত্ত হইতেছে।

বংশ-লতিকা[১]।

(৩)
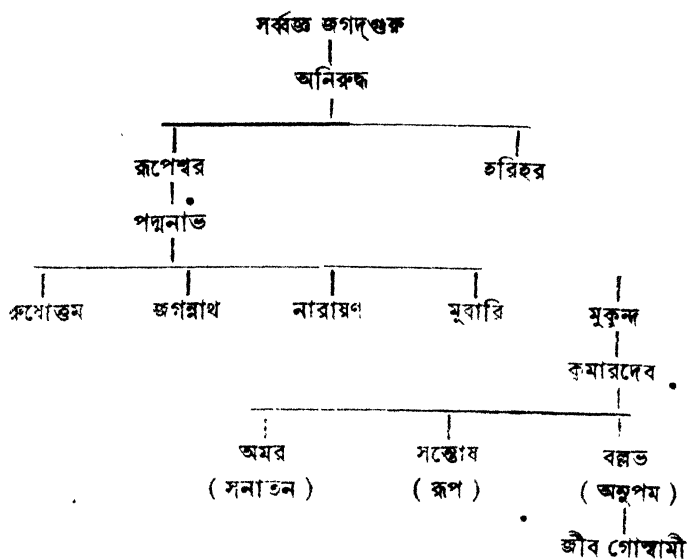
শিক্ষা ও রাজকার্য্য।

শৈশবে সনাতন ও তাঁহার ভ্রাতারা বাক্‌লার বাটী হইতে রামকেলিতে সিয়া পিতামহের তত্ত্বাবধানে পালিত হন। গৌড়ে যেখানে পাঠান াগণের রাজপ্রসাদ-সম্বলিত দুর্গ ছিল, যাহার বহুদূর বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ নও বর্ত্তমান আছে, তাহার বাহিরে আধ মাইল দূরে রামকেলি গ্রাম। স্থানে রাজসরকারের হিন্দুকর্ম্মচারিগণের বাসাবাটী ছিল। ক্রমে

উহাদের পোষ্য ও আত্মীয়স্বজনের আগমন জন্য জনসংখ্যা ও স্থানে পরিসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রামকেলিতে বহু ব্রাহ্মণের বসা হয়। সনাতনের পূর্ব্বপুরুষ পদ্মনাভ এবং অদ্বৈতপ্রভুর পূর্ব্বপুর নৃসিংহ নাড়িয়াল প্রভৃতি এইস্থানে বাস করিতেন। অবশ্য সনাতনে বাল্যকালে এইস্থানের তাদৃশ প্রতিপত্তি হয় নাই; তবুও গ্রামটির নাম ছিল "কানাই নাট্যশালা।" সেখানে বহুদেবমন্দির ছিল, গৃহে গৃ কৃষ্ণকীর্ত্তন ও রামলীলা ব্যাখ্যা হইত। মুকুন্দদেব পৌত্রগণের শিক্ষা সুব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নিজকৃ টিপ্পনীতে সনাতন এইভাবে নিজের শিক্ষাগুরুদিগের নাম লিখিয়াছেন :—

"ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্॥"

এখানে সার্ব্বভৌম বলিতে প্রখ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদে সার্ব্বভৌমকে এবং বিদ্যাবাচস্পতি বলিতে তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা রত্নাক বিদ্যাবাচস্পতিকে বুঝাইতেছে। উঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করি সনাতন ও রূপকে নবদ্বীপে যাইতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামকেলি রামভদ্র বাণীবিলাসের নিকট ব্যাকরণাদির প্রাথমিক শিক্ষাল করিবার পর উভয় ভ্রাতা পাঠার্থী হইয়া নবদ্বীপে যান। তথায় তাঁহা সময়ে সময়ে অসাধারণ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট এ নিয়মিতভাবে তদীয় ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির নিকট দর্শনাদি দুরূহ শা অধ্যয়ন করেন। * কিন্তু এই সংস্কৃত-শাস্ত্রবিদ্যায় রাজসরকারে উচ্চ

* এই বাসুদেব ও রত্নাকর উভয়ে বিখ্যাত মহেশ্বর বিশারদের পুত্র (চৈ ভাঃ মধ্য ২১); শান্তিপুরের অপর পারে বিদ্যানগরে তাঁহাদের আদিনিবাস ছি

[মি]লিবে না বলিয়া উঁহারা সপ্তগ্রামে গিয়া ঐ স্থানের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা [ম]দুয়দ্ ফকর্‌উদ্দীনের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সুন্দররূপে আরব্য ও পারস্যভাষা [শি]ক্ষা করেন। * সনাতনের রাজসরকারে পদলাভের পর বিদ্যাবাচস্পতি [স]ময়ে সময়ে রামকেলিতে যাইতেন, গুরুদেবের মত পূজিত হইতেন, [অ]নেক সময়ে দিনের পর দিন তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনায় কাটিয়া [য]াইত। বৃন্দাবনে আসিবার পর শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় [ত]াহাদের শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন। †

মুকুন্দের উচ্চপদের জন্য রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। [ত]াহার পৌত্রেরা স্বীয় স্বীয় অসামান্য প্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির জন্য [অ]ল্পবয়সেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছুদিন মধ্যে গৌড়ে [ভ]াগীরথীতীরে মুকুন্দের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে (১৪৮৩ খৃঃ)। তখন [স]নাতনের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। তিনি সেই সময়ে পিতামহের [প]দ প্রাপ্ত হন; ক্রমে রূপ এবং বল্লভ রাজসরকারে প্রবেশ করেন। উঁহারা [তি]ন ভ্রাতায় পারসীক ভাষা এমন উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছিলেন যে,

---

[বাসু]দেব মিথিলা হইতে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হইয়া আসিবার পর হইতে নবদ্বীপের [পূ]র্ববর্ত্তী বিদ্যানগরে তাঁহাদের বাসাবাটী ছিল। বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত [ছি]লেন, মহাপ্রভু গৌড় যাইবার পথে বাচস্পতির গৃহে একদিন ছিলেন। চৈতন্য মঙ্গল, [লোচ]নানন্দ, বিজয় খণ্ড, ১৪০ পৃঃ, চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য়।

* গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃঃ,। সপ্তগ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নাবশেষ [ম]ধ্যের মধ্যে এখনও ফকর্‌উদ্দীনের মস্‌জিদ্ আছে।

† এই পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য বৃন্দাবনে যমুনাকূলে বংশীবটের সন্নিকট হইতে [গো]পীনাথ বিগ্রহের আবিষ্কার করিয়া স্বীয় অনুরক্ত ভক্ত মধু পণ্ডিতের উপর সেবাভার [দে]ন, র, ২য়, ৯০ পৃঃ

মুসলমান অমাত্যদিগের মত অনর্গল সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা ও লেখাপড়া করিতে পারিতেন। এজন্য ক্রমে সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া উন্নতি লাভ করিতেছিলেন।

এ সময়ে সর্ব্বদা রাজসিংহাসন লইয়া নানাবিধ সংঘর্ষ চলিয়াছিল। সে সাময়িক অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া না লইলে, সনাতন প্রভৃতির ব্যক্তিত্ব বুঝা যাইবে না। তখন গৌড়ে কেহই দীর্ঘকাল রাজতক্ত অধিকার করিতে পারিতেছিলেন না; অবিরত রক্তারক্তি ও গুপ্তহত্যার ফলে সিংহাসন কলঙ্কিত হইতেছিল, দেশের শান্তি ছিল না বলিলেই হয়। সুলতান বারবক্ শাহের সময়ে (১৪৬০-৭৮ খৃঃ) মুকুন্দ রাজসরকারে প্রবেশ করেন। বারবকের পুত্র ন্যায়নিষ্ঠ ইউসফ্ শাহ ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পড়িলে তৎপুত্র ফতে শাহ সিংহাসন পান। পিতামহের ভুলের জন্য পৌত্রকে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। বারবক্ শাহ রাজ্য ও অন্তঃপুর রক্ষার জন্য আবিসিনীয়া দেশীয় বহুসংখ্যক ক্রীতদাস ও খোজাকে আনিয়া চাকরী দিয়াছিলেন। এই আবিসিনীয় লোকদিগকে সাধারণ লোকে হাব্সী বলিত। দলপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হাব্সীদের বলপ্রতাপ বাড়িতে লাগিল; অবশেষে তাহারা রাজধানীতে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া বলের পরিচয় দিতেছিল। ফতে শাহ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কিছু করিতে পারিলেন না, অবশেষে নিজে তাহাদের হস্তে নিহত হইলেন। ক্রমে উহাদের চারিজনে ৬।৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া বিনষ্ট হইলে, শেষ জনের উজীর হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন হন এবং এক নবযুগের অবতারণা করেন। ফতেশাহের সময়ে মুকুন্দের মৃত্যু হইলে তৎপদে সনাতন নিযুক্ত হন। হাব্সী-বিপ্লবাবর্ত্তের যুগে তিনি আত্মরক্ষা করিয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সে শক্তির প্রকৃত সম্মাননা হইয়াছিল, হুসেনশাহের রাজ-দরবারে

কায়স্থ-কুলীন পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) ইতঃপূর্ব্বেই হুসেনের উজীর ছিলেন ; পরে তাহার ঘনিষ্ঠ অমাত্যের পদে সনাতন বরিত হইলেন। এই উচ্চ রাজপদের নাম দবীর খাস (Private Secretary)। * দবীর শব্দে অমাত্য বুঝায়। মারহাট্টাদিগের শাসন বিভাগে মুখ্যপ্রধান বা পেশওয়ে প্রভৃতি যে অষ্ট মন্ত্রী ছিলেন, তন্মধ্যে একজনের নাম সুমন্ত্র বা দবীর। † দবীর খাস সনাতনের নাম বা পাধি নহে, উহা তাঁহার উচ্চপদের নাম মাত্র। স্বরাজ্য-রক্ষার জন্য হুসেনকে বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়, সেই সময়ে দবীর সনাতনকে সমর-সচিবের (Military Secretary) কার্য্য করিতে হইত। যাঁহাদের মস্তিষ্কবলে সুলতান হুসেন শাসন-সংস্কার করিয়া প্রজার শান্তি ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সনাতন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। রূপও রাজস্ব-বিভাগে বড় চাকরী করিতেন, হুসেন তাহাকে "সাকর বা সাকের (বিশ্বস্ত) মল্লিক" উপাধি দিয়াছিলেন। ‡ বল্লভেরও মল্লিক উপাধি ছিল, তিনি গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু সনাতনের পদগৌরব সকলের উপরে, তিনি সুলতানের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে অনেক সময়ে সুলতানের যুদ্ধাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইত ; মুসলমানের সঙ্গে চলিতে ফিরিতে সময়াসময়ে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে গিয়া সনাতন একপ্রকার ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। দবীর খাস হিন্দু কি মুসলমান, তাহা অনেকে জানিত না। এইরূপ মুসলমানভাবাপন্ন না হইলে এদেশীয় কুল-গ্রন্থে তাঁহাদের

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস (রাখালবাবু) ২য় খণ্ড, ৯ম, ২৪৪ পৃঃ, গৌড়ের ইতিহাস (রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী) ২য়, ১০৪ পৃঃ।

† Sarkar's Shivaj and His Times p. 464

‡ বিশ্বকোষে সনাতনের উপাধি সাকর মল্লিক করা হইয়াছে, উহা ভুল।

বংশের বিবরণ থাকিত। তাঁহারা উচ্চ বংশ-সম্ভূত বৈদিক ব্রাহ্মণ অথচ কোথায়ও তাঁহাদের বংশের উল্লেখ দেখা যায় না।

হুসেনের রাজসভায় যখন "সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে, তখন তাঁহাদের সমৃদ্ধির পার ছিল না। কয়েকটি খণ্ডপ্রদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা কিঞ্চিৎ কর দিয়া সে সব রাজ্যভোগ করিতেন। * সনাতনের মন্ত্রণায় সুলতানের রাজত্ব চলিত; রূপ সময় সময় প্রাদেশিক রাজ্যশাসন করিতেন। যে সব রাজ্যখণ্ডের লভ্যাংশ উহারা নিজেদিগের ভোগের জন্য পাইয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে একটি রাজ্য ছিল ফতেহাবাদের অন্তর্গত ইউসফপুর ও চেঙ্গুটিয়া পরগণা। এইস্থানে তাঁহারা একটি নূতন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া প্রসন্নসলিল ভৈরবনদের তীরে রাজার মত বিস্তীর্ণ পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ী ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; বহুদিনের অযত্নে উহা ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল। এখন তাঁহারা বাকলা হইতে গৌড়ে যাইবার পথে প্রায় মধ্যস্থলে, আধুনিক যশোহর জেলায়, একটি নূতন বাড়ী করিলেন।

"যশোহরে ফতেহাবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিলা আলয়"

ভ. র. ৪০ পৃঃ

এইস্থানের নাম প্রেমভাগ, অপভ্রংশে পমভাগ হইয়াছে। উহা পূর্ব্ববঙ্গ সেন্ট্রাল রেল লাইনে চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। এখন পমভাগের অপর পারে তপনভাগ (তপোবনভাগ), দেয়াপাড়া (দেবপল্লী), সেখহাটি

---

* "রাজা হসে দিল রাজ্য পৃথক্ করিয়া।
রাজ্যভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া॥"

ভক্তিরত্নাকর ১ম, ৪২ পৃঃ

(অহাট) প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ পল্লীসমূহ বিরাজ করিতেছে।
গতি পরিবর্ত্তনের জন্য এরূপ হইয়াছে, সম্ভবতঃ প্রেমভাগ ও
পাবন ভাগ নদীর একপারেই ছিল। প্রেমভাগে এখনও রূপ সনাতনের
ীন বাড়ীর কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ আছে। * তন্মধ্যে ৬।৭টি দীঘি,
সনাতনের মঠবাড়ী, পাটবাড়ী এবং ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থান প্রদর্শিত
। প্রেমভাগের সংলগ্ন আধুনিক গাদগাছি ও উত্তমনগরে তাঁহাদের
ফলের বাগান ছিল। পুরুষানুক্রমে এই সকল স্থানের অধিকার
বংশধগণের ছিল; এখনও কাটোয়ার অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ডের
স্বামিগণ উহার কতকাংশ ভোগ করেন। † সনাতনের
গুরু বলিয়া উঁহারা ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। প্রেমভাগের যে
শকে মঠবাড়ী বলে, সেখানে দেবমন্দির ছিল, এখন তাহা ভূমিগর্ভে
লুপ্ত। স্থানটির সর্ব্বত্র প্রাচীন ইষ্টকখণ্ড উহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য
য়। প্রেমভাগ নামটি গৌরাঙ্গ প্রেমিকদিগেরই উপযুক্ত বলিয়া
ধ হয়। *

গৌড়ের উপকণ্ঠে যে রামকেলি গ্রামে সনাতন ভ্রাতৃগণসহ বাস
রিতেন, তাহারও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তাঁহাদের বাসের জন্ত
ট্টালিকাদি কোথায় কি ছিল, তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই।
হাদের সংসার ত্যাগের পর বহুকালের অযত্নে, লবণাক্ত দেশের

* প্রেমভাগের বিশেষ বিবরণ মৎ-প্রণীত "যশোহর-খুলনার ইতিহাসের" ১ম
আছে (৩৪৯-৫৮ পৃঃ)। চেঙ্গুটিয়ায় সন্নিকটে যে রূপসনাতনের মঠ ছিল,
হা বিশ্বকোষে (২১শ খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ) আছে।

† এখনও উক্ত গোস্বামী বংশীয় দক্ষিণখণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃসিংহনাথ ঠাকুর মহাশয়
হানে শতাধিক বিঘা জমির ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেছেন।

দোষে এবং স্বার্থান্ধলোকের অত্যাচারে ক্রমে ক্রমে সৌধরাজি সম
বিধ্বস্ত হয়। এখন সামান্য ভগ্নাবশেষমাত্র অবশিষ্ট আছে। রামকে
উত্তরভাগে সনাতন সাগর নামক দীঘি আছে, উহার পশ্চিমধারে সনাত
আবাসবাটীকে এখন লোকে 'বড় বাড়ী' বলে। হুসেনের সুবিখ্য
সোনা মসজিদের উত্তরদিকে এখনও রূপকৃত রূপসাগর ইষ্টক-র
সোপানাবলীসহ বর্ত্তমান আছে। উহার পূর্ব্বদিকে রূপের বাড়ী ছি
রূপসাগরের পশ্চিমদিকে বল্লভের বাড়ী ছিল, এখন লোকে ঐ স্থান
খব্‌খবি বলে। কিন্তু তিন ভ্রাতার সেই কীর্ত্তিমন্দির গুলির বে
চিহ্ন নাই। রাজসরকারে স্বল্প মূল্য দিয়া লোকে উহা ধ্বংস কা
আত্মসাৎ করিয়াছে, হিন্দুমুসলমানের কয়েক শতাব্দব্যাপী রাজধ
যে গৌড়ে ছিল, তাহার যাহা দশা হইয়াছে রামকেলির অবস্থাও তাহা
গৌড়ে এখন কতকগুলি মসজিদ ব্যতীত রাজগৃহাদি কিছুই অব
নাই। রামকেলিতেও ঠিক তাহাই হইয়াছে! বাসগৃহাদি কিছুই ন
দুই একটী আধুনিক মন্দির ও সনাতন সাগর এবং রূপসাগর প্রভ
দীর্ঘিকা এক্ষণে ভক্তের স্মৃতি ব্যক্ত করিতেছে।

এই রামকেলিতে সনাতনের ইন্দ্রপুরীতুল্য হর্ম্ম্যরাজি বিরাজি

* সরকারী রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি, মুর্শিদাবাদের নিজামত দপ
"কিমাৎ খিস্তকার" নামক একটি পৃথক্ বিভাগ ছিল, উহাতে গৌড়ের হর্ম্ম্যগুলি ধ্ব
সাধন করিতে দিয়া প্রতিবৎসর পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের নিকট হইতে নামমাত্র
আদায় করিয়া বাৎসরিক ৮০০০ টাকা শুল্ক আদায় হইত। রামকেলিও গৌ
অন্তর্গত। Grant's Fifth Report p. 285. J. A. S. *B.* (1874) p.
note. ইংরাজ আমলে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মালদহ ও রঙ্গপুর প্রভৃতি আধু
সহরগুলি প্রায় সম্পূর্ণই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে গঠিত হইয়াছে।

Ravenshaw's Gour p.

, সেখানে রাজদরবারের মত সনাতনের সভা বসিত। সে সভায় বিচার হইত না। সেখানে সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সনাতন ও রূপ শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা উভয়ে তীক্ষ্ণমেধাবী পণ্ডিত ছিলেন।

"সদা সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥
ন্যায়সূত্রে ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥" ভ. র. ১ম, ৫২পৃঃ

নিজেরা দুইজনে তর্ক করিয়া কোন মত খণ্ডন বা নূতন মত স্থাপন রিতেন, তাহা নহে; অন্য পণ্ডিতেরাও কেহ ন্যায়শাস্ত্রের কোন ন ব্যাখ্যা করিলে তাহা উভয় ভ্রাতাকে জানাইয়া অনুমোদিত করিয়া না লে কাহারও চিত্ত স্থির হইত না। এই ভাবে উচ্চ রাজকার্য্য হইতে টুকু অবসর মিলিত, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা শাস্ত্র-চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। র্ব্ব বলিয়াছি, সনাতনের গুরুদেব বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় সাধারণতঃ দ্বীপ-সংলগ্ন বিদ্যানগরে বাস করিতেন। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিভৌম পুরীতে এবং পিতা কাশীতে যান, তখন তিনি সময় সময় দীর্ঘ-ল গৌড়ে আশ্রয় লইতেন। দূরদেশ হইতে যে সব শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত াহ্মণ আসিতেন, রাজাজ্ঞাতেই আসুন বা সনাতনের আহ্বানেই আসুন, ভ্রাতা পরম যত্নে রামকেলির বাড়ীতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন ং সশ্রদ্ধ আপ্যায়নে সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। এজন্য হারা অজস্র অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামকেলিতে চতুষ্পাঠী য়াছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন হইত। তাঁহারা সে সকল অনুষ্ঠানের ান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইরূপ নানা ভাবে রামকেলিতে বহু ব্রাহ্মণ

আসিতেন. সুদূর কর্ণাট দেশ হইতেও তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদি ব্রাহ্মণেরা আসিতেন। সুগন্ধ কুসুম ফুটিলে তাহার সৌরভামোদে চারিদি হইতে ভৃঙ্গকুল আসিয়া থাকে। তাঁহাদেরও যশঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছি সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনেকেরই জন্য তাঁহারা বাসস্থানের ব্যব করিয়া দিয়াছিলেন।

"কর্ণাট দেশাদি হইতে আইলা বিপ্রগণ ॥
সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে ॥
ভট্টগোষ্ঠী বাসে "ভট্টবাটী" নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বমতে অনুপম ॥"

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী আধুনিক "ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার মত রামকেলি পার্শ্বে ভাগীরথী তীরেও আর একটি "ভট্টবাটী" গ্রাম হইয়াছিল; এ তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

তাঁহারা যে অবসরকালে কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন, নহে; ধর্ম্ম সাধনায়ও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। একদিনেই নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে না। সকল প্রতিভারই উন্মেষ পূর্ব্ব জীব হইয়া থাকে। যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন, মুসলমান নৃপতির কর্ম্মচা রূপসনাতন বৃন্দাবনে গিয়া একদিনেই অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্তচূড়াম হইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা কথা। উভয় ভ্রাতা অসাধারণ পণ্ডিত হইতেই ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভক্তির উন্মেষ কর্ম্মজীবনে হইয়াছিল, নতুবা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলা হইতে ছুটিয়া রামকেলিতে আসিতেন না। উভয় ভ্রাতা ভক্তি-নিষ্ঠার সহি শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃন্দাবন-লীলার অনুষ্ঠানও করিতে বৃন্দাবন লীলার বহু বিগ্রহ রামকেলি গ্রামে নানা স্থানে প্রতি

ছিল, এজন্য ঐ গ্রামের অন্য নাম কৃষ্ণকেলি * ও কানাইনাটশালা। ঐ রামকেলিতে তাঁহাদের আবাস বাটীর চারিধারে শ্যামকুণ্ড, ললিতা-বিশাখা কুণ্ড—এই নামে কতকগুলি সরোবর দেখিয়াছি। তাঁহাদের ভজন সম্বন্ধে "ভক্তিরত্নাকরে" আছে :—

"বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন রাধা শ্যামকুণ্ড তা'তে।
বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥

সেই তাঁহারা বিগ্রহ সেবা করিতেন, এখানেও তাঁহারা সাধুসঙ্গ ও সেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাহা করিতে না পারিয়া বিরক্ত ও হইতেন। বিধর্ম্মী রাজার সেবা এবং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে যখন পদে পদে তাঁহাদের অনুকূল পথের অন্তরায় উপস্থিত হইত, তাঁহারা অবিরত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন, উহাতেই তাঁহাদের বৈরাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

---

(৪)

বৈরাগ্য ও বিড়ম্বনা।

পাঠান-বিজয়ের পর হইতে প্রায় তিন শত বর্ষকাল উড়িষ্যা আপনার রক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে হুসেন শাহ গৌড়াধিপ হইবার বৎসর পর (১৫০৯ খৃঃ) তিনি স্বীয় সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজীকে জয় করিতে পাঠান। উড়িষ্যার মুসলমান আক্রমণকারীদিগের ইস্‌মাইলই সর্ব্বপ্রথম। এই সময়ে গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব উড়িষ্যার

* জয়ানন্দ (চৈতন্য-মঙ্গলে) রামকেলিকে কৃষ্ণকেলি বলিয়াছেন। ১৪১ পৃঃ

রাজা। তিনি দক্ষিণদেশে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বহু দুর্গ ও রাজ
অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই অভিযানের জন্য যখন তিনি উ
অনুপস্থিত ছিলেন, তখনই ইস্‌মাইল সুবর্ণরেখা পার হইয়া কটক আ
করেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা অনন্ত সিংহ পলায়ন করিলে প
সৈন্য পুরীর অভিমুখী হয়। পুরীর পাণ্ডাগণ তথাকার মূর্ত্তিসকল
হ্রদের জলে লুকাইয়া রাখে। কিন্তু তবুও মুসলমান সৈন্যেরা বহু
হিন্দু-বিগ্রহ ও মন্দির ভগ্ন করিয়া দেশ ছারখার করে। হুসেন
প্রধান সচিব বা দবীর খাস সনাতন এই অভিযানের সঙ্গে য
বাধ্য হন। "চৈতন্য-ভাগবতে" আছে:—

"উড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ
ভাঙ্গিলেক কতশত করিল প্রমাদ।" অন্য

হিন্দুর দেবতা ও ও ধর্ম্মের উপর পাঠান সৈন্যের এই কঠোর অ
সনাতন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

প্রতাপরুদ্র দ্রুতবেগে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে
মাইল পলায়ন পর হইয়া হুগলীর অন্তর্গত গড়মন্দারণে আশ্রয়
তখন প্রতাপরুদ্র সদর্পে আসিয়া উহা অবরোধ করেন। কিন্তু
জনৈক কর্ম্মচারী গোবিন্দ বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় পাঠান সৈন্য
পায়। মোটকথা ইস্‌মাইল এবার বিশেষ কৃতকার্য্য না হইয়া ফি
আসেন এবং তাহা শুনিয়া হুসেন পুনরায় নিজে গিয়া সসৈন্যে উ
আক্রমণ করিতে কল্পনা করেন। কিন্তু আসাম ও ত্রিপুরা বি
জন্য উড়িষ্যা আক্রমণে বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

এই প্রথম আক্রমণের অব্যবহিত পরে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী
করেন। তখনও পথে নানা উপদ্রব ছিল, পারঘাটে নদী পার
বিষম সমস্যা ছিল। এই জন্যই তাঁহার ভক্তগণ অনেকে তাঁহার

পরেন নাই। সনাতন উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া বড় বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি মুসলমানের চাকরী ন বটে, কিন্তু আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হিন্দুর ও মন্দিরের উপর মুসলমানের অমানুষিক অত্যাচার তাঁহার লাগিয়াছিল। দেশমাতৃকার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি স্বধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে চাকরীর মমতা ত্যাগ করাইয়াছিল। তাঁহার বৈরাগ্যের প্রধান কারণ।

মন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস ও নীলাচল যাত্রার বার্ত্তা তাঁহার পৌঁছিল। দূর হইতে তিনি তাঁহাকে উদ্ধারের কর্ত্তা স্থির ন। রাজকর্ম্মচারী নিতান্ত বিষয়-বিরক্ত হইয়া নবীন সন্ন্যাসীকে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার মত বিষয়মত্ত ম্লেচ্ছাচারীর কি রাণের কোন পন্থা নাই? পত্র দ্বারাই সে দৈন্যপত্রীর উত্তর , তাহাতে একটি শ্লোক লিখিত ছিল :—

"পর ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥" *

শ্রীশ্রীচরিতামৃত, মধ্য, ১ম। এই শ্লোকটি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বেদান্তগ্রন্থ " হইতে গৃহীত। শ্লোকটি সেখানে দুইবার আছে (৯ম—৮৪. এবং ১১শ—১২২)। শিশিরকুমার যেরূপ বলিয়াছেন, শ্লোকটি মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত এবং শ্লোক, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। তবে চরিতামৃতের উদ্ধৃত পাঠ লে, মহাপ্রভু মূল শ্লোকটিকে কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। "পঞ্চদশীর" রেই শ্লোকের মূল পাঠ এইরূপ :—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নং॥"

অর্থাৎ পরপুরুষ সঙ্গাভিলাষিণী নারী স্বীয় গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা থাকিয়াও (নিরন্তর অন্তঃকরণে সেই পরপুরুষ সংসর্গরূপ রসের আস্বাদন ক সেইরূপ বিষয় লিপ্ত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করা যায়। †

সনাতনের পত্র হইতে তিনি তাহার ব্যবহার প্রকৃতি বু ছিলেন। উহা হইতেই উভয়ের আকর্ষণ হইল এবং সনা মুক্তির পন্থা খুলিল। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার জন্য যাত্রা ক পথে সনাতনের প্রতি কৃপাদান করিতে চলিলেন। ইহার পূ পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু গৌড়ের দিকে যাত্রা করিলেন, তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে নি রাজ্যসীমা পিছলদহ পর্য্যন্ত মহাড়ম্বরে পার করিয়া দিলেন। মহা নবদ্বীপে আসিলেন, সনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এক রহিলেন, তাঁহার নিকট সনাতনের অনেক তত্ত্ব জানিলেন; মাতৃদর্শন ও গঙ্গাবাস করিলেন। নবদ্বীপের পথেও বৃন্দাবনে যা যাইত; কিন্তু সে পথে না গিয়া ঘুরিয়া গৌড়ের পথে বৃন্দাবনে চলি ইহার কারণ সনাতনের আকর্ষণ, আর্ত্ত ভক্তের প্রাণের টান তাঁ প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় ছিল না।

---

* পঞ্চদশী বেদান্ত শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ, উহার অনেক শ্লোক মূল শ্রুতিদর্শ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। মহাপ্রভু আকর-গ্রন্থের পাঠ সামান্য পরিবর্ত্তিত ক প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

† পঞ্চদশীতে উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকটির ভাবার্থ এখানে প্রযুক্ত হইয়া সে শ্লোকটি এই :—

"এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি॥"

অর্থাৎ ধীর যোগী পরম শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বে বিশ্রাম করতঃ বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হ সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব-রস আস্বাদন করেন।

তিনি নবদ্বীপের সন্নিকটে আসিলে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার
দ পিপাসায় আসিয়াছিল, সেই বিরাট জনতা গৌড়-
কালে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। তাঁহার সাধ্য ছিল না,
াদিগকে পিছনে ফেলিয়া যান। সনাতন ও রূপের নিকট সকল
াদ পৌছিল। তাঁহাদের ভয় হইল পাছে মুসলমান রাজধানীর
টবর্ত্তী হইলে, তাঁহার বা তাঁহার অনুগামী জন-সংঘের উপর কোন
্যাচার হয়। মহাপ্রভু রামকেলি হইতে একটু দূরে থাকিতে একদিন
ত্রকালে সনাতন ও রূপ দীনহীন কাঙ্গালের মত বেশে দন্তে তৃণ লইয়া
ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং পদপ্রান্তে পড়িয়া বারংবার সজল নেত্রে
দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু উহাদিগকে পূর্ব্বে কখনও
খন নাই; পরিচয় পাইবা মাত্র উঠিয়া আসিয়া উভয় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন
লেন। পরে সনাতনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার পত্র
য়াছিলাম; যে উত্তর দিয়াছি, তাহাও বোধ হয় মনে আছে; বিষয়
র্য্য বিব্রত থাকিলেই যে ধর্ম্ম-সাধনা হয় না, তাহা নহে। তোমাদের
ভ্রাতার ব্যাকুল চিত্তের আকর্ষণেই তোমাদের পানে ছুটিয়া আসিয়াছি,
া গৌড়ে আসিবার আমার অন্য প্রয়োজন ছিল না।

"গৌড়নিকটে আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দুই দেখিতে মোর ইহা আগমন॥"

তোমাদের দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যখন উচ্চ
ীতে বসিয়াও তোমাদের এমন দীনতা এমন হীনতা আসিয়াছে, *

* ভাই উভরাজ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র,
বিদ্যাভক্তি বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ,
তবু আপনাকে মানে তৃণ হইতে হীন।

তখন নিশ্চয়ই অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। হইতে তোমাদের নাম সনাতন ও রূপ রাখিলাম। *

শ্রীচৈতন্য যখন রামকেলিতে পৌছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে লক্ষ ল লোকের জন-তা ছিল। সঙ্কীর্ত্তনের রোল বহুদূর হইতে শুনা যাইতেছি সে তরঙ্গে পাঠানের রাজধানী টলমল করিতেছিল। এই সময়ে কে বসু খাঁ গৌড়ের কোতোয়াল বা নগরপাল ছিলেন। হুসেন শাহ তাঁহা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব বসু চৈতন্যের ভাবতর বঙ্গদেশে কি তরঙ্গ উঠিয়া ছিল, তাহা জানিতেন। সে নূতন বন্যার খ রাখিত না, দেশের অগণ্য হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে এমন কেহ ছিল কেশব খাঁ হুসেনকেও চিনিতেন।

"যে হুসেন সাহ সব্ব উড়িষ্যার দেশে
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।"

তাহাকে সকল হিন্দুকর্ম্মচারী অত্যাচারী বলিয়া জানিতেন। কেশব খাঁ প্রথমতঃ ব্যাপারটি চাপা দেওয়ার জন্য রামকেলিতে যে সন্ন্যা আসিয়াছে সে ভুতের সঙ্কীর্ত্তন করে, এই ভাবে কথা বলিতেছিলে কিন্তু কথা কহিয়া বুঝিলেন, হুসেনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। অবশেষে গৌরাঙ্গের অপরূপ অতুলনীয় ভক্তিভাবাবেশ এবং তাঁহার নব-প্রচারিত ধর্ম্মমতের সা জানিয়া হুসেন শাহ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কি এক দৈবী শক্তিতে হুসে ঘোর মতান্তর ঘটিল। ইহার পর হইতে তিনি আর কখনও শ্রীচৈত ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তিনি প্রসন্ন চিত্তে কর্ম্মচারীদি বলিয়া দিলেন, কেহ যেন শ্রীচৈতন্যদেবকে কোন বাধা না দেয়।

† চৈ. চ. মধ্য, ১ম

"যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥"

চৈতন্যদেব কয়েকদিন রামকেলিতে থাকিয়া সকলকে বিমোহিত রলেন। সনাতন ও রূপ সস্ত্রীক আসিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিলেন। * কেলিতে মহাপ্রভু যেথানে আসন পাতিয়া ছিলেন, সেখানে এখনও লী ও কেলিকদম্ব বৃক্ষছায়ায় একটি উচ্চ বেদীর উপর তাঁহার চরণচিহ্ন লিত একখানি প্রস্তর আছে; পার্শ্ববর্ত্তী একটি মন্দিরে নিতাই-চৈতন্য অদ্বৈত প্রভুর মূর্ত্তির সঙ্গে একটি ৺মদনমোহন বিগ্রহও নিত্য পূজিত তেছেন। † মহাপ্রভুর আগমনের স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রতি বৎসর ষ্ঠমাসে রামকেলিতে একটি বিরাট মেলা বসে, সেখানে বহু বৈষ্ণব কুর সমাগম হয়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেদিন রামকেলি ছাড়িয়া বৃন্দাবন চলিলেন, অসংখ্য লোক- তাঁহাকে ছাড়িল না। প্রত্যুদ্গমন জন্য সনাতন কিছুদূর অগ্রসর য়া বিদায় কালে বলিলেন,

"যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যা'বার এ নহে পরিপাটি॥"

চৈ, চ, মধ্য, ১৬শ

অবহিত হইয়া মহাপ্রভু বুঝিলেন, এ সত্য কথা। সনাতন মহাপ্রবীণের উপদেশের ইঙ্গিত করিয়াছেন. ইহা প্রহেলিকা নহে। বুঝিয়া

* "সনাতন রাজ পণ্ডিত মহাশয়।
দাম্পত্যে পূজিল গৌরচন্দ্র কৃপাময়॥"

চৈ. ম, (জয়ানন্দ). ৩৮ পৃঃ

† ইহার বহুকাল পরে সনাতন বৃন্দাবন ধামে ৺মদনমোহন বিগ্রহের সেবা স্থাপন াছিলেন। সনাতনের অন্তর্ধানের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী রামকেলিতে

দেখিয়া মহাপ্রভু শান্তিপুরের দিকে ফিরিলেন, সে যাত্রায় বৃন্দাবনে যাও হইল না। দীন হীন কাঙ্গাল বেশে ভিন্ন বৃন্দাবনে যাইতে নাই।

গৌড় ত্যাগ করিয়া প্রভু যখন শান্তিপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছিলে তাঁহাকে বিদায় দিয়া সনাতন ও রূপ উভয় ভ্রাতা একান্ত নির্ব্বিণ্নচি গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, মহাপ্রভু ে তাঁহাদের মন প্রাণ হরণ করিয়া দেহমাত্র রামকেলিতে ফিরাইয়া দি গেলেন। সেই কার্য্যের জন্যই তাঁহার গৌড়ে আগমন। সে সঙ্কল্প সি হইয়াছিল। রূপসনাতনের জীবনে সাধুসঙ্গের সুফল বর্ণে বর্ণে ফলি সেদিন হইতে তাঁহাদের নব-জীবন সার্থক হইল।

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥"

সনাতন ও রূপ নূতন সিদ্ধিতে নূতন মানুষ হইয়া গৃহে ফিরিলে বৈরাগ্য ষোল আনাই তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়াছিল। উভয়ে করিয়া চাকরী ত্যাগ করিবার কল্পনা স্থির করিলেন। তাঁহারা দুইজ সুব্রাহ্মণ দ্বারা কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন; নিজ নিজ ধনরত্ন করিয়া লইলেন। দুই ভ্রাতায় এক সময়ে রাজকার্য্য ত্যাগ করি তাঁহাদের উপর বিষম অত্যাচার হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া জ্যেষ্ঠ সনা চাকরীতে থাকিলেন, রূপ ধনরত্ন লইয়া রামকেলি হইতে পলায়ন ক নিজ গৃহে আসিলেন, সে কথা পরে বলিব। তিনি সনাতনের জন্য জনৈক মুদির ঘরে দশ হাজার টাকা রাখিয়া গেলেন

সনাতন হুসেন শাহের খাস মন্ত্রী বা সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ অম ছিলেন। বহিঃশত্রুর সহিত সন্ধি বিগ্রহাদি সম্বন্ধে তিনিই

একটি নূতন ৺মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বিগ্রহই এখন হইতেছেন।

মর্শদাতা। সুতরাং তাঁহারই কার্য্যভার গুরুতর, তজ্জন্য তিনি অগ্রে রী ছাড়িলেন না। রূপ বিদায় লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু রূপ য়া গেলে সনাতনের নিকট পরের দাসত্ব আরও অপ্রীতিকর হইয়া ল। তিনি প্রায়ই রাজদরবারে যান না, গেলেও বড় অনিচ্ছায় ,বেশীক্ষণ থাকেন না। শেষে যাওয়াই বন্ধ করিলেন ; প্রচারিত ল, তাঁহার অসুখ হইয়াছে। বাদশাহ শুনিয়া প্রধান রাজ-কবিরাজ ন্দ সেনকে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী, বিখ্যাত বৈষ্ণবভক্ত র নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। * মুকুন্দ সেন সনাতনকে দেখিয়া সিয়া বাদশাহকে বলিলেন, "সনাতন বিষয়-কার্য্যে নিস্পৃহ হইয়াছেন, মি ত তাঁহার কোন পীড়া দেখিলাম না। হুসেন শাহ শুনিয়া অবাক্ লেন। রূপের কার্য্যত্যাগে তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল। আবার তনের মত সুদক্ষ প্রবীণ রাষ্ট্র-সচিব যদি কার্য্য না করেন, তাঁহার দ্য চলিবে কিরূপে? তিনি একদিন স্বয়ং সনাতনের গৃহে আসিয়া স্থিত হইলেন। সনাতন সুলতানের এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনের শঙ্কা করেন নাই ; তিনি সে সময়ে পণ্ডিতগণকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা রতেছিলেন। তিনি সুলতানকে দেখিবামাত্র যথোপযুক্ত ভাবে তাঁহার না করিলেন। হুসেন রাজকার্য্যে তাঁহার শৈথিল্যের কথা বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, কত বুঝাইলেন, অবশেষে ভয় প্রদর্শন

* "ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি তিনজন।" ভ. র. ১১, ৭৩২ পৃ
জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যায় তাঁহার খ্যাতির কথা শুনিয়া শাহ তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া গিয়া রাজচিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করেন। বহুদিন গৌড়ে ছিলেন না, ভজন সাধনের বিরোধী বলিয়া সনাতনের মত তিনি রাজপদ করেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া গৌরপ্রেমে ঝাঁপ দেন।

করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু সনাতন তাহাতে বিচলিত হই নহেন। তিনি ভাবিলেন আর চাপাচাপি করিয়া কত দিন চলি বিশেষতঃ প্রভুর নিকট প্রকৃত অবস্থার অপলাপ করা নিতান্ত অ তাই তিনি মন খুলিয়া আজ কথা বলিলেন। স্পষ্টতঃ জানাই তাঁহার মনের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে রাজকার্য্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সনাতন বলিলেন, "আমি কার্য্য ত্যাগ করিতে আপনি অন্য লোক নিযুক্ত করুন। এতদিন আপনার যে লবণ খাইয় যে অনুগ্রহ পাইয়াছি, তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আপনা ধন্যবাদ দিতেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর বিষয়-কা লিপ্ত থাকিতে পারিয়া উঠিব না।" বাদশাহ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নানা তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

"তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥ *
জীব পশু মারি সব চাকলা কৈলা খাস।
হেথা তুমি মোর সব কার্য্য কৈলে নাশ॥ চৈ. চ. মধ্য ১১

এখানে 'বড় ভাই' বলিতে বড় শ্যালককে বুঝাইতেছে সনাতন বলি

* মুসলমানেরা কখনও কখনও বড় শ্যালককে বড় ভাই বলিতেন। সনা কোন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন না, এখানে তাঁহার বড় শ্যালকের কথা বলা হইতে সনাতনের বহু আত্মীয় রাজসরকারে চাকরী করিতেন। তাহার এক ভগিনী শ্রীকান্ত উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। "জীব পশু মারি" অর্থাৎ প্রজা পীড়ন করি কোন কোন পুঁথিতে চাকলা স্থলে বাকলা পাঠ আছে। বাকলা (বর্ত্তমান বরিশ একটি পরগণা. তথায় সনাতনের পৈতৃক বাস ছিল। চাকলা পাঠই সমীচীন, উহা কোন বিশেষ চাকলা বা পরগণার কথা বলা হইতেছে না। চৈতন্যচরিতামৃতের ... রাধারমণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ ৭২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ার যে আত্মীয় অন্যায় কার্য্য করে, আপনি তাহার সমুচিত শাস্তি
পারেন। আপনি গৌড়ের স্বাধীন নৃপতি, আপনি সকলই পারেন।
ার দোষের জন্য আমি দায়ী : পরের দোষের জন্য আমার কোন
নাই।” এই সগর্ব্ব উত্তর শুনিয়া বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া
লেন, সনাতন ভাবিলেন ‘এইবার আমার পথ খুলিল।’

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৫০৯-১০ খৃঃ) যখন হুসেনের সৈন্য সর্ব্বপ্রথম
ষ্যা আক্রমণ করিয়া বহু দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করে (চৈ, ভা, অন্ত্য ৪)
তন সে অভিযানের সঙ্গে ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।
আক্রমণে বিশেষ ফল না হওয়াতে এবার হুসেন শাহ স্বয়ং উড়িষ্যা-
য় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ; সনাতনকে তিনি সঙ্গে লইতে চান।
ার মত প্রাচীন কর্ম্মচারীর মন্ত্রণার কি মূল্য ছিল, তাহা তিনি
নতেন। অপর পক্ষে সনাতনও সেই আভাস পাইয়া হিন্দু-বিদ্বেষীর
র হইতে কিছুতেই ইচ্ছা করিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার চিত্ত-
ন্য বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি বলদৃপ্ত সুলতানকে
উত্তর দিয়া আরও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। ফল এই হইল, হুসেন
তাঁহাকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। সনাতন
লেন, ইহাও বুঝি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। তিনি রাজাদেশ মাথা পাতিয়া
লেন। যাহারা রাজপথে তাঁহার শত হস্ত দূরে দাঁড়াইতেও ভয়
তাহারাই আসিয়া তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীকে হস্তবদ্ধ করিয়া
শালায় লইয়া গেল ; সেখানকার কঠোর ক্লেশ তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া
করিতে লাগিলেন। এদিকে হুসেন উড়িষ্যাভিযানের উদ্যোগ করিতে
লেন। তিনি একদিন সনাতনকে কারাগার হইতে আনিয়া
কে পুনরায় প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “তুমি আমার সঙ্গে উড়িষ্যায়
।” সনাতন কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

"তিঁহ কহে তুমি যাবে দেবতা দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে ত যাইতে"।

চৈ, চ, মধ্য ১

তখন তাঁহাকে পুনর্ব্বার কারাগারে পাঠাইয়া হুসেন শাহ উড়িষ্যা-বিজ চলিয়া গেলেন, ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে কত উন্নত পদবী হইতে মানুষ গত অধঃপাত হয়। লোকে যাহাকে দুর্ভাগ্য মনে করিয়া সনাতনে নির্ব্বোধ বলিয়া গালি দিতেছিল, সনাতন তাহাকে সৌভাগ্য-সূচনা করিয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু রামকেলি হইতে শান্তিপুরে আসিয়া কির্চ ছিলেন। পরে নীলাচলে ফিরিয়া, কিছুদিন পরে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য একজন মাত্র ভক্ত সহচরকে সঙ্গে লইয়া, ঝাড়িখণ্ডের বনপথে বৃন্দা যাত্রা করিলেন। রূপ অনুচর পাঠাইয়া সে সংবাদ লইলেন এবং প্রে ভাগের বাটীতে আসিয়া বিষয়-বিত্তের বণ্টন করিয়া অনুজ শ্র বল্লভকে সঙ্গে লইয়া অন্যপথে বৃন্দাবনের পানে ছুটিলেন গিয়া তিনি সনাতনের কারাবাসের কথা শুনিলেন। তৎক্ষণাৎ তি উপযুক্ত পাত্রকে দিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট এক পত্র দ্বারা তাঁহাকে জান লেন, গৌড়ে মুদির নিকট যে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে, হইতে আবশ্যকমত টাকা লইয়া সনাতন যেন কারাধ্যক্ষকে উৎকে দিয়া আত্মোবিমোচন করেন এবং বৃন্দাবন আসেন। * পত্র

* কোন কোন স্থলে এরূপ প্রবাদ আছে, শ্রীরূপ "যদু-পতি. রঘু-পতি" এই কয়ে কথা মাত্র একটি পত্রে লিখিয়া গোপনে জ্যেষ্ঠের নিকট প্রেরণ করেন। উহাদিগকে একটি শ্লোকের প্রত্যেক চরণের আদি অন্ত ধরিয়া এইরূপ পাদপূরণ করে

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক গতোত্তর কোশলা॥

াতন কারাধ্যক্ষের † নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, াধ্যক্ষ পূর্ব্বে তাহার অনুগৃহীত হইলেও হুসেনের নির্য্যাতন ভয়ে ব্যাকুল ছিলেন। সনাতন বলিলেন 'রাজা যদি জীবন লইয়া ফিরিয়া আসেন, হাকে বলিও সনাতন বহির্দ্দেশে যাইবার ছলে গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া রয়াছে।' অবশেষে সাত হাজার টাকা আনিয়া যখন তাহার সম্মুখে ধী হইল, সেই লোভে কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন, এমন কি, ড়ী কাটিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিয়াছিলেন।

ইতি বিচিন্ত্য কুরুধ মনঃ স্থির°।
নসদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

াতে বোধ হয় শ্রীরূপ যখন যান, তখন যেন সনাতনের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় নাই, এই কথায় তিনি জ্যেষ্ঠকে জগতের নশ্বরত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন। রূপ অগ্রে সংসার-াগী সত্য, কিন্তু তিনি জ্ঞান-বৈরাগ্যে সনাতনের শিক্ষাদাতা বলিয়া মনে হয় না। াতনই সর্ব্বাগ্রে দন্তেতৃণ করিয়া শ্রীচৈতন্ত-চরণে নিপতিত হইয়াছিলেন। এই প্রবাদ বার অঙ্কের উপরও আরোপিত হয়। যাহা হউক, ইহার কোন মূল আছে বলিয়া ধ হয় না।

* এই কারাধ্যক্ষের নাম সেখ হবু। তিনি পূর্ব্বে সনাতনের নিকট বহুপ্রকার াকার পাইয়া ঋণী ছিলেন। এখনও গৌড়ের একাংশে আধুনিক ইংলিশবাজার গ্রামে খ হবুর বাটী ও সনাতনের কারাগৃহের ভগ্নাবশেষ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গৌড়ের তহাস, ২য় খণ্ড, ১০৯ পৃঃ

(৫)

দৈন্যের অবতার

সনাতন আজ মুক্ত। মুক্ত আকাশ তাঁহার গৃহ, মুক্ত বাতাস তাঁহা স্বজন-স্নেহ। তিনি রাত্রিকালে দরবেশের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বনপথে চলিয়াছেন, পার্ব্বত্য প্রদেশের মনোলোভা বনশোভা তাঁহার চিত্তানন্দ বর্দ্ধক। ঈশান নামক এক অনুরক্ত ভৃত্য মাত্র তাঁহার সঙ্গী। শাখ ভাগীরথী পার হইয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম মুখে বনপথে চলিয়াছেন, সম্মুখে বামে রাজমহলের পর্ব্বত শ্রেণী। কারাধ্যক্ষই তাহাকে গড়িদ্বারের * পথে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ সেখানে দ্বাররক্ষী সেনানিবাস আছে, রাজবন্দী বলিয়া সেপথে সনাতনের ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি সেপথে না গিয়া, রাত্রিদিন চলিয়া পাতড়া পর্ব্বতের পাদদেশে এক ভূমিক বা ভূঞার শরণাপন্ন হইলেন এবং পর্ব্বত পার করিয়া দিবার জন্য মিনতি করিলেন। সনাতনের নিকট একটি কপর্দ্দকও ছিল না, কিন্তু ঈশানের নিকট আটটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা তিনি জানিতেন না। ভূঞার নিকট এক হাতগণক ছিল, সে ঐ সংবাদ ভূঞাকে গোপনে বলিয়া দিল। ভূঞা তখন সনাতনের অত্যন্ত আদর যত্ন করিতে লাগিল। দেখিয়া সনাতনের সন্দেহ হইল। তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশান সম্বল ছাড়িতে চাহে না,

* রাজমহলের পাহাড় শ্রেণী বিহার ও গৌড়-রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করে। উহার মধ্যে তেলিয়াগড়ি ও শক্রীগলি নামক গিরিপথ। ইহাদিগকেই গড়িদ্বার বলে। পশ্চিম দিক হইতে গৌড়রাজ্যে কোন শত্রুসেনা আসিলে তাহাদিগকে এই গড়ি বা গড়িদ্বার পার হইতে হয়। এজন্য গড়িদ্বার গৌড়সেনা দ্বারা রক্ষিত থাকিত।

এক মোহরের কথা গোপন করিয়া, তাহার নিকট সাতটি মোহর চ বলিল। সেই "কাল যম" তুল্য ধন সঙ্গে আনিবার জন্য সনাতন কে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। ভুঞার নিকট হইতে তিনি জানিয়া ন, ঈশানের আট মোহর আছে। কিন্তু ভৃত্য যাহা বলিল, সনাতন র নিকট হইতে সেই সাত মোহর লইয়া ভুঞাকে দিলেন। তখন ভুঞা দিগকে রাত্রিকালে পাইক সঙ্গে দিয়া নির্ব্বিঘ্নে বনাকীর্ণ পর্ব্বত পার য়া দিল। ঐ মুদ্রা না দিলে ভুঞা রাত্রিতে উভয়ের হত্যাসাধন চ, তাহা নিশ্চিত; কিন্তু মুদ্রা স্বেচ্ছায় দেওয়ায় সে প্রথমে উহা চ চাহিতেছিল না।

পর্ব্বত পার হইয়া সনাতন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশানের নকট কিছু আছে কিনা। ঈশান স্বীকার করিল, আর একটি মোহর আছে। র সনাতন বীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঈশান, উহাই তোমার পথের তুমি উহাই লইয়া দেশে চলিয়া যাও, আমি এখন একাকীই যাইব, আবশ্যক নাই।" যে ব্যক্তি সম্বল ছাড়িতে সাহসী নহে, এমন র সংশ্রবে থাকিতে সনাতনের ভাল লাগিল না। তিনি যে চৈতন্য-দৈন্যের অবতার, * তিনি যে বিষয় ভোগের শেষ করিয়া আজ

* বৈষ্ণব ভক্ত-সম্প্রদায়ের দৃঢ় মত এই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার বিভিন্ন ভক্ত দ্বারা াবও শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যথা "ভক্তিরত্নাকরে" :—

'রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে।
দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে॥
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন রূপ দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল॥"

প্রথম তরঙ্গ, ৪৫ পৃঃ

নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্ত! সনাতনের কথার মধ্যে যে তীব্র তির
প্রচ্ছন্ন ছিল, ঈশানের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু উপায়
প্রভুর কঠোর আদেশ রহিত হইবার নহে। অশ্রুনীরে বক্ষ ভাস
ঈশান প্রভুকে প্রণাম করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। এ জীবনে আর তা
প্রভু-সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু দরিদ্র ঈশান সম্বল আনিয়াছিল এ
পথক্লেশ নিবারণের জন্ত। ঐকান্তিক প্রভু-ভক্তিতে যদি কোন
থাকে, নির্দ্দোষ ঈশানের তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্য। পুণ্যময়ের দর
কাহারও বিচার বাকী থাকে না।

হাতে একটি জলপাত্র এবং পরিধানে একখানি ছিন্ন বস্ত্র, এইভ
সনাতন একলা চলিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রমক্লান্ত হইয়া তিনি হাজী
উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত
করিতে ছিলেন। হাজিপুরের নিম্নে গণ্ডকী নদী এবং পরপারে শোণপ
এই স্থানের হরিহরছত্রের মেলা চিরপ্রসিদ্ধ। ঐ মেলা হইতে অশ
করিয়া গৌড়ে পাঠাইবার জন্ত তিন লক্ষ টাকা লইয়া শ্রীকান্ত সেখ
ছিলেন। তিনি সনাতনকে চিনিতে পারিয়া অবাক্ হইলেন, ক
কত আদর আপ্যায়ন করিলেন, উভয়ের কত কথাই হইল।
তাঁহার দরবেশের বেশ বদলাইয়া ভদ্র করিয়া দিবার জন্য ক
করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অবশেষে কত অনুরোধ
শীতনিবারণের জন্য একখানি ভুটানী কম্বল দিলেন এবং গঙ্গা
করিয়া বারাণসীর পথ ধরাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে সনাতন পুণ্যে
কাশীধামে উপনীত হইলেন।

পৌঁছিয়াই সনাতন শুনিলেন, মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ক
ফিরিবার পথে কাশীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি কোথায় আ
খুঁজিয়া লইতে কি কষ্ট হয়? যেদিকে হরিনাম করিতে করিতে লো

ত চলে, সেই ত প্রভুর কাছে যাইবার পথ! প্রভু বারাণসীতে আসা
ধি অনুগত ভক্ত চন্দ্রশেখরের গৃহে থাকেন; চন্দ্রশেখর বৈদ্যজাতীয়,
ন্য তাঁহার গৃহে প্রভুর অন্নপান গ্রহণ হয় না; তিনি তপন মিশ্রের
তে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করেন। এই তপন মিশ্র বিখ্যাত ষড়্‌গোস্বামীর
তুম রঘুনাথ ভট্টের পিতা, সে কথা পরে বলিব। প্রভু মাঘমাসের
৪৩৮ শক, ১৫১৭ খৃঃ) শেষে কাশীধামে প্রত্যাগত হইয়াছেন,
তন ফাল্গুনের প্রথমে তথায় আসিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহদ্বারে উপস্থিত
া সংবাদ দিলেন। অমনি মহাপ্রভু দ্বারস্থ বৈষ্ণবকে ডাকিয়া আনিতে
শেখরকে বলিলেন। তিনি দরজায় আসিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব বলিয়া
তনকে চিনিতে পারিলেন না; কারণ তাঁহার মালা তিলক ছিল না।
শেষে সেই দরবেশবেশীকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ হইল।

সনাতন বাটীর মধ্যে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবা মাত্র প্রভু ধাইয়া আসিয়া
াকে আলিঙ্গন করিলেন, গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন,
লে অবাক্ হইয়া কাণ্ড দেখিতেছিল। সনাতন বারংবার বলিতেছেন
ভু, আমকে ছুঁইও না, আমি অস্পৃশ্য।" এইরূপ কথা একদিন
দাস বারংবার বলিয়া ছিলেন, কিন্তু প্রভু কি তাহা শুনিয়াছিলেন?
অনেকদিন হইতে সনাতনের পথপানে চাহিয়া আছেন। তাঁহার
াবতারের সেই প্রধান পাণ্ডাটিকে পাইয়া আজ তিনি উৎকট
ন্দে পরিপ্লুত হইলেন। তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া তিনি পিঁড়ার
র নিজের পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।
তন যত বলিতেছেন "আমাকে ছুঁইও না প্রভো!" তত—

"প্রভু কহেন তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥"

চৈ, চ, মধ্য, ২০

সনাতনের পবিত্রতার ইহা অপেক্ষা কি আর বড় অভিনন্দন হ
পারে? মহাপ্রভু বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; সনাতন কি
চলিয়া আসিয়াছেন, আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিলেন। তখন
প্রভুর মুখে শুনিলেন, বৃন্দাবন হইতে আসিবার কালে তাঁহার স
রূপ ও বল্লভের দেখা হইয়াছে, রূপকে মন্ত্রদান করিয়া শ্রীবৃন্দা
পাঠাইয়াছেন, বল্লভের রঘুনাথপ্রীতিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার অ
ভক্তির জন্য তিনি তাঁহাকে 'অনুপম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে
অনুপমও রূপের সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়াছেন। বহুক্ষণ ধরিয়া এই
কথা চলিল, উভয়ের মিলনে আজ কি আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠি
প্রভুর আজ্ঞায় সনাতন চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকল ভক্তের সহিত স
সম্ভাষণ করিলে, সকলে আনন্দে বিগলিত হইয়া গেলেন।

প্রভুর আদেশে চন্দ্রশেখর সনাতনকে লইয়া গিয়া ক্ষৌর করা
ভদ্র করিয়া আনিলেন, কিন্তু নূতন বস্ত্র দিতে গেলে সনাতন
লইলেন না। প্রভু তখন মিশ্রের ঘরে মধ্যাহ্ন ভোজন করি
যাইবার সময় সনাতনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং পাত্রশেষ তাহা
দিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই জানাইয়া দিলেন। প্রভু তাহারে বলি
মিশ্র সনাতনকে নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্র
করিলেন না, বলিলেন "যদি একান্তই দিতে হয়, একখানি পুরা
বস্ত্র দাও।" তাহাই দেওয়া হইল। ধুতিখানি ছিঁড়িয়া সনা
দুইখানি বহির্ব্বাস ও কৌপীন করিয়া লইলেন, শেষে পাত্রাবশেষ ভো
করিয়া পরম তৃপ্ত হইলেন।

এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ আসিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন যে, সনাতন যত
কাশীধামে থাকিবেন, তিনি যেন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করে
সনাতন জানাইলেন, তাহা হইবে না, তিনি মাধুকরী করিবেন অ

পাঁচ বাড়ী হইতে মাঁগিয়া খাইবেন, একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে
করিবেন না। কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলেন না,
প্রভু কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন।
বারংবার সনাতনের গায়ের বহুমূল্য ভোট কম্বলের প্রতি চাহিতে
ন। সনাতন বুঝিলেন উহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না;
উহা ত্যাগ করিবার উপায় করিতে হইবে। একদিন তিনি
গঙ্গার ঘাটে গিয়া দেখেন, এক গৌড়ীয় সন্ন্যাসী নিজ কান্থা
ইতে দিয়া বসিয়া আছেন। সনাতন কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে
কম্বল দিয়া কান্থাখানি চাহিলেন। সাধু ভাবিলেন, তাহা কি
ও হয়? নিশ্চয় আগন্তুক তাহাকে পরিহাস করিতেছেন, কারণ
ান ভোটকম্বল দিয়া কেহ কান্থা লইতে চাহে না। সনাতন
লেন, "ভাই, আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না। সত্য কথাই
ছি।" তখন কম্বল দিয়া সেই কান্থা খানি লইয়া প্রভুর
আসিলেন। প্রভু দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন,
বার শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বিষয়-রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিলেন,
কখনও রোগের শেষ রাখেন না।" বাস্তবিকই আজ সনাতন
র কারাগার হইতে নির্ম্মুক্ত, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, দীনাতিদীন বৈরাগী।
যে প্রকৃতই দৈন্যের অবতার, আজ জগতের সম্মুখে তাহার
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

(৬)

সনাতনের পুনর্জ্জন্ম।

সনাতনের ভোগের জীবন গত হইয়াছে, এখন ত্যাগের মা
তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল। আগেই নিরন্তর শান্তির অ
হওয়া যায়, সনাতন তাহা হইয়াছেন। সেই শান্তিময় জীবনে দি
লাভের পন্থা খুলিলে তাহা হইতে শুদ্ধ প্রেমের আবির্ভাব হয়।
মানব জীবনের চরমোন্নতির সোপান। শ্রীগুরু-কৃপায় সকল স
নিরসন না হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। আজ সনা
গ্রহকুল অনুকূল হইয়াছে, মহাসুযোগ ও সৌভাগ্য আসিয়াছে
ধনের, জ্ঞানের, মানের সকল অভিমান চূর্ণ করিয়া দন্তে তৃণ
আজ্ঞা প্রভুর চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উপ
প্রার্থনা করিলেন। পূর্ব্বের জীবন স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে
অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে।

"নীচ আমি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥"

[চৈ, চ, মধ্য, ২

রাজসরকারে তাঁহার উচ্চপদ ছিল বটে, কিন্তু তাহা দাসত্ব
স্নেচ্ছাচারী রাজার চাকরীর অনিবার্য্য কুফল ফলিয়াছিল। বিষয়ের
স্পর্শে তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে পদে পদে পাপাচারী ভ্রষ্টাচারী হইতে হ
ছিল। এমন কি, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অনাচারী হওয়ায়
প্রাচীন ব্রাহ্মণ কুল-পঞ্জিকায় তাঁহার বংশ-বিবরণ নাই। যাহা ক
বা ঘটিয়াছে, তাহাই স্মরণ করিয়া সনাতন নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া এক

প্রভুর চরণে পড়িলেন। সনাতন যাহাই বলুন তিনি যে তত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত, শ্রীচৈতন্য তাহা জানিতেন। তবুও সনাতন অকপট-সকল সন্দেহ বিদূরিত করিবার জন্য যে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, একে একে তাহার উত্তর দিতে গিয়া সে সকল দার্শনিক তত্ত্বের সদ্যুক্তিপূর্ণ সমাধান করিয়া দিলেন। উহার মধ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত শ্রী বৈষ্ণব-মতের সারতত্ত্ব নিহিত। তজ্জন্য এস্থলে অতি সংক্ষেপে কথায় সেই প্রশ্নোত্তরের আভাস দিতেছি।

সনাতন—"প্রভো! আমি যে জীব, আমার স্বরূপ কি?

মহাপ্রভু—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।

অর্থাৎ জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস ইহাই তাহার স্বরূপ বা প্রকৃত প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপ লক্ষণ ব্যতীত কতকগুলি অন্য লক্ষণ থাকে। যা ঐ বস্তুকে আপাততঃ চিনিয়া লইবার সুবিধা হয়। ইহাকেই বলে লক্ষণ। যে ভাবে শ্রীভগবানের শক্তি জগতে প্রতিভাত হয়, উহাতে ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রকাশ পায়। * যেমন সূর্য্যের

* শাস্ত্রে যেমন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদাদিতে) বিষয়ে উপদেশ সেইরূপ (ব্রহ্মসূত্রাদিতে) উভয়ের অভেদও প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য উভয়ই মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহাকেই ভেদাভেদ বাদ বলে। মত স্পষ্টতঃ অবর্ণনীয়; অচিন্তনীয় বলিয়া ইহা "অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ" বলিয়া হয়। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ-কৃত প্রসিদ্ধ" ষট্-সন্দর্ভ "ও সর্ব্ব-সংবাদিনী" নামক গ্রন্থে ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত উহার টীকায় এই মতের বিচার আছে। উহা বুঝা যায় শ্রীচৈতন্য "জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ লিখিত "জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ"

কিরণ মালা তাহার অংশ মাত্র, এজন্য উহা সূর্য্য হইতে অভিন্ন কিরণমালা কখনও সূর্য্য নহে এই হিসাবে সূর্য্য হইতে ভিন্ন। তবে হইতে জীব ভিন্ন বা অভিন্ন যাহাই ধর না কেন, জীবের প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা।

সনাতন—জীব কেন তবে ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হয়?

মহাপ্রভু—"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"
(চৈ, চ. মধ্য, ২০-১

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, জীব এই কথা ভু তাঁহার দাসত্ব বা সেবা করে না, এই জন্যই মায়া তাহাকে ত্রিতাপ করায়, সংসার-দুঃখ দেয়।

সনাতন—জীব কেন দাসত্ব করে না? মায়াই বা তাহাকে এ ভোগ করায় কেন?

মহাপ্রভু—জীব যে শ্রীকৃষ্ণের দাস এই জ্ঞানের অভাব বশতঃ সে দা করে না, শ্রীভগবানকে ভুলিয়া তাহার চিত্ত বহির্ম্মুখ হইয়া ঘুরিয়া বে এই জন্য তাহাকে নানা তাপ ভোগ করিতে হয়; কভু স্বর্গে উঠে. নরকে পড়ে. নানা যোনিতে জন্মলাভ করিয়া কষ্ট পায়।

সনাতন—তাহা হইলে জীবের কি উদ্ধারের পথ নাই?

মহাপ্রভু—আছে বই কি? জীবের চিত্ত যখন বহির্ম্মুখ না কৃষ্ণোন্মুখ হয়, অর্থাৎ তাহার চিত্ত যখন শ্রীভগবানের দিকে আকৃষ্ট ও হয়, তখন সে পথ পায়, মায়া তাহাকে ছাড়িয়া পলায়।

সনাতন—কিরূপে তাহা হয়?

শীর্ষক প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, ১৩৩২; ভাদ্র, ৪০৬ পৃঃ, সর্ব্বসংবাদিনী (রসিকমোহন সং ১৪৯ ও ২৪০ পৃঃ।

(মহাপ্রভু—শাস্ত্র বা সাধুর কৃপায় এই আকর্ষণ বা অকপট ভক্তির হয়। মায়ামুগ্ধ জীবের স্বভাবতঃ কৃষ্ণজ্ঞান থাকে না, এই ভগবান জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বেদপুরাণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এই শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে এবং অন্তর্য্যামী রূপে আপনার তত্ত্ব আপনি শ করিয়া দিতেছেন।

(সনাতন—শুধু শাস্ত্র পড়িলে বা শুনিলে কি শ্রীভগবানকে পাওয়া

(মহাপ্রভু—শাস্ত্রজ্ঞান ও গুরু-কৃপা দ্বারা সাধন ভজনের উপদেশ পাওয়া সাধন ভজন হইতে প্রেম-ভক্তি জন্মে, ভক্তিতে তাঁহাকে ভজনা ত করিতে ভক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। কৃষ্ণ-প্রেম হইলে বিধ সেবানন্দ ভোগ করা যায় বটে, কিন্তু প্রেমই জীবের প্রধান। প্রেম দ্বারা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়। তাঁহাকে পাইলেই সব পাওয়া

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

(ব্রহ্ম-সংহিতা)

এইবার সনাতন আশ্বস্ত ও নিরস্ত হইলেন। মহাপ্রভু ইহার পর কে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন করিলেন। শ্রীভগবান বিষ্ণুর কত অবতার, রূপ, কত মূর্ত্তি আছে প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইল। "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সনাতন কত প্রসঙ্গে কত প্রশ্ন করিলেন। অবশেষে কয়েকদিন এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলিল। শ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণ অবতারের বিশেষত্ব পূর্ণত্ব বুঝাইয়া দিলেন, বৃন্দাবন লীলার বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন, ভক্তের , প্রেমের লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ক নানা অজ্ঞাত সিদ্ধান্ত শিখাইলেন। *

চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য ২০-২৩ পর্য্যন্ত ৪টি দীর্ঘ পরিচ্ছেদে বহু শাস্ত্রবাক্যোদ্ধার

জ্ঞানালোকদীপ্ত সনাতনের চিত্ত এইবার ভক্তি বিমূঢ় হইয়া গেল, গুরুজ্ঞানে শ্রীমহাপ্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। তখন প্রভু তা নিজমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং

"তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরে করে।
বর দিনু এই সব স্ফুরুক তোমারে॥"

প্রভু যে শিক্ষা দিলেন, তাহা সনাতনের অন্তরে যাহাতে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত এজন্য শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিলে গৌড়মন্ত্রী রাজ্যেশ্বরের দরবারের উচ্চপদ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া রাজরাজেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও জগন্মান্য হইলেন। শিক্ষ সনাতনকে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য আদেশ দিয়া প্রভু বলিলেন 'ত তোমার ভ্রাতা রূপকে এই ভাবে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দীক্ষা বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছি, তুমিও তথায় যাও এবং

"তুমিও করিহ ভক্তিরসের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র করি করহ প্রচার॥"

চৈ, চ, মধ্য, ২

আমি আরও ভক্তগণকে ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনে পাঠাইব, তোমরা দিগকে আশ্রয় দিও।

'কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আসিবে তার করিহ পালন॥"

চৈ. চ. মধ্য ২৫শ,

করিয়া এই সকল বিষয়ে সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই কয়েক অধ্যায় সমগ্র শাস্ত্রসমুদ্রমধ্যে অমূল্য রত্ন।

তন, তাঁহার ভ্রাতা রূপ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জীব এই তিন জনেই এই দশ-বাণী বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র য়ন দ্বারা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিবাদ প্রচার করেন, চার বৈষ্ণব আচার বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত করিবার নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র লন করেন, শ্রীবিগ্রহ সমূহের প্রতিষ্ঠা ও সেবা ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-র আদর্শ স্থাপন করেন, এবং তিনজনে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর শ্রয়স্থান ও শিক্ষক-পদারূঢ় হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামকে ভক্তিনিকেতনে র্ত্তিত করেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী জীবন হইতে এই চারিটি কার্য্যই নতঃ পরিস্ফুট হইবে।

[৭]

বৃন্দাবন ও পুরী।

মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে সনাতন কাশী হইতে রাজপথ দিয়া বৃন্দাবন লেন। কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর নিকট জিত ও পদানত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন র নাম হইল প্রবোধানন্দ। ইনি গোপাল ভট্ট গোস্বামীর খুল্লতাত, কথা পরে বলিব। মহাপ্রভু প্রবোধানন্দ ও সুবুদ্ধি রায় প্রভৃতি গণকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া স্বয়ং নীলাচল যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে য়াছি, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে কাশীতে ফিরিবার পথে প্রয়াগে

রূপকে দীক্ষিত করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া আসিয়াছিলেন। রূপ সেখা গিয়া একমাস মাত্র ছিলেন। পরে সনাতনের অনুসন্ধানে তিনিও তাঁ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিলেন। প্রয়াগে আসি তাঁহাদের সঙ্গে সুবুদ্ধি রায়ের দেখা হইল, তাঁহার নিকট কাশীর সং পাইয়া উভয় ভ্রাতা সেইদিক চলিলেন। মহাপ্রভু কাশী ফিরিবার স গঙ্গার তীরপথে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারাও সেই পথে অগ্রসর হইলে ঠিক সেই সময়েই সনাতন রাজপথ দিয়া আসিতেছিলেন; এজন্য প তিন ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল না। রূপ ও অনুপম কাশী হইতে গৌ আসিলেন, সেখানে অনুপমের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিল। শোকার্ত্ত র কিছুদিন পরে প্রভুসন্দর্শনের জন্য নীলাচলে গেলেন।

এদিকে সনাতন একপ্রকার পাগলের মত বেশে আত্মহারা ভ প্রেমাবেশে বৃন্দাবনে আসিলেন। ভক্তপদাবলীতে তাঁহার চিত্র এইভা আছে :—

কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস।
কখনও বনের শাক, অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।

এইভাবে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া যমুনা-পুলিনে "আদি টিলা" * নামক উচ্চ পাহাড়ে এখন যেখানে ৺মদনমোহনজী

* এই স্থানে অতি পূর্ব্বকালে সূর্য্যদেবের মন্দির ছিল। সেই প্রাচীন মন্দি ভগ্নস্তূপ-"টিলা" বলিয়া পরিচিত হয়। এই সূর্য্য মন্দিরের নিম্নবর্ত্তী যমুনা ঘাটের ন ছিল সূর্য্যঘাট। উহাই পুরাতন প্রস্কন্দন তীর্থ।

াতন ভগ্ন মন্দির বর্ত্তমান, সেইস্থানে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। নটি তখনও জঙ্গলাকীর্ণ, নিকটে দুই চারি ঘর জঙ্গলী পাহাড়িয়া তীত অন্য কোন ভদ্র গৃহস্থ বা সাধু সজ্জনের বাস ছিল না। সুবুদ্ধি য়র সঙ্গে সনাতনের দেখা হইয়াছিল, তিনি সনাতনকে কত স্নেহ যত্ন রিলেন, কিন্তু সনাতনের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি সংসারে াবিরক্ত, সম্পূর্ণ আসক্তি-পরিশূন্য; আদর যত্নের মধ্যে যে বন্ধন আছে, হাতেও তিনি বান্ধা পড়িতে চান না। তিনি রাত্রিদিন বৃক্ষতলে ন করিতেন। বৃন্দাবনে ভিক্ষার স্থান ছিল না, এজন্য তিনি প্রত্যহ চারি মাইল হাটিয়া মথুরার কোন পল্লীতে প্রবেশ করিতেন, তথায় চারি গৃহস্থ-গৃহে মাধুকরী করিয়া যাহা ভিক্ষা পাইতেন, তদ্দ্বারা ান প্রকারে জীবন ধারণ করিতেন। তীর্থের সন্ধানে বনে বনে ণ করাই তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম।

"মথুরা মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥"

চৈ, চ, মধ্য ২৫শ,

মথুরার প্রাচীন মাহাত্ম্য যাহাতে কীর্ত্তিত, এমন সব শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি ান করিয়া সংগ্রহ করিলেন এবং তাহা হইতে বহু তীর্থের আবিষ্কার রিলেন। শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী পূর্ব্ব হইতে এই কার্য্যে অনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি; এবার সনাতন তার সহযোগী হইলেন এবং শাস্ত্রের বিচার করিয়া স্থানীয় তীর্থগুলির কৃত পরিচয় জ্ঞাত হইলেন।

এইভাবে এক বৎসর গেল। তীর্থোদ্ধার কার্য্য পরেও বহু বর্ষ য়া চলিয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরের পর সনাতনের মন উচাটন য়া উঠিল। রূপ অনুপমের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই; মহাপ্রভুর

কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিত। একবার নীলাচলে যাইবার জন্য তাঁহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। সুতরাং সনাতন বড় উদ্বিগ্ন মনে প্রভু-সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করিলেন।

তিনি প্রথমতঃ রাজপথ দিয়া আসিয়া ঝাড়িখণ্ডের (বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার) মধ্য দিয়া একাকী উড়িষ্যায় যাইতেছিলেন। পথে যে কত কষ্ট হইল, তাহা বলিবার নহে। কভু উপবাস, কভু ছোলা প্রভৃতি কিছু চর্ব্বণ করিয়া জলপান করতঃ উদর জ্বালা নিবারণ করিতেন। সে জলও তখন বড় খারাপ ছিল। একে জলের দোষ, তাহাতে দিনের পর দিন উপবাসে পিত্ত প্রকোপিত হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বগাত্রে কণ্ডু বা চুলকণা দেখা দিল। চুলকাইতে চুলকাইতে উহা হইতে রস ঝরিত, ক্ষত ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইত। সনাতন ভাবিলেন 'আমি আচারভ্রষ্ট হইয়া নীচজাতি হইয়া গিয়াছি, না হইলে কি শরীর এইরূপ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়? নীলাচলে যাইতেছি বটে, কিন্তু এদেহ লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে বা মহাপ্রভুর পদস্পর্শনে আমার অধিকার নাই। আমার মত মহাপাতকীর মরণই শ্রেয়ঃ অতএব যাই, পুরীধামে গিয়া রথোৎসবের সময়ে শ্রীজগন্নাথের রথচক্রে নিম্নে পড়িয়া এই অসার জীবন শেষ করিব।'

এইরূপ সংকল্প লইয়া চিত্তখিন্ন সনাতন নীলাচলে আসিলেন, কিন্তু শ্রীমন্দিরে গেলেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হরিদাস ঠাকুরের আস্তানায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। ১৪৩৮ শকের (১৫১৬ খৃঃ) বৈশাখ মাসে সনাতন আসিয়া নীলাচলে পৌছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপ উহার ৮।১০ দিন পূর্ব্বে নীলাচল হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত সনাতনের দেখা হইল না। রূপ দশমাস কাল পুরীতে ছিলেন, তন্মধ্যে সনাতন আসেন নাই।

হরিদাস ব্রাহ্মণবংশজাত হইলেও তিনি মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ভক্তেরা তাঁহার ভক্তি ও দীনতা দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাকে ম্লেচ্ছ বলিত এবং তিনিও নিজকে ম্লেচ্ছাধম বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহারও স্পর্শসীমায় না আসিয়া দূরে দূরে থাকিতেন। সনাতনও সেইভাবে থাকিবার জন্য হরিদাসের কাছে আসিলেন। দুইটি দীনতার মূর্ত্তির একত্র মিলন হইল। ঠাকুর হরিদাসের ভক্তিপ্রাণতা ও সাধনভজনের খ্যাতি বাতাসের বেগে সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়াছিল। সনাতন সে ভক্তবরকে চিনিলেন, তাই তিনি হরিদাসের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন।

"হরিদাসের কৈল তেঁহ চরণ বন্দন।
হরিদাস জানি তারে কৈল আলিঙ্গন॥"

পরিচয় পাইবামাত্র হরিদাস উঠিয়া আসিয়া সনাতনকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। দুইটি ভক্ত হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব মিলন হইল! শাস্ত্রজ্ঞানী সনাতনের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা জপযোগী হরিদাসের সাধনপ্রভায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল!

শ্রীচৈতন্যদেবের একটি নিত্য ক্রিয়া ছিল, প্রত্যহ হরিদাসকে আসিয়া দেখা দেওয়া। তিনি প্রাতে ৺জগন্নাথ দর্শন করিয়া উপল ভোগের পর সর্ব্বাগ্রে হরিদাসের কুটীরে আসিতেন এবং সেখান হইতে সমুদ্র স্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিতেন। পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু আসিলে হরিদাস ও সনাতন উভয়ে গিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসের মুখে শুনিলেন, অপর যে ব্যক্তি তাঁহার পদপ্রান্তে প্রলম্বিত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি সনাতন। উহাকে ধরিয়া তুলিয়া প্রভু আলিঙ্গন করিতে গেলে, ব্যস্ত হইয়া সনাতন যোড়করে বলিলেন, "আমি তোমার

পায়ে পড়ি প্রভু! আমাকে ছুইও না। একে আমি অধম নীচ জা
তাহাতে আমার গায়ে কণ্ডুরসা।" কিন্তু প্রভু কি তাহা শুনেন? ত্রি
ধাইয়া গিয়া জোর করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার সোন
গৌরাঙ্গে কণ্ডুক্লেদ লাগিয়া গেল। সনাতন অনুতাপে মনঃক্ষোভে মি
গেলেন।

প্রভু তাঁহাকে মথুরার বৈষ্ণব ভক্ত দিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে
আর বলিলেন "তোমার ভ্রাতা রূপ আসিয়া এখানে দশমাস ছিলেন, কয়ে
দিন মাত্র হইল চলিয়া গিয়াছেন। রামকেলিতে গঙ্গাতীরে অনুপে
গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। ভক্তের দিব্যগতি হইয়াছে, তাহা শোকের বি
নহে।" এই বলিয়া বল্লভের অপূর্ব্ব রঘুনাথ-ভক্তির কথা ও বিবিধ
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সনাতন এই প্রথম কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু
বার্ত্তা শুনিলেন। কিন্তু বিচলিত হইলেন না। বল্লভের একান্ত ভক্তি
কাহিনী কহিয়া, আর তাঁহাদের মত হীন কুলের প্রতি মহাপ্রভুর অযাচি
অপরিমিত কৃপার কথা বলিয়া, তিনি দীনতা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি
লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলিয়া গেলেন। সনাতনে
তিনি কৃষ্ণভক্তি-বিভোর হরিদাসের কুটীরে থাকিতেই বলিলেন। প্রত
প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ দুইজনের জন্য প্রসাদ লইয়া আসিত, উহা
পরমানন্দে উদর পূর্ত্তি করিয়া উভয়ে রাত্রিদিন কৃষ্ণনাম আস্বাদন করিতে
মহাপ্রভু প্রত্যহ আসিতেন, ভক্তদ্বয়কে লইয়া ইষ্ট-গোষ্ঠী করিতে
কিন্তু সনাতনের মনঃকষ্ট আর যায় না। তাঁহার গায়ের কণ্ডু চুলকণা
ঘা গুলি শুকায় নাই, উহাতে রস ঝরে, প্রত্যহ প্রভুর গায়ে ক্লেদ লাগে
গাত্র-গ্লানি অপেক্ষা ইহাতেই তাঁহার অসহ্য চিত্তগ্লানি হইল। তি
ভাবিলেন, রথের সময় আগতপ্রায়, যাত্রার দিন তিনি রথের নিম্নে পড়ি

া-দেহের অবসান করিবেন। তাঁহার সে সঙ্কল্পের কথা প্রভু একদিন পাইলেন, তিনি একদিন স্পষ্টতঃ বলিলেন "সনাতন! নিজ ইচ্ছায় ত্যাগ মহাপাতকের কারণ, তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমালাভ ঘটে না, বরং কে গতি হয়। বিশেষতঃ তোমার দেহ (দীক্ষাকালে) তুমি আমাকে াছ, উহাতে তোমার কোন অধিকার নাই, তুমি স্বেচ্ছায় উহা ত্যাগ রিতে পার না। *

"প্রভু কহে 'তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥" *

সব প্রয়োজনও তিনি বিবৃত করিয়া কহিলেন "আমি তোমা দ্বারা প্রেম ও ভক্তি-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিব, বৈষ্ণবাচরণ ও বৈষ্ণবদিগের কর্ম্মের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করাইব, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার রাই হইবে। তোমার ত্যাগের অলৌকিক দৃষ্টান্তে বৈরাগ্যের বিঘোষিত হইবে। এত কার্য্য যে দেহ দ্বার করিব, তাহা তুমি নষ্ট রিতে পার না।" সনাতন কাষ্ঠপুতুলের মত প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া বাক রহিলেন। 'পরের দ্রব্য নাশ করিলে, পরের স্থাপ্য ধন ব্যয় রিলে পাপ হয়, দেখিও সনাতন যেন সেরূপ অন্যায় কার্য্য না করেন।' চলিয়া গেলে, হরিদাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,

"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
তোমার দেহ কহে প্রভু 'মোর নিজধন॥"

---

* চৈ, চ, অন্ত্য ৪

ভগবান যাঁহার দেহ এই ভাবে গ্রহণ করেন, ভাগ্যের তাঁহার পার না
সনাতন! তুমি ধন্য। তোমার জন্মে ভারতভূমি ধন্য হইয়াছে। প্র
কথাতে বুঝিলাম, তুমি ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমধর্ম
জগন্মান্য করিবে। ধন্য তুমি!"

সনাতন এই দিন হইতে মরণ-সংকল্প ত্যাগ করিয়া ভজনানন্দে
যাপন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন গৌরাঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আলি
করেন। সনাতন যত বারণ করেন, প্রভু তত বলেন,—"সনাতন। তু
এত সঙ্কোচ কর কেন? শিশুর দেহ বিষ্ঠালিপ্ত দেখিলে জননী কি
কোলে করিতে দ্বিধা করেন?" এই ভাবে সেই সোনার অঙ্গের সঙ্গ
সেই পরশমণি স্পর্শে ক্রমে ক্রমে তাঁহার কণ্ডূক্ষতগুলি বিলয় পাই
ক্লেদের দুর্গন্ধ কখনও হয় নাই, ভক্তগণ বিস্মিত হইতেন যে তাঁহার
হইতে যেন চন্দন-গন্ধ বিকীর্ণ হইত। সনাতন প্রকৃতই "সুকুমার-
সুপুরুষ ছিলেন, এবার রোগ মুক্ত হইলে তাঁহার কন্দর্পকান্তি আরও ফু
উঠিল।

ক্রমে রথযাত্রা আসিল। বঙ্গদেশ হইতে গৌরভক্তগণ আগ
করিলেন। রথাগ্রে প্রভুর উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া সনাতন পরমান
বিভোর হইলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস নীলাচলে রহিলেন, সনাত
তাঁহাদের সকলের সহিত ক্রমে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত অন্তরঙ্গ হ
দিবানিশি কৃষ্ণরসে মজিয়া অজ্ঞাতসারে দিবসক্ষয় করিয়া দিলেন। গৌ
ভক্তগণ চলিয়া গেলেও মহাপ্রভু তাঁহাকে ছাড়িলেন না। সনাতন
তিনি দোলযাত্রা পর্যন্ত নীলাচলে রাখিয়া, বৃন্দাবনে তাঁহার কি করি
হইবে তাহা শিক্ষা দিলেন। অবশেষে প্রভু যে বনপথে বৃন্দাবনে
ছিলেন, সনাতন সেই পথের সমস্ত বার্তা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের
লিখিয়া লইয়া, সেই পথ দিয়া বৃন্দাবনে পৌছিলেন। পথে যে যে

যে যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে দেখিতে সনাতনের
াবেশ হইত।

[৮]

বৃন্দাবনে বিগ্রহ-সেবা

রোগতাপের জ্বালামলা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইয়া সমুজ্জ্বল সাধক-
ত সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। আর তিনি কখনও এই
ম পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বের মত আদিত্যটীলায় তিনি আবার
ার আশ্রয়-কুটীর নূতন করিয়া বাঁধিলেন। অদূরে কল্লোলময়ী যমুনার
তরঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া তিনি চিত্তরঙ্গে সাধন-তরঙ্গে ভাসমান
েন। উপরে নীল আকাশ, সম্মুখে নীল যমুনা, চারিধারে নীলাভ
ী, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামশোভা দেখাইত। সেই
প্রদেশে, স্বচ্ছন্দ-বিহারী বনবিহঙ্গের মধুর কূজনে, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ
উদাত্ত স্বরলহরীতে ইষ্টস্তুতির এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রকটিত করিত।
বনাকীর্ণ বৃন্দাবনে তখন ভিক্ষার স্থান ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি,
নকে মাধুকরী করিতে প্রত্যহ একবার মথুরায় যাইতে হইত। এই
দামোদর চোবে নামক * এক ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি শ্রীশ্রীমদন-
াল নামক এক নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পান। সে বিগ্রহ
মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। মাধুকরী করিতে মথুরায় তিনি

* কেহ কেহ বলেন ইহার নাম পরশুরাম চোবে বা চতুর্ব্বেদী।

যেখানেই যান না কেন, একবার সে শ্রীমূর্ত্তি না দেখিয়া তিনি কুট ফিরিতেন না। চোবে ঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার বিধ পত্নী একমাত্র শিশুপুত্র লইয়া ঘরকন্না করিতেন, আর ঠাকুর করিতেন। ঠাকুরের নাম মদন, আর বিধবার পুত্রের নাম রাখা হই ছিল সদন। মাতা মদন ও সদনকে একভাবে দেখিতেন, আর এক ভা সেবা বা পালন করিতেন। এই বাৎসল্য ভাবের সেবা দেখিয়া সনা তাঁহাকে মা যশোদা বলিয়া ডাকিতেন। প্রবাদ আছে, সন সেই ঠাকুরটিকে ইষ্ট দেবতার মত ভক্তিভাবে সেবা করিতে উপদে দিয়াছিলেন; চোবের পত্নী সে উপদেশ অনুসরণও করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা নাকি ঠাকুরের মনঃপূত হয় নাই বলিয়া স্বপ্নাদেশ হইয়াছি তাই পুনরায় মা যশোদা পুত্র সদনের মত ঠাকুর মদনকেও জ্যেষ্ঠপুত্রে তুল্য সেবা করিতেন। সনাতন ক্রমেই সেই মধুর মূর্ত্তিতে হইয়া পড়িলেন। এবং তাহাকে পাইবার জন্য প্রতিনিয়ত মনে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সজল নয়নে প্রার্থনা করিতেন। সে হৃদয়ের অ আহ্বানে ঠাকুর কি সদয় না হইয়া পারেন? দামোদর-পত্নী সনাতনের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য স্বপ্নাদেশ পাই অষ্টপ্রহর সেবা করাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। সন কৃতার্থ হইয়া মহানন্দে ঠাকুর লইয়া নিজের কুটীরে প্র করিলেন।

এই ৺মদনগোপাল অতি প্রাচীন বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের প্র মহারাজ বজ্রনাভ* ব্রজমণ্ডলে যে অষ্টমূর্ত্তির আবিষ্কার করেন

* "চারি দেব, দুই নাথ, দুই গোপাল বাখান।
বজ্রনাভ প্রকটিত এই আট মূর্ত্তি জান।"

চারিদেব অর্থাৎ হরদেব, বলদেব, কেশবদেব ও গোবিন্দদেব। দুই নাথ-

দনগোপাল তাঁহাদের অন্যতম। ১৫৯০ সম্বতে (১৫৩৪ খৃঃ) মাসে শুক্ল দ্বিতীয়া তিথিতে সনাতন ৺মদনগোপালের সেবারম্ভ রন। উহার ৭।৮ মাস পূর্ব্বে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীচৈতন্য াচলে অপ্রকট হন। সুতরাং তিনি শুধু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উপদেশই । গিয়াছিলেন কিন্তু সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত ৺মদনগোপালের সেবা নীর সংবাদ পাইয়া যান নাই। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরবর্ত্তী ন ঘটনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নাই বলিয়া এই মূর্ত্তির প্রসঙ্গ বা ন্য মন্দির নির্ম্মাণের কোন উল্লেখ সে গ্রন্থে নাই।

গাপীনাথ। দুই গোপাল—সাক্ষীগোপাল ও মদনগোপাল। বজ্রনাভের পর ক্রমে এই সকল মূর্ত্তি বিলুপ্ত হন এবং বহুকাল পরে সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ উঁহাদের দ্ধার ও সেবা ব্যবস্থা করেন। বৃন্দাবনে আদিত্য টিলায় শ্রীসনাতন শ্রীমদনগোপা- এবং যোগপীঠে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপ গোবিন্দদেবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বট সন্নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মূর্ত্তি ৺গোপীনাথের আবির্ভাব হয়। হরদেব ও ব বৃন্দাবনের বনভাগে, কেশবদেব মথুরায় এবং সাক্ষীগোপাল নন্দগ্রামে ছিলেন। নে শ্রীরাধা স্বয়ং পূজা করিতেন, সেইস্থানে শ্রীনাথ ছিলেন।

মদনগোপালজী সম্বন্ধে মথুরা-মাহাত্ম্যাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সত্যযুগে মহারাজ এই বিগ্রহের সেবা করিতেন। ক্রমে এ মূর্ত্তি দেবরাজ ইন্দ্র ও লঙ্কাধিপতি করায়ত্ত হন। লঙ্কাবিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্র এই মূর্ত্তি অযোধ্যায় আনিয়া র জানকীর উপর দেন। শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা- সেই মূর্ত্তি লইয়া মথুরায় আসেন। সেই স্থানেই বিগ্রহ রহিয়া যান। ঈশান কৃত "অদ্বৈত প্রকাশের" মতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আদিত্য টিলায় সেই বিগ্রহ ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করেন এবং প্রত্যাগমন কালে সেবাভার মথুরার এক চোবে বা চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের করে ন্যস্ত করেন। সনাতন চোবের গৃহ হইতে মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন।

সনাতন একটি টিলা বা উচ্চস্তূপের উপর ঝুপড়ী বাঁধিয়া তা মধ্যে ঠাকুরটীকে স্থাপন করিলেন। নিজে যেমন দীনহীন কাঙ্গ তেমনই দীন দরিদ্রভাবে তিনি নিত্যপূজা ও সেবা করিতে লাগিলে তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যে সামান্ত আটা আনিতেন, তা জলে মাখিয়া গোল গোল করিয়া পাকাইয়া, আগুনে পোড়া "আঙাকড়ি" নামক এক প্রকার রুটি করিতেন। বন্ত শাক তু আনিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ রুটির সহিত অলবণ ভোগ দিয়া প্র পাইতেন। * ঠাকুর স্বপ্নে বলিলেন, অলবণ ভোগে তাঁহার হয় না। সনাতন তখন প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবিগ্রহ বলিলেন, "ঠাকুর! আমার কিছু নাই; তুমি রাজ রাজেশ্বর, রাজভে ভিন্ন তোমার তুষ্টি হয় না সত্য, কিন্তু সে রাজভোগ এ কাঙ্গাল কো পাইবে? আমার আছে নয়নজল, তাহাতেই তোমাকে স্নান কর ভক্তি যাহা আছে তাহাতেই তোমাকে চন্দন চর্চ্চিত করি, পুণ্যি দীনপণ্যে তোমাকে যে প্রাণের ভোগ দিতেছি, তাহাতেই তোমা সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমার এই ভিক্ষান্নে শাকান্নে যদি তো তৃপ্তি না হয়, তুমি তোমার নিজের ভোগসুখের ব্যবস্থা নিজেই কা লও, আমি তু ইহার অধিক কিছু পারি না।" বলিতে বলিতে সনা কাঁদিয়া ফেলিতেন, তদ্গতচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে সমাধিস্থ পড়িতেন। এইভাবে অষ্টপ্রহর তাঁহার ইষ্টসেবা চলিত। সনাতনে মত সনাতনধর্ম্মী হিন্দু এই ভাবে আত্মবৎ মূর্ত্তি সেবা করিয়া যে ভূমান সম্ভোগ করেন, নিরাকার নিরবলম্বন সাধনায় জগতের কুত্রাপি কে তাহার প্রান্তবর্ত্তী হইতে পারেন না।

---

* এই স্মৃতি সজীব রাখিবার জন্য, এখনও শ্রীবৃন্দাবনে এই ঠাকুরের মন্দিরে সর্ব্বাগ্রে সনাতনের অনুরূপ 'আঙাকড়ি' ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

ভক্তাধীন ভগবান সনাতনের মনের ভাব বুঝিলেন। শীঘ্রই ঘটনা চক্রে মদনগোপালের জন্য সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইল এবং অষ্টকালীন সেবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। সেই কথাই এখানে বলিতেছি। পঞ্জাবের অন্তর্গত ...ান নগরে একজন ধনী বণিক বাস করিতেন, তাঁহার নাম লালা ... কর্পূর। * ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়-কায়স্থ। ভারতবর্ষের বহু ...ীর সহিত তাঁহার ব্যবসায় চলিত। একদা তিনি বহুবিধ পণ্যভারাক্রান্ত ...কখানি তরণী লইয়া যমুনা পথে মথুরায় আসিতেছিলেন। বৃন্দাবনের ...ট আসিয়া সনাতনের কুটীরের সম্মুখে সূর্য্যঘাটের নিকট তাঁহার তরণীগুলি অকস্মাৎ চড়ায় ঠেকিয়া অচল হইল। রামদাস বহু চেষ্টায়ও ...কাগুলির উদ্ধার করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। উপরিস্থিত ...জঙ্গলে কোথায়ও লোকের বসতি দেখা গেল না, কাহাকে দুঃখের ... বলিবেন, কাহার পরামর্শ লইবেন, বুঝিয়া পাইলেন না। অবশেষে ...কাশে তিনি দেখিলেন, উচ্চ পাহাড়ের উপর এক কুটীরে মিটি মিটি ... জ্বলিতেছে। অনন্যোপায় বণিক উহারই সন্ধানে গিয়া ধ্যানস্তিমিত ...ন সনাতনকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহার সম্মুখে শ্রীবিগ্রহ হাসিমুখে ...র পানে চাহিয়া আছেন। সনাতনের সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হইলে, যেমন ... ফিরিয়া চাহিলেন, বণিক গিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া সকল ঘটনা ...ত করিলেন এবং বারংবার সাধুর কৃপাভিক্ষা করিলেন। সনাতন তাঁহার ... করুণার্দ্র দৃষ্টিতে, ঠাকুরকে দেখাইয়া দিয়া, বলিলেন, "ইচ্ছাময়ের ... হইলে আপনার অভীষ্ট লাভ অবশ্যই হইবে।" রামদাস তখন কুটীর ...র সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া মানস করিলেন, "ঠাকুর, এবার যদি আমার ...গুলির উদ্ধার হয়, তবে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া এবার

* কেহ কেহ বলেন, ইঁহার নাম কৃষ্ণদাস। হয়তঃ দীক্ষান্তে ...দাসের নামই ... হইয়াছিল।

যাহা লভ্য হয়, সকল অর্থ তোমার সেবায় নিয়োজিত করিব।" বলিয়া ফিরিয়া যাইতে না যাইতে রামদাস দেখিলেন, যমুনায় অক জলোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, কে যেন তাঁহার পণ্যবাহিনী সবলে ভাসাইয়া চলিয়াছে।

সেবার মথুরায় গিয়া পণ্য বিক্রয় করিয়া বণিকের চতুর্গুণ লাভ হই বৃন্দাবনে ফিরিয়া তিনি পুনরায় সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা বলিলেন। সনাতন ভাবিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র, তিনি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিলেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া রামদাস সময়ে ঠাকুরের জন্য একটি সুন্দর মন্দির, জগমোহন, নাট্যশালা ও ে দ্বার নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া উৎ করিলেন। * মহা সমারোহে সনাতনের ইষ্ট দেবতা নূতন মন্দিরে প্র ষ্ঠিত হইলেন। রামদাস সপরিবারে সনাতনের নিকট দীক্ষিত হইয়া বাসস্থান মুলতান নগরীতে অন্য একটি শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ প্রা করিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান।

* রামদাস প্রথমতঃ আদিত্যটিলার উপর একটি চত্বর প্রাচীরে বেষ্টিত ক উহার দক্ষিণদিকে একটি বৃহৎ তোরণ-মন্দিরপথে চত্বর মধ্যে প্রবেশ করিলে, নাট-মন্দির (৫৭´×২০´), তাহার পশ্চিম গায়ে জগমোহন (২০´×২০´) এবং পশ্চিম গাত্রে সংলগ্ন মূল মন্দির দেখা যায়। নাট মন্দিরের উচ্চতা ২২´ ফুট, মন্দি উচ্চতা উহার দ্বিগুণ। নাট-মন্দিরের ছাদ এখন নাই, জগমোহনের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয় মন্দিরের গাত্রে যে কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তর-ফলক সমূহ ছিল, তাহা এখন নাই। বৃক্ষমূ শৃগালাঘাত-জীর্ণ প্রাচীন মন্দির এক্ষণে বক্কনশালায় পরিণত হইয়াছে। আদিত্যটি উপর যেখানে রামদাস কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম জবাটবী। যে সূর্য্যমন্দি ভগ্নাবশেষ আদিত্যটিলা নামে পরিচিত হয়, তাহারই সংলগ্ন জবা-পুষ্পো "জবাটবী" হইয়াছিল।

রামদাসের মন্দিরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি শিখরধারী সুন্দর প্রাচীন
র এখনও দণ্ডায়মান আছে। উহার সমস্ত গাত্রে প্রস্তর-ফলকে
র্ব-কারুকার্য্য খচিত। বঙ্গজ-কায়স্থকুল-তিলক বঙ্গাধিপ মহারাজ
পাদিত্যের খুল্লতাত স্বনামধন্য রাজা বসন্ত রায়ের পিতা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য
নন্দ (গুহ মজুমদার) এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মন্দিরের
গাত্রে দ্বারের উপর একটি প্রচীন সংস্কৃত শিলা লিপি আছে, তাহা
ত গুণানন্দের পরিচয় পাই। * স্থানীয় প্রবাদ হইতে এখনও জানা

শিলালিপিটি এই :—

"হর ইব গুহবংশ্যো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাজা বসন্তঃ।
সকৃতসুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
ব্যধিত বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ"।

ঃ গুহবংশীয় শিবতুল্য রামচন্দ্র যাঁহার পিতা এবং গুণিগণশিরোমণি রাজা বসন্ত
র পুত্র, সেই সুকৃতিশালী শ্রীগুণানন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই মন্দির যথাবিধি
ণ করিয়া দেন। এই লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং উপরিভাগে বাঙ্গালা
র ও নিম্নে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। শ্লোকটি খোদিত নহে, তোলা অক্ষরে
র্ণ। একে প্রাচীন রীতিতে লিখিত, তাহাতে অনেক অক্ষর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া
। যাওয়ায় লিপিটি অপাঠ্য ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মহামতি
সাহেব (F. S. Growse M. A.) তাঁহার মথুরার ইতিহাস রচনা কালে
থম এই শ্লোকটির পাঠোদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি প্রথম পাদে "গুহ-
া" স্থলে "গুরু বংশ্যো" এবং দ্বিতীয় পাদে "রাজা বসন্তঃ" স্থলে "রাধা
এইরূপ পাঠ করেন। দেবনাগর লিপি ভঙ্গিতে এবং ভগ্ন অক্ষরের
"হ" স্থলে "রূ" এবং "জা" স্থলে "ধা" পাঠ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু
দ্রর পুত্র এবং বসন্ত রায়ের পিতা বলিয়া আমরা গুণানন্দের যে পরিচয় দিতেছি,
অযৌক্তিক নহে। কারণ এইরূপ তিন পুরুষের পরিচয়যুক্ত অন্য বৈষ্ণব ও
মন্দিক গুণানন্দের কোন সন্ধান আমরা জানি না। সেরূপ সন্ধান না দিয়া

যায়, এই গুণানন্দ রাজা বসন্তরায়ের পিতা। * রামদাসের কৃত্তানি মন্দির দৈন্ত দশায় পাড়বার পূর্ব্ব হইতে ৺মদনগোপাল বিগ্রহ গুণানন্দের মন্দিরে পূজিত হইতেন। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ নৃপতি মহা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য হন। তৎপুত্র পরমভক্ত পুরুষো আনা দুইটি রাধিকামূর্ত্তি গঠন করাইয়া শ্রীবিহীন বিগ্রহের জন্য বৃন্দা পাঠান। স্বপ্নাদেশক্রমে উহার ছোটটি শ্রীরাধারূপে ৺মদনগোপা বামে ও বড়টি শ্রীললিতারূপে উঁহার দক্ষিণে স্থাপিত হইয়া পূজিত হই থাকেন। † তখন হইতে ৺মদন গোপালের নাম পরিবর্ত্তিত হ ৺মদনমোহন হয়। ‡ এখনও সনাতনের ইষ্ট মূর্ত্তি সেই ৺মদনমোহন নামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

কালক্রমে দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার ভয়ে ৺মদনমোহন প্রভৃ বৃন্দাবনের বিগ্রহগুলি জয়পুর রাজধানীতে নীত হন। সেখান হই

আমাদের পাঠের প্রতিবাদ করা যাইবে না। গুহবংশীয় রামচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ হ আসিয়া প্রথমতঃ সপ্তগ্রামে এবং পরে গৌড়ে রাজ-সরকারে কর্ম্মচারী হন। তাঁ তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ—ঐ সরকারে প্রধান প্রধান রাজক প্রতিপত্তি লাভ করেন। ভবানন্দের পুত্র রাজা বিক্রমাদিত্য ও গুণানন্দের পুত্র র বসন্তরায় যশোর-রাজ্য পত্তন করেন। এই বিক্রমাদিত্যের পুত্রই মহারাজ প্রতাপাদি বঙ্গেশ্বর স্থলেমান কররাণীর রাজত্ব কালে (১৫৬৩-৭২ খৃঃ) গুণানন্দ বৃন্দাবন হন এবং তথায় তাঁহার কালপ্রাপ্তি ঘটে। ইহারা বংশপরম্পরায় পরম বৈষ্ণব ছিলে এই বংশীয় একমাত্র প্রতাপাদিত্যই বহু পরে শাক্ত দীক্ষা লন। অনুমানিক ১৫৭০ অব্দের প্রাক্কালে গুণানন্দ স্বীয় কৃতী পুত্র রাজা বসন্ত রায়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৩৩০ সালের "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকার সংখ্যায় মৎপ্রণীত "গুণানন্দের মন্দির" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* শ্রীপুলিন বিহারী দত্ত-সম্পাদিত "বৃন্দাবন-কথা" ৬৩ পৃঃ

† "ভক্তিরত্নাকর," ৬ষ্ঠ তরঙ্গ।

‡ সনাতন ও কবিরাজ গোস্বামীর জীবদ্দশায় মদনগোপাল নামই ছিল।

লক করৌলির রাজা গোপাল সিংহ ঐ ৺মদনমোহন মূর্ত্তি পান।
ন করৌলিতে মূল ৺মদনমোহনের সেবা চলিতেছে। কিছুকাল পরে
বনের গোস্বামী প্রভুরা অন্য মদনমোহন বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায়
তিষ্ঠিত করেন। এখন আদিত্য টিলার বাহিরে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে
বনের পুরাণ সহরে রাস্তার ধারে একটি প্রাচীর বেষ্টিত আধুনিক
রে সেই প্রতিভূ মদনমোহনের অষ্টকালীন পূজাদি চলিতেছে। *
নন্দের প্রাচীন মন্দিরে এক্ষণে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তির
হয়।

শুধু মদনমোহনজী নহেন, সনাতন আরও অনেক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা
াছিলেন। তীর্থোদ্ধার করিবার জন্য তিনি সমস্ত ব্রজভূমির সর্ব্বত্র
ভ্রমণ করিতেন। মদন মোহনের সেবা-ব্যবস্থার ৩।৪ বৎসর পরে
নন্দগ্রামে নন্দ, যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণ এই চারিটি মূর্ত্তি প্রকাশ
য়া তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা করেন। ১৫৯৫ সম্বতে (১৫৩৯ খৃঃ)
শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে এই সকল মূর্ত্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। †

শ্রীমদনমোহনের সেবার সুব্যবস্থা হইবার পর ‡ সনাতন একস্থানে
তেন না। তিনি কখনও বৃন্দাবনের আদিত্য টিলা ছাড়িয়া গোবর্দ্ধন

ীর বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে এবং কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের
হারে মদনগোপাল নামই আছে।

* এই নূতন মন্দির ৺নন্দকুমার বসু ১৮২৩ খৃঃ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দির মধ্যে
হাসনে মধ্যস্থানে ৺মদনমোহন, দক্ষিণে ললিতা ও বামে রাধা মূর্ত্তি বিরাজিতা।

† পূর্ব্বোক্ত সেবা-প্রাকট্য পুঁথি হইতে এই তারিখ ও তিথি পাওয়া গিয়াছে।
ন-কথা," ৬৮ পৃঃ

‡ সনাতন স্থানান্তরে যাইবার পূর্ব্বে প্রিয়শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর উপর মদন
র সেবাভার দিয়া যান। তিনি আমরণ বিগ্রহের সেবাইত ছিলেন। তাঁহার
নের পর শিষ্য-পরম্পরায় ক্রমান্বয়ে গোপালদাস, চন্দ্র গোস্বামী, দাস গোস্বামী,

পর্ব্বতের সানুতলে, কখনও তৎসন্নিকটে রাধাকুণ্ডের তীরে কখনও মহাবনে বা গোকুলে নির্জ্জনে বসিয়া সাধন ভজন করিতেন। রঘু দাস গোস্বামী আসিয়া রাধাকুণ্ড নামক প্রাচীন সরোবরের উদ্ধার স করিয়া তথায় কুটীর বাঁধিলে, সনাতন সেখানে আসিয়া কালাতি করিতেন। সন্নিকটে তাঁহার ভজন কুটীরের স্থান এখনও প্রদর্শি গিরিবর্দ্ধনের পার্শ্বে মানসগঙ্গা নামক তীর্থ-সরোবরের উত্তর তীরে চক্রে বা চাকলেশ্বর মহাদেব বিরাজিত আছেন। উঁহারই নিকট সনাত ভজনের কুটীর ছিল। * সেখানে থাকিবার কালে তিনি প্রত্যহ গোবর্দ্ধন পরিক্রম করিতেন।

এইভাবে ক্রমেই তাঁহার জীবনের দিনগুলি গত হইতেছিল; ক্র তিনি একান্ত স্থবির হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রিয়বর্গ শিথিল হইয়া আসি ছিল, দেহ আর চলে না। তখন গোবর্দ্ধন পরিক্রম করি ক্ষমতা থাকিল না। প্রবাদ এই, ভক্তাধীন ভগবান তখন একদিন তাঁহা শিশুরূপে দর্শন দিয়া একখানি কৃষ্ণপদাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড দিয়া যান. তদ সনাতন প্রত্যহই সেই পাথর খানির চারিপাশে ঘুরিয়া পরিক্রমের রক্ষা করিতেন। দিন ক্রমেই ফুরাইয়া আসিল। কিন্তু সেকথা বলি পূর্ব্বে, তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য যে শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভক্তিশাস্ত্র রচ তাহারই কিছু পরিচয় দিতেছি।

বংশীদাস, কিশোরী দাস ও সুবলানন্দ এই ছয় জন সংসারবিরাগী সেবাইত ছিলেন। সুবলানন্দের পর যে সব গৃহস্থ বৈষ্ণব সেবাইত হইয়াছেন, তা কথা পরে বলিব। "শ্রীবৃন্দাবন-রহস্য" ১ম খণ্ড, ৭২ পৃঃ

* প্রবাদ এই, মহাদেবের কৃপায় ভক্ত সনাতনের ভজন স্থানে মশক বা প্রভৃতির উৎপাত ছিল না। এখনও সেইরূপ আছে। এখানে অনেক সাধক ভজনব্রতে জীবনাতিপাত করিয়াছেন।

সমুদ্র-মন্থন।

সনাতন গোস্বামী আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ব্যাসদেব। তিনিই সুপ্রাচীন বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই মতের পরিপোষক রত্নমালা সংগ্রহ করেন। অনাদি কাল হইতে ভারতবর্ষে শ্রীভগবান উপাসনা এবং বৈষ্ণব মত প্রচারিত হয়। হিমাচল প্রদেশ বিষ্ণুর ; পুরাণানুসারে তথা হইতে বিষ্ণুপাদোদ্ভূত গঙ্গা প্রবাহিত হন বটে, ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবমত প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারত হই প্রচারিত হইয়াছে। উত্তরাপথের গঙ্গা-প্রবাহ এবং দক্ষিণাপথের -প্রবাহ ভারতব্যাপী ধর্ম্ম-প্রবাহের প্রধান প্রবর্ত্তক।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের চারিটি প্রধান সম্প্রদায় ;—শ্রী, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও চার্য্য। দক্ষিণ ভারত হইতে আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী কর্ত্তৃক প্রদায় সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করে। তাঁহার বেদান্ত-টীকার নাম ষ্য। রামানুজী বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার মূর্ত্তির ক। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপত্তনে রঙ্গজীর মন্দির উহার সর্ব্বপ্রধান। রামানন্দী, কবীর পন্থী ও দাদূপন্থী প্রভৃতি এই শ্রীসম্প্রদায়ের শাখা। রামানন্দের শিষ্যগণ রামাইত বৈষ্ণব নামে খ্যাত। র্য্য শ্রীনিয়মানন্দ বা নিম্বার্ক দ্বিতীয় বৈষ্ণবশাখা অর্থাৎ নিম্বার্ক-য়ের প্রবর্ত্তক। এই মতের বৈষ্ণবগণ নিমাইত নামে পরিচিত হাঁহারা শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানেরই উপাসনা করেন। রাধাকৃষ্ণের রূপ ও বাল গোপালমূর্ত্তি উঁহাদের উপাস্য দেবতা। উত্তর ভারতে অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আশ্রম আছে। দ্রাবিড় আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য এবং কালে তৈলঙ্গ দেশীয় শ্রীবল্লভাচার্য্য এই মতের প্রবল পৃষ্ঠপোষক বাল গোপালের সেবাধর্ম্ম প্রচলিত করেন। তিনি চৈতন্যদেবের

সমসাময়িক। সমগ্র পশ্চিম ভারতই এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ক্ষে
দ্বারকা ও জগন্নাথে ইহার প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। আজমীঢ়ের নিকট
নাথদ্বারস্থ শ্রীনাথজীর প্রসিদ্ধ মন্দির বিষ্ণুমূর্ত্তি সেবার বিরাট ব্যবস্থা
সমৃদ্ধির জন্য অতীব বিখ্যাত। বল্লভাচারী বৈষ্ণবগণ বিষয়ী ও ভোগবিলা
ইহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক এবং বিশুদ্ধা ভক্তিই তাঁহাদের মোক্ষের প্র
সাধন। দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীমধ্বাচার্য্য চতুর্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান গু
এবং বেদান্ত দর্শনের দ্বৈত মতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এইজন্য এই সম্প্রদায়কে মা
বা মধ্বাচার্য্য শাখা বলে। নারায়ণ ও লক্ষ্মী এই মধ্বাচারী বৈষ্ণবদে
প্রধান উপাস্য; ইহারা নির্ব্বাণ মুক্তির পক্ষপাতী নহেন। দাক্ষিণা
ইহাদের প্রধান ক্ষেত্র। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দের গুরু শ্রী
মাধবেন্দ্রপুরী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই সম্প্রদা
গুরু-প্রণালিকার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত গৌ
বৈষ্ণব মত এই মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের একটি শাখা। সনাতন ও রূপ
বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ এবং পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালীর গৌরব পরম ভা
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং তদীয় দিগ্বিজয়ী শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্র
পরাক্রান্ত পণ্ডিতবর্গ এই ধর্ম্মশাখাকে শাস্ত্রীয় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতি
করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সনাতন গোস্বামী সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বাগ্রগ

শ্রীচৈতন্য স্বীয় মতানুসারে বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে ভক্তি মাহাত্ম্য প্র
করিবার জন্য সনাতনের উপর ভারার্পণ করেন। নীলাচলে
সনাতনকে কহিয়াছিলেন,

"তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥" *

চৈ, চ, অন্ত্য, ৪

হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া সনাতন এই বাণী বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন য়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম হইতেই প্রাচীন শাস্ত্র সংগ্রহে ।নিয়োগ করেন। সনাতনের মত প্রধান প্রধান ভক্তগণের আগমন অবস্থানের জন্য বৃন্দাবনের জঙ্গলে যে ভগবৎপ্রেমের আগুন জ্বলিয়াছিল, াতে পুড়িয়া মরিবার জন্য পতঙ্গের মত শত শত ভক্ত সেইস্থানে য়া আসিতেছিলেন। সকলের দৃষ্টিই ক্রমে বৃন্দাবনের সেই আলোক-ার উপর নিপতিত হইতেছিল। সনাতন ও রূপ অধ্যক্ষের মত স্থা করিয়া এই সকল ভক্তগণের সাহায্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ত রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে আনিতে লাগিলেন। . উপনিষদ; বেদান্তাদি দর্শন, তাহাদের অসংখ্য প্রকারের টীকা নী, ভাষ্য ও বার্ত্তিক; স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দঃ াতিষ—আর কত বলিব—সকল শাস্ত্রের অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি াবনে আসিতেছিল। সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রক্ষা করাই বা কত ন! পথে শত বাধা—দস্যু তস্করের ভয়, বৃন্দাবনে আনিয়াও শত া, গোস্বামীদিগের স্থায়ী কোন গৃহ নাই। গ্রীষ্ম বর্ষায় ঝড়ে জলে ঃ কীটের মুখ হইতে গ্রন্থ রক্ষা করা অতীব কঠিন কার্য্য। তবুও াদের প্রধান সাধনাই গ্রন্থ-সংগ্রহ, গ্রন্থই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। চ্ছন্ন পর্ণকুটীরের মধ্যে, স্তূপীকৃত গ্রন্থরাশির অন্তরালে বসিয়া বসিয়া

* গৌরাঙ্গলীলার আদিগ্রন্থ মুরারী গুপ্তের কড়চায় আছে :—

"বৃন্দাবনায় গন্তব্যং ভক্তিশাস্ত্র নিরূপণম্।
লুপ্ততীর্থপ্রকাশঞ্চ তন্মাহাত্ম্যমপি স্ফুটম্॥" ১৯৬ পৃঃ (১৩শ সর্গ)

সেই কৌপীনধারী বৈষ্ণবেরা স্বচ্ছন্দে দিনের পর দিন ক্ষয় করিয়া দিতেন গ্রন্থী পণ্ডিত হন বটে, কিন্তু অসংখ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রূপসনাতন নিশ্চি ছিলেন না। তাঁহারা সেই শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া কিরূপে অমৃত সঞ্চ করিতেছিলেন, তাহাই অতি সংক্ষেপে দেখিবার জন্য আমরা চেষ্ট করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতই বৈষ্ণব-মতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ গ্রন্থ। অষ্টাদ মহাপুরাণের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুকদেব যাঁহার বক্তা, মহারাজ পরীক্ষি যাঁহার শ্রোতা এবং স্বয়ং ব্যাসদেব যাঁহার লেখক, নিগম-কল্পতরুর গলি ফল-স্বরূপ সে গ্রন্থের আস্বাদন করিবার জন্য ভারতবাসিগণ চির-লালায়িত লক্ষ লক্ষ মন্দিরে ইহার পূজা হয়, কোন ধর্ম্মকথার আলোচনা হইলে সর্ব্বাগ্রে ভাগবতের স্তুতি এবং সকল কথার আগে এই ভাগবতী কথ ভারতে মহাভারতের পরে ভাগবতের মত গ্রন্থ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বেদান্তের টীকা স্বরূপ। বেদান্ত-মীমাংসায় ব্রহ্ম যে নিগূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা বাস্তবিকই বেদান্তের তাৎপর্য্য এবং ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা সম্বলিত একাধা এমন গ্রন্থ আর নাই। গোস্বামিপাদগণ এই দুই ভাবেই এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞানী বা জিজ্ঞাসুর জন্য এই হইতে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সকল বিতর্কের অবসান করিয়াছে এবং এই গ্রন্থ ভক্তিবাদের মূল প্রস্রবণ বলিয়া, উহা হইতে সর্ব্বজ্ঞা বিরক্ত বা অনুরক্ত ভক্তের জন্য সাধন ভজনের প্রণালী দেখাই দিয়াছেন।

এই ভাগবত-সাগরে সকল সিদ্ধান্তের পরিণতি হইয়াছিল। বৈষ্ণ ধর্ম্মের যে বিভিন্ন শাখার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহাদের প্র প্রধান প্রবর্ত্তক ও টীকাকারগণ এই সাগর হইতে স্বীয় স্বীয় সিদ্ধ

হ বাহির করিয়া লইয়াছেন। উহাকেই সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বলা । ভাগবতের বিভিন্ন টীকার মধ্যে ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীধর স্বামি-কৃত র্থদীপিকা" বা বিজয়ধ্বজ তীর্থকৃত "পদরত্নাবলী" টীকাকে অসম্প্র-ক এবং অনাবিল বৈষ্ণবভাবের টীকা বলিয়া ধরা যায়। এতদ্ভিন্ন রাঘবাচার্য্য কৃত "ভাগবতচন্দ্র চন্দ্রিকা" টীকা শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত; দেব-কৃত "সিদ্ধান্ত-প্রদীপ" নিম্বার্ক-মতানুযায়ী; এবং বল্লভাচার্য্য ত "সুবোধিনী" বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব-বিশিষ্ট। গৌড়ীয় বমতের চারিটি প্রধান টীকা আছে:—সনাতন গোস্বামীর "বৃহদ্-ব-তোষণী", জীব গোস্বামীর "ক্রমসন্দর্ভ", বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর র্থদর্শিনী" এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের "বৈষ্ণবানন্দিনী।" এই গুলির সনাতন কৃত, (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বা শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের) ীর্ণ বৈষ্ণব-তোষণী টীকা যেরূপভাবে সকল দুরূহ স্থলে অত্যুজ্জ্বল কপাত করিয়াছে, এমন কোন প্রাচীন টীকায় করে নাই। যমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনই রসমাধুর্য্যযুক্ত। শ্রীধরস্বামীর টীকায় যে অর্থ ব্যক্ত হয় নাই, অথবা ব্যক্ত হইলেও যাহা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া র বোধগম্য হয় নাই, সনাতন গোস্বামী তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার মন উঠে নাই, এই জন্যই তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে ই আরও সংক্ষিপ্ত, আরও সুবোধ্য করিবার জন্য শ্রীজীবের হস্তে করেন। জীব গোস্বামী জ্যেষ্ঠতাতের সেই আজ্ঞায় যে গ্রন্থ রচনা , উহারই নাম "লঘু তোষণী," উহার কথা পরে বলিব।

গোস্বামিগণ সকলে মিলিয়া ভাগবততত্ত্বের আলোচনা করিয়া করিয়া, বান তাঁহাদের অন্তঃকরণে যে ভাব পরিস্ফুরিত করিতেন, তাহাই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কোন প্রকার ব্যক্তিত্ব বশীভূত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এইজন্য তাঁহাদের গ্রন্থ

ভাষা হিসাবে পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু পরস্পর ভাবের বিনিময় অবিরত চ
একই ব্রতে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা সকলে মনে প্রাণে এক
গিয়াছিলেন।

"সনাতন রূপ গোপাল তিন দেহ ভেদ মাত্র।"

অনুরাগবল্লী

"বৈষ্ণব তোষণী" রচনা কালে শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস গোস্বা
পাদদ্বয় সনাতনের সন্নিকটে সহচর ও সহকারী ছিলেন, ইহা তিনি নি
উল্লেখ করিয়াছেন :—

রাধা প্রিয়প্রেম-বিশেষপুষ্টৌ
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ।
ভ্রাতামুভৌ যত্র সুহৃৎ-সহায়ৌ
কো নাম সোঽর্থো ন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ॥"

বাস্তবিক এ সময়ে সনাতন অতীব বৃদ্ধ, এক প্রকার চলচ্ছক্তিরহি
গোপাল-রঘুনাথের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৪৭৬ শকে
১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব-তোষণী সমাপ্ত হয়। সেই বৎসরই সনা
লোকান্তরিত হন

সনাতনের অন্যান্য গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ হয়, কারণ বৈ
তোষণীতে সেই সকল গ্রন্থেরই উল্লেখ আছে। শ্রীজী
লঘু-তোষণীতে সনাতনের গ্রন্থসমূহের নাম এই ভাবে লি
আছে :—

* ইহার ২৮ বৎসর পরে জীবগোস্বামীর "লঘুতোষণী" সমাপ্ত হয়।
উপসংহার আছে :—

"শকে ষট্‌সপ্ততিমণৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা। ১৪৭৬
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপক্ষৈকগণিতে তথা॥" ১৫০৪

"প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতং।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টিকা দিক্‌প্রদর্শিনী।
লীলাস্তবষ্টীপ্পনী চ নাম্না বৈষ্ণব-তোষণী॥"

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ (বৃহদ্) ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস ও তাহার প্রদর্শিনী" নামক টীকা, লীলাস্তব এবং "বৈষ্ণব তোষণী নামক গবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনী। শেষোক্ত খানির কথা আমরা পূর্ব্বে াছি। অন্যান্য গ্রন্থগুলির কথা এখন বলিব।

এই শ্লোকের ভাবে বোধ হয় "হরিভক্তি-বিলাস" নামক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গের বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ সনাতনের রচিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা গোপাল গোস্বামীপাদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বলিয়া প্রচারিত আছে। গোপাল ভট্ট একক গ্রন্থকার নহেন, তাহা ঠিক কথা; তিনি প্রারম্ভে নিজেই য়াছেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া সমস্ত শাস্ত্র হইতে মত সমাহার করিয়া, াথ দাস ও রূপসনাতনের সন্তোষ বিধানার্থ তিনি এই গ্রন্থ চয়ন করিয়া-। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই চারিজন গোস্বামীপাদ সে সময় একত্র করিতেন এবং সকলে ধ্যানচিন্তায় এক হইয়া গিয়াছিলেন। নব ের শাস্ত্র শাসন সংগ্রহকালে তাঁহারা সকলে এক মত হইয়া যে এক গ্রন্থ প্রচার করেন, উহা সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ গোপাল ভট্টের নামে ষ্ণব-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই বিরাট গ্রন্থের একমাত্র া "দিগ্‌দর্শিনী"—উহা সনাতনের নিজ রচিত। সনাতন সম্মুখে না াইয়া পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়াছেন এবং বিস্তৃত টীকায় এমন ভাবে শাস্ত্র-বাক্য করিয়া যাবতীয় প্রমাণ-প্রয়োগে সমস্ত খুঁটিনাটি সমস্যার নিরসন রিয়া দিয়াছেন যে, গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। ক্ষিণ দেশ হইতে আগত মহাপ্রভুর অনুগৃহীত গোপাল ভট্ট এবং বঙ্গ-াগত মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য মহাপ্রবীণ সনাতন এই উভয়ের নাম-মাহাত্ম্যে

সমগ্র ভারতবাসী বৈষ্ণবেরা এই গ্রন্থের বিধি নিষেধসমূহ বিনা বাক্যব্যয়ে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রদেশে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব যেরূপ সাধারণ হিন্দু-সমাজের পরিচালক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে হরিভক্তি-বিলাসও সেইরূপ।

১৪৫৩ শকে (১৫৩১ খৃঃ) গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আসেন। উহার ... বৎসর পরে রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। এই দশ বৎসর মধ্যে হরিভক্তি-বিলাস ও তাহার সনাতন-কৃত টীকা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে হরি-ভক্তি-বিলাসের বচন উদ্ধৃত হইয়াছিল। সনাতন গোপালভট্টের সহযোগে যেমন হরিভক্তি-বিলাস সম্পাদন দ্বারা বৈষ্ণব-কৃত্য ও বৈষ্ণব আচার বিষয়ক শাস্ত্রানুশাসন সঙ্কলন করিয়া প্রভুর আদেশ রক্ষা করে সেইরূপ অনুজ রূপ গোস্বামীর সহযোগে "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" রচনা করি ভক্তিসাধন প্রণালী ও রসভাবের মাধুর্য্য প্রকটন করেন। এ গ্রন্থও উভয় ভ্রাতা একত্রযোগে সঙ্কলিত করেন কিন্তু রূপের নামেই গ্রন্থকাররূপে ভারত বিখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত কথা, যিনিই গ্রন্থ লিখুন, বয়সে পাণ্ডিত্যে, বুদ্ধিতে বা ভক্তিতে সনাতন সর্ব্বপ্রধান বলিয়া, তাঁহার সম্মতি বা সহযোগিতা ব্যতীত কেহ কো মতাদির খণ্ডন-স্থাপন বা নূতন কোন উক্তির প্রচার করিতে সাহস হইতেন না।

ইষ্ট-মূর্ত্তির সেবা ও তৎসম্পর্কীয় ভজন কীর্ত্তন সময়ে সনাতনের মুখ হইতে যখন তখন গৈরিক-নিস্রাবের মত যে সকল স্তব ও প্রার্থনা স্ফুরিত হইত, তাহারই নাম লীলাস্তব। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ লীলা বর্ণিত; এই সকল স্তব হইতে সেই লীলাময়ের চরিত্রগুণই চিত্রিত

হইয়াছে, এইজন্য এই লীলা স্তবের অপর নাম দশম চরিত। * জীব গোস্বামী এই স্তবরাজি সংগৃহীত করিয়া একত্র পৃথক্ গ্রন্থে সঙ্কলন করেন। কিন্তু সনাতনের সকল গ্রন্থের মধ্যে ভাগবতামৃতই স্বতন্ত্র ও প্রধান:

"সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥"

চৈ. চ. অন্ত্য, ৪

পূজ্যপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন "বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবার, সাধন ভজনের সুগম সোপান অবলম্বন করিবার, বিবিধ লোক ও বিবিধ অবতারের তত্ত্ব অবগত হইবার, শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম পাইবার যদি চূড়ান্ত কোন গ্রন্থ থাকে, তাহা এই শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত। + মনুষ্য মাত্রই যাহাতে এক একটি আদর্শ ভক্তকে অবলম্বন করিয়া এই প্রাকৃত প্রপঞ্চ হইতে অনায়াসে সেই অপ্রাকৃত আনন্দ ধামে যাইতে পারেন, পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী এই গ্রন্থে তাহার সোনার সুযোগ করিয়া গিয়াছেন। সরল গল্পের ভিতর দিয়া সকল সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা জন্মাইয়া এক কথায়, অতি সহজে মানব-জন্ম সফল করিবার এমন গ্রন্থ আর নাই।" ‡ পরম ভাগবত পণ্ডিতাগ্রগণ্যের এই সুললিত কথার উপর আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত

* চরিতামৃতে লীলাস্তব না বলিয়া "দশম চরিত"ই বলা হইয়াছে। "লীলা স্তব দশম চরিত যারে কয়।" ভ. র, ১ম, ৫৭ পৃঃ

+ সনাতন নিজের গ্রন্থকে "বৃহৎ" বলেন নাই; নিজের কোন দ্রব্যকেই তিনি বলিতেন না। রূপ গোস্বামী এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করিয়া যখন একখানি ভাগবতামৃত লিখেন, তখন অগ্রজের গ্রন্থকে বৃহৎ ও নিজের পুঁথিকে ভাগবতামৃত বলিয়াছেন।

‡ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী বেণাপুর গ্রামবাসী কায়স্থকুল-গৌরব ৺জয়গোবিন্দ দাস (বসু চৌধুরী) নামক একজন বৈষ্ণব-

অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। গ্রন্থ মধ্যে যেমন ভাষা ও অলঙ্কারের আড়ম্বর আছে, তেমনই গুরুতর জটিল বিষয়ের আলোচনার জন্য ইহা সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য। সেই জন্য সনাতন নিজের গ্রন্থের এক বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। হরিভক্তিবিলাসের টীকার মত এই টীকারও নাম দিয়াছিলেন—"দিগ্‌দর্শিনী"। উহাতে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও সূক্ষ্মানুসন্ধিৎসার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে।

ভাগবতামৃতের উপক্রমণিকা এইরূপ:—ব্রাহ্মণ-শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করতঃ ভাগবত-কথা শ্রবণ করিতে করিতে যখন জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট দিন কয়েকটির সমাপ্তির সমীপবর্ত্তী হইতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী উত্তরা স্বল্পসময়ে ও সংক্ষেপতঃ ভাগবত-কথার সার মর্ম্ম জানিবার জন্য ব্যাকুল হন। পরীক্ষিৎ জননীর তৃপ্তি সাধনের জন্য কৃষ্ণ-প্রেমভক্তির যে সংক্ষিপ্ত সারতত্ত্ব বিবৃত করেন এবং যাহা উত্তর কালে জৈমিনি মুনি স্নেহবশে পরীক্ষিৎ-পুত্র মহারাজ জনমেজয়কে শুনাইয়া ছিলেন, সেই অমৃতময় উপাখ্যানই ভাগবতামৃত। উহাই অবলম্বন করিয়া, কামমোক্ষদায়িনী ভগবদ্ভক্তি নিরূপণের জন্য সনাতন এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে এক স্থলে এই শ্লোকটি আছে:—

"ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রাণামহং সারস্য সংগ্রহঃ।
অনুভূতস্য চৈতন্য দেবে তৎ প্রিয় রূপতঃ॥

কবি সনাতনের গ্রন্থের মূল ও টীকা উভয়ের সমন্বয় করিয়া ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ... পুস্তকের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। বিংশাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ঐ পুস্তকের সম্পাদন ... প্রভুপাদে এই উক্তি।

কটি নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সনাতন বলিতেছেন—
[illegible]ষ্ঠিত বাসুদেবের প্রিয় বিগ্রহ শ্রীনন্দকিশোর মূর্ত্তির অথবা শচীনন্দন
[illegible]ন্যদেবের শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তির ধ্যান সেবনাদি করিয়া আমার চিত্তে
[illegible]গবানের ভক্তি বিষয়ক শাস্ত্রসমূহের যে সারতত্ত্ব সাক্ষাৎ অনুভূত
[illegible]য়াছে, তাহাই এই ভাগবতামৃতে বিবৃত হইতেছে।" পণ্ডিতের শাস্ত্র
ও সাধকের সাক্ষাৎ অনুভূতি পৃথক্ জিনিস। উভয়ের একত্র
বেশে যে নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা দুর্ল্লভ পরম পদার্থ।
[illegible]গ্ন ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠে শাস্ত্র ও অধ্যাত্মসাগরের মন্থনলব্ধ অমৃতের
[illegible]াদন পাইবেন।

গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত, প্রতি খণ্ডে সাতটি করিয়া অধ্যায় আছে।
খণ্ডে মঙ্গলাচরণের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের যে নয়নাভিরাম চিত্র প্রকটিত
ছে, তাহাতে যমুনা, গিরি গোবর্দ্ধন ও মথুরা-মাহাত্ম্যের জয় গান করা
[illegible]াছে। সে জয়ধ্বনির ভাষায় রাধারাণীর নূপুর-শিঞ্জন অনুভূত হয়।
[illegible]রে সকল লোকে দেব-নরমধ্যে সকলেই কেমন বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তাহা
[illegible]ইবার জন্য পরীক্ষিত নারদের সর্ব্বলোক ভ্রমণের বৃত্তান্ত বলিয়াছেন।
[illegible]দা মাঘ মাসে তীর্থরাজ প্রয়াগ ধামে এক ব্রাহ্মণ কোন যজ্ঞমহোৎসব
করিয়া নারদ মুনির সাক্ষাৎ পান। মুনিবর সর্ব্ব প্রথমে দক্ষিণ
[illegible]জনৈক নৃপতির ভক্তির চিত্র দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে অমরাবতীতে ইন্দ্র,
[illegible]লোকে ব্রহ্মা, শিবলোক কৈলাসে গিয়া শিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
[illegible]লেন, সকলেই কৃষ্ণ ভক্ত। শিবের মুখে কৃষ্ণ ভক্ত প্রহ্লাদের অশেষ
ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি সুতলে গিয়া বৈষ্ণব কুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে সন্দর্শন
লেন; তাঁহার মুখে হনুমানের দাস্য ভক্তির বার্ত্তা শুনিয়া কিম্পুরুষবর্ষে
মহাবীরের দর্শন লাভ করিলেন; তাঁহার নিকট কৃষ্ণাবতারের কথা
[illegible]াণ্ডবগণের কৃষ্ণভক্তির প্রশংসা শুনিয়া মুনিবর ইন্দ্রপ্রস্থে অবতরণ

করিলেন ; পাণ্ডব-সভায় আসিয়া কৃষ্ণ প্রেম ভক্তির অপূর্ব্ব আ
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকায় আসিলেন ; সেখানে উদ্ধব উগ্রসে
যাদব গুণের অনির্ব্বচনীয় সেবা-ভক্তির দিব্য ছবি দেখিলেন। পরী
মাতার নিকট সেই ভূমানন্দে মাতোয়ারা দেবর্ষির নৃত্য গীত বর্ণনার
কৃষ্ণলীলার বহু আখ্যায়িকা বিবৃত করিলেন। ব্রজ-দ্বারকার গোপগে
ও যাদবগণের ভক্তির চিত্র ও নন্দনন্দনের লীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের
সঙ্গে ভগবতামৃতের প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে। এই গ্রন্থে দেবর্ষির
উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া স্তরে স্তরে শান্ত দাস্যাদি সর্ব্ববিধ ভগবদ্ভক্তির
আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। এই প্রকার যে যে সাধন পথে অগ্রস
ভক্তগণ অন্তিমে যে যে ধাম প্রাপ্ত হন, দ্বিতীয় খণ্ডে জৈমিনী
সবিস্তারে মহারাজ জন্মেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়
অপর নাম গোলক-মাহাত্ম্য খণ্ড ; ইহাতে ক্রমান্বয়ে বৈরাগ্য, জ্ঞান,
প্রণালী ; বৈকুণ্ঠধাম, প্রেম, অভীষ্ট লাভ এবং সর্ব্বশেষে কৃষ্ণলীল
প্রসঙ্গে জগদানন্দ বা ব্রজমাধুরী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভক্তির প্রণ
তাহার চরম ফল সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহের সার সিদ্ধান্তগুলি এই
সংগৃহীত হইয়াছে। সাধক যে সিদ্ধির জন্য চির-লালায়িত, ভাগবতামৃ
অমৃতের খনি। দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত লাভ করিয়া
তাহাতেই তাঁহারা অমর ; সনাতন শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া ভক্ত
অমৃতের আস্বাদন করাইয়াছেন এবং নিজে অমর হইয়াছেন।

---

(৯০)

লোকান্তর।

মানুষ অসাধারণ প্রতিভা ও অনন্ত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ
তাহার একটি জীবনে যত বড় কাজ করিয়া যাইতে পারে, সনাতন

য়াছেন। সে যুগে শ্রীচৈতন্যের মত তত্ত্বদর্শী শক্তিধর কেহ ছিলেন না;
নিজেই সনাতনের শক্তির কথা বলিয়াছেন :—

"আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঁই বুঝায়াছ ব্যবহার-ভক্তি॥

চৈ, চ, অন্ত্য, ৪

ক্তি বলে লক্ষ লোকের উপর শাসন দণ্ড পরিচালনা করা যায়, যে
বলে সর্ব্বজাতীয় ভক্তের আদর্শ স্থানীয় হওয়া যায়, সে শক্তির অপ-
ার না করিয়া সনাতন সুদীর্ঘ জীবনে ব্যবহার-ভক্তির অনুশীলন ও
শ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রভু শ্রীচৈতন্যের "দ্বিতীয় দেহ-তুল্য"
. বে. ৮-৯ পৃঃ) ছিলেন, তিনি সেই ভাবে সনাতনের প্রতি আকৃষ্ট
ন্বাযুক্ত ছিলেন। সনাতন বৃন্দাবনে গেলে তাঁহাকে মহাপ্রভু যে সব
লিখিতেন, উহা হইতে সনাতনের প্রতি তাঁহার চিত্তভাব পরিস্ফুট
উঠিত। ক্রমে মহাপ্রভু অপ্রকট হইলেন, সনাতন বিগ্রহ সেবা
ব্যাকুল থাকিতেন। তিনি রাগানুগা ভক্তির মধুর ভাবে এমন
ব হইয়া গিয়াছিলেন, * বৈষ্ণবোচিত দৈন্যে দিনে দিনে এমন দীন
কাঙ্গাল সাজিয়া ছিলেন, যে তাঁহার ত্যাগের জীবন যুগযুগান্তর ধরিয়া
সদিগেরও চরম আদর্শ হইয়া থাকিবে। পূর্ণ কলসীতে শব্দ হয় না;
র পাণ্ডিত্য এত গভীর যে তাহাতে কোন চাঞ্চল্য ছিল না, কোন
কলহে তিনি যোগ দিতেন না। সকল রহস্যের মূলোদ্ঘাটন করিলে,
সমস্যার সমাধান হইলে, মুখে যে শুভ্র সংযত হাসি ফুটে, সেই হাসির
াকে সনাতন কুঞ্জ-কুটীর আলোকিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন।
গিয়া সেখানে আশ্রয় পাইতেন, সাধন পথের পথিক গিয়া তাঁহার

* বৈষ্ণব ভক্তগণ স্থির করিয়াছেন যে সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা কালে
মঞ্জরী" নামক সখি ছিলেন।

উপদেশ-বাণীতে তৃপ্তিলাভ করিতেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গিয়া নি
আত্মশ্লাঘার প্রশ্রয় পাইতেন। সকলের গলায় জয়মালা পরাইয়া ি
সনাতন সর্ব্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত ছিলেন। নূতন কেহ বৃন্দাবনে
যদি মানবরূপী দেবতা দেখিতে চাহিতেন, বৃন্দাবনের কর্ত্তা রূপ গে
তাহাকে লইয়া গিয়া অগ্রজের সাধন কুটীরে পৌছাইয়া দিয়া আসি
তিনি চিরানন্দময়ের আড়ম্বর পরিশূন্য মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া জনম
করিতেন।

শক্তির বার্ত্তা কেহ লুকাইয়া রাখিতে পারে না; যশঃ কা
ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া আপনি ব্যক্ত হয়; সনাতনের যশঃ-ে
সর্ব্বদিক আমোদিত করিয়াছিল। কত রাজা তাঁহাকে দে
আসিতেন, * রাজশক্তি বা দানধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে ?
অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন; কিন্তু সনাতনের কিছুর অভাব
না, কাহারও নিকট কিছু চাহিবার ছিল না। কত দাতা বিফল
হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। কিন্তু দীনভিখারী ভক্ত আসিয়া তাহাকে
ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়া যাইতেন, তাহা তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন।

সনাতনের কোন অর্থের অভাব ছিল না, লোকে গল্প শুনি
স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছেন। কথিত আছে, বর্দ্ধমান জেলার অন্ত
মানকর গ্রামে এক দরিদ্র ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহার
জীবন। তিনি দারিদ্র্য-ক্লেশে প্রপীড়িত হইয়া অবে
বারাণসী ধামে গিয়া দারিদ্র্যদুঃখনাশী শিবের সাধনা করেন
প্রতিদিন ধনলাভের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। দীর্ঘকা

---

* এমনও গল্প আছে, সম্রাট আকবর সনাতনকে দেখিতে আসিয়াছি
কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে সনাতনের লোকান্তর ঘটে, তখনও
রাজা হন নাই।

।সনার ফলে তিনি একদা নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, বৃন্দাবনে গিয়া
তন গোস্বামীর শরণাপন্ন হইলে তিনি অভীষ্ট লাভ করিবেন,
তনের নিকট স্পর্শমণি আছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন,
ষ্টে খুঁজিয়া সনাতনের কুঞ্জ-কুটীর বাহির করিলেন এবং তাঁহাকে
তে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সনাতন যমুনাতীরে একদিন
মণি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা যে তিনি কুটীরে না আনিয়া
কানিয়ে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে কথা তাহার মনে
। না। স্বপ্নাদিষ্ট ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনায় অনেকক্ষণ পরে
কথা মনে পড়িল, তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দূর হইতে
লি দ্বারা মণির স্থানটি দেখাইয়া আসিলেন, ব্রাহ্মণ ভূগর্ভে সেই
পাইয়া পুলকিত অন্তরে সনাতনকে প্রণাম করিয়া নিক্রান্ত হইলেন।

পথে আসিয়া ব্রাহ্মণের মনে পড়িল "আমি করিলাম কি? সামান্য
পাইয়া কাহাকে ছাড়িয়া চলিলাম? যিনি রাজ্যধন ঋদ্ধিসম্পত্তি
ল ছাড়িয়া বৃন্দাবন-বিপিনে ভজনানন্দে আত্মহারা, আমি শিব-কৃপায়
হারই সঙ্গ ও প্রসাদ লাভ করিয়া অবশেষে সামান্য মাণিকের মোহে
য়া আসিলাম! তিনি যে ধনে ধনী হইয়া পৃথিবীর কোন ধনীকেই
বলিয়া মানেন না, তাঁহার নিকট সেই ধন না চাহিয়া- আমি পার্থিব
ক চাহিলাম। ধিক্ আমাকে! যে মাণিক তিনি হস্তে স্পর্শ
তে ঘৃণা করিয়া দূর হইতে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, আমি সেই
ত পদার্থ পাইয়া ধনবান সাজিতে আর সংসার প্রেমে ডুবিতে
তেছি, আমাকে শত ধিক!" এই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ
রলেন। সাধু সঙ্গের এমনই মধুময় ফল! স্বল্পকালের জন্য
তনের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মণের জন্মজন্মান্তরের সাধনা পরিবর্তিত
। ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল। কোন পথে একাগ্র সাধনা করিলেই

সিদ্ধি হয়, কুপথ অবশেষে সুপথে পরিণত হয়, বিল্বমঙ্গল তাহার সাক্ষী
যে যে পথেই চলিতে থাকুক না কেন, চলিবার একাগ্র প্রবৃত্তি থাকি
বক্রপথ সোজা হইয়া আসে, সামান্য অর্থ-পিপাসা পরমার্থ লা
শান্তিলাভ করে। গৃহস্থের পক্ষে ধনোপার্জ্জন করিতে দোষ না
কিন্তু সে ধন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবার পন্থা পাইলে, ধনোপার্জ্জ
পথও ক্রমে সৎ হইয়া আসে ; অর্থ সদ্ভাবে ব্যয়িত হইতে হইতে অ
উদ্দেশ্য মানব-জীবনের প্রকৃত আদর্শে বিলীন হইয়া যায়।

প্রত্যেক মানবের অন্তঃকরণে বিবেকরূপী ভগবান জাগ্রত
পথের সন্ধান বলিয়া দেন। বিবেকের ইঙ্গিতে অনুতাপাগ্নিতে
হইয়া জীবন ঠাকুর আজ নবজীবন পাইলেন, তিনি গৃহে না
সনাতনের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি গুরুক
করিলেন। "কিন্তু সনাতন তাহাকে ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অ
তোমার স্পর্শমণি যমুনাজলে নিক্ষেপ করিয়া এস, তৎপরে তোমা
মন্ত্র দিব।" ব্রাহ্মণ তখন অম্লান বদনে তাহাই করিলেন এবং অ
দীক্ষালাভে ধন্য হইয়া প্রকৃত স্পর্শমণি লাভ করিলেন। সনাতন
মত স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিয়া জীবন ঠাকুরের জীবন লক্ষগুণ
বিকাইয়া গেল। "আজ পর্য্যন্ত এই জীবনের পরিবার কাঠমাণ্ডুরা গ্র
গোস্বামী পরিবার বলিয়া পরিচিত হইয়া তত্রত্য সাধারণের শীর্ষস্থা
হইয়া আছেন।" * বংশপরম্পরায় সে গল্পকথা এখনও লোক

* শ্রীরামযাদব বাগ্চি প্রণীত "শ্রীশ্রীবৃন্দাবন রহস্য," ৫৩ পৃঃ এই মণির ক
লইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কথা ও কাহিনীতে" অপূর্ব্ব কবিতা লিখি
বাগ্চি মহাশয়ের রহস্যে এই গল্পকথা বংশপরম্পরাগত প্রবাদের ভিত্তিতে
ঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়। না হইলেই বা ক্ষতি কি? রূপক হইলেও উহা
সনাতনের চরিত্র-মাধুর্য্য বুঝিতে বাকী থাকে না।

রিত হইতেছে। এমনও গল্প আছে, জীবন ঠাকুর স্পর্শমণি যমুনাজলে করিলে, সে কথা ক্রমে দিল্লীর বাদশাহের কর্ণে উঠিল। র লোকেরা যমুনাজলে হাতী নামাইয়া দিয়া মণির সন্ধান করিবার অশেষ চেষ্টা করিল। দৈবক্রমে মণিতে ঠেকিয়া হাতীর পায়ের ল সোণা হইয়া গেল, কিন্তু মণির সন্ধান পাওয়া গেল না। মণির ন কি সকলের ভাগ্যে জুটে?

শুধু এই জীবন ঠাকুরের বংশ নহে, সনাতনের শিষ্যবংশ আরও ছ। সনাতনের সংসার-জীবনের পুরোহিত-পুত্র গোপাল মিশ্র সময়ে বৃন্দাবনে আসেন এবং সনাতন তাহার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া দান করেন।* সনাতনের জীবদ্দশায় লিখিত উড়িয়া গ্রন্থ বাকার সারস্বত" পাঠে জানিতে পারা যায় তিনি উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ কবি অচ্যুত দাসের কর্ণে মন্ত্র দিয়াছিলেন।† ৺মদনমোহনের ম মন্দির নির্ম্মাতা রামদাস কর্পূর যে সপরিবারে তাঁহার শিষ্য াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ৺মদনমোহনের সেবাভার অন্য এক শিষ্যের উপর দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস চারী। পুরুষানুক্রমে এই কৃষ্ণদাসের শিষ্য-বংশীয়েরা ৺মদনমোহনের দরের সেবাইত আছেন।‡

* ভ. র. ৫ম, ২৫২ পৃঃ।

† বিশ্বকোষ, ২১শ, ১৪৪ পৃঃ।

‡ পর পর প্রথম ৮জন সংসার-বিরক্ত বৈষ্ণব যথা:—১ সনাতন গোস্বামী, দাস ব্রহ্মচারী, ৩ পূজারী গোপালদাস, ৪ চন্দ্রগোস্বামী, ৫ দামগোস্বামী, দাস, ৭ কিশোরী দাস ও ৮ সুবলানন্দ। তৎপর গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা এই সেবায় কারী হন। ৯ কৃষ্ণচরণ, ১০ রামকিশোর (কৃষ্ণচরণের জামাতা), ১১ নৃসিংহ কিশোর কিশোরের পুত্র), ১২ হরিকিশোর (নৃসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), ১৩ প্রাণকিশোর দামোদরকিশোর, (পৌত্র), ১৫ অটলকিশোর, (দামোদরের পিতা),

সনাতন বৃন্দাবন বাসকালে যতদিন সবল ছিলেন, প্রতি বৎ ব্রজ-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। বৃন্দাবনের বনমধ্যে নানা তী উদ্ধার কাল হইতে তিনি বহুজনের নিকট পরিচিত হইয়াছিলে তাঁহার মূর্ত্তি যেমন মধুর, তাঁহার মুখের মিষ্টভাষাও তেমনই সর্ব্বজা লোকের প্রাণ কাড়িয়া লইত, তিনি সকলের সহিত আপন ভাবে মিশি পারিতেন। ক্রমে যখন তাঁহার বিগ্রহপ্রাপ্তির বার্ত্তা, কঠোর সেবা সাধনার কথা এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের ক লোকমুখে সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইল, তখন তিনি সর্ব্বজাতীয় ব্রজবাসীর নিক সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন পরিক্রমায় যাইতেন, তাঁহ আগমন সংবাদ শুনিয়াই দেশের লোক পাগল হইত। সকলে তাঁহা দর্শন করা, আদর করিয়া খাদ্যাদি দিয়া তাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য বলি মনে করিতেন। সুতরাং পরিক্রমণ কালে যেখানে তিনি বৃক্ষত আশ্রয় লইতেন, শত শত ব্রজবাসী পুরুষ স্ত্রী আসিয়া তাহার দর্শন লা করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কত উৎসব করিতে ভারে ভারে খাদ্যদ্রব্য আসিত এবং উহা দ্বারা প্রত্যহ স্থানে স্থা বৈষ্ণব মহোৎসব লইত। এইভাবে তিনি বিজয়ী সেনাপতির ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশ জয় করিতেন, বহুজনের হৃদয়রাজ্যের অধী হইতেন। সনাতন সকল লোকের আদর্শ, সকল লোকের দেবতুল্য ছিলেন।

১৬ মোহন কিশোর, (ভ্রাতুষ্পুত্র)। সেবাইত সুবলানন্দের সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবে অত্যাচার ভয়ে অন্যান্য বিগ্রহের সহিত শ্রীমদনমোহনও জয়পুরের রাজধ নীত হন। (১৬৭০ খৃঃ) কিছুদিন পর বৃন্দাবনে তদনুরূপ অন্যমূর্ত্তির হইয়াছিল। সনাতনের আরাধ্যদেবতা তাঁহার সমাধি স্থানেই বিরাজ করিতেছেন।

সনাতনের অকৃত্রিম ভক্তিতে ভক্তিক্ষেত্র বৃন্দাবনে পুনরায় এক
াবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। অসংখ্য ভক্তের আগমনে ক্রমে বৃন্দাবন
োলাহলময় হইয়া উঠে। এই জন্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রথম
তে সেখানে বাস না করিয়া গোবর্দ্ধনের পাদদেশে কুটীর বাঁধিয়াছিলেন।
াতন প্রভৃতি প্রভুদিগের প্রথমে নির্জ্জন প্রদেশে যাইবার উপায়
। না, কারণ তাহাদিগের সকলের একত্র মিলিয়া শাস্ত্রালোচনা দ্বারা
ক্ত সিদ্ধান্ত গঠন করিতে হইয়াছিল। সে কার্য্য যখন প্রায় শেষ
য়া আসিল, এবং সনাতনের নিজের গ্রন্থ-রচনায় শক্তি যখন ফুরাইয়া
সিল, তখন তিনি স্বল্পাবশিষ্ট জীবনের শেষ বেলায় নির্জ্জন সাধনার
গিরি গোবর্দ্ধনের আশ্রয় লইলেন। দেখা যায় শেষে আর তিনি
লিখিতে পারিতেন না, যাহা লিখিতেন তাহারও শোধনভার
তুষ্পুত্রকে দিয়াছিলেন।

সনাতন পূর্ব্বে নন্দগ্রামে কয়েকটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,
কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইবার তিনি নন্দীশ্বর গ্রামে মানসগঙ্গা
ক পুণ্য-সরোবরের তীরে চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে
য়া অধিষ্ঠান করিলেন। সে জন্য সে স্থানের নাম বৈঠান। বৈঠানে
লে বসিয়া তিনি রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণ আরাধনা লইয়া থাকিতেন।
বল্লভ দাসের একটি পদে আছে :—

"কতদিনে অন্তর্ম্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নামগানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে।"

গোস্বামীরও ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল। সনাতনের কোন খাদ্যপানের
। ছিল না, স্নান বা নিদ্রার আবশ্যকতা ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অজগর-

বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষ দিন কয়েক কাটাইতেছিলেন। শ্রীভগবান স্বয়ং গোপবালক মূর্ত্তিতে আসি প্রতিদিন তাঁহাকে দুগ্ধপান করাইয়া যাইতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

"সঙ্গোপনে রহে ভক্ষণের চেষ্টা নাই।
কেহ না জানয়ে কে আছয়ে এই ঠাঁই॥
কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইয়া গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া॥
গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়।
দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি গোস্বামীরে কয়॥
আছহ নির্জ্জনে তোমা কেহ নাহি জানে।
দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে॥
এই দুগ্ধ পান কর আমার কথায়।
লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিও এথায়॥
কুটীরে রহিলে মো সভার সুখ হবে।
ঐছে রহ, ইথে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে॥"

ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ, ২৫০-১পৃঃ

ক্রমে তাহার কথা প্রকাশ পাইল এবং ব্রজবাসীরা তাঁহাকে বৃক্ষত থাকিতে দেখিয়া দুঃখ পাইল। ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার জন্য কুটী বাঁধিয়া দিলেন। এই স্থানে সনাতন গোস্বামী জীবনের বেলা করিয়াছিলেন। তদীয় অনুগত শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ছায়ার মত তাঁহা সহচর ছিলেন। ৺মদন মোহনের সেবার কার্য্য রূপ গোস্বামীর ব্যবস্থ অন্যলোক দ্বারা চলিত। সনাতনের বয়স এক্ষণে প্রায় ৯০ বৎসর। তিনি অত্যন্ত জরাতুর, স্থবির, চলাচলের সাধ্য বড় কম। পরের সাহায্য ব্যতীত শৌচাদিও সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণদাস মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার কা

া হইতেন না। তাঁহার গুরুর প্রতি শ্রীভগবানের অসংখ্য কারের কৃপা-নিদর্শন তিনি দেখিয়াছিলেন।

এইভাবে কৃষ্ণদাসের সর্ব্বান্তঃকরণিক সেবায় সনাতনের চরম সাধনা মাহিত হইতে লাগিল। তিনি আর বৈঠান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে করিলেন না, বৃন্দাবনের গোস্বামীরা মাঝে মাঝে এইখানে আসিয়া তাহার চরণ দর্শন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া দুই একদিন অবস্থান করিয়া াইতেন। রূপ আসিয়া অগ্রজের পাদ বন্দনা করিয়া যাইতেন, জীব াসিয়া জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহাশীষ ভিক্ষা করিতেন, দাস গোস্বামীর সহিত াহার মাঝে মাঝে দেখাশুনা হইত। রঘুনাথের প্রিয় শিষ্য নবাগত ষ্ণদাস কবিরাজ সনাতনের মত জ্ঞান-গিরির চরণ তলে বিকাইয়া ায়াছিলেন। বৃন্দাবনের সাধারণ স্মৃতি সনাতনের সঙ্গে বিজড়িত ছিল, খানে যিনি যে আচারপালন বা উৎসব অনুষ্ঠান করিতেন, সকলেই লতেন সে সব সনাতনের মতে সনাতনের আজ্ঞায় সম্পন্ন হইতেছে।

বৈঠানে আসিয়াও কিছুদিন সনাতন গিরিগোবর্দ্ধনের পরিক্রম রিয়াছিলেন, শেষে তাহা আর সাধ্যে কুলাইত না। প্রবাদ আছে, হার ইষ্টদেবতা গোপবালকবেশে আসিয়া তাহাকে একখানি স্তরখণ্ড দিয়া গিয়াছিলেন, * তিনি উহারই চারিপাশে ঘুরিয়া পরিক্রমার ায্য সম্পন্ন করিতেন। এই ভাবে দিন যাইতেছিল। ক্রমে তাঁহার হ যন্ত্র অসাড় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম শিথিল হইয়া আসিল। দিনকৃত্য বা াফেরা সব বন্ধ হইল। সনাতন উক্ত প্রস্তরখণ্ড বা চরণ পাহাড়ী

* এই প্রস্তরখণ্ডখানি কতকটা বটপত্রাকৃতি এবং দৈর্ঘ্যে দেড় হাত। ইহাতে ষ্ণের চরণচিহ্ন আছে। এজন্য ইহাকে "চরণ পাহাড়ী" বলে। সনাতনের ধানের পর জীবগোস্বামী ঐ প্রস্তর খানি আনিয়া স্বকীয় ইষ্টদেবতা রাধাদামোদরজীর রে রাখিয়া পূজা করিতেন। এখনও সেই মন্দিরে উহা আছে।

সম্মুখে রাখিয়া আসনে বসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে শ্বাসের তরঙ্গে নাম জ
করিতেন। তখন তাহার চিত্তভাব যেন এই—

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেঽহং নিদেশং ভৃতকো যথা।"

অর্থাৎ "হে ভগবান, আমি জীবনও চাহি না, মরণও চাহি না। ভৃ
যেমন প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করে, আমিও সেইভাবে কালের প্রতী
করিতেছি।" এই অবস্থায় জীবন মরণের প্রভেদ থাকে না, ঘটাকা
ক্রমে মহাকাশে মিলাইয়া যাইতে থাকে; তখন সমাধিস্থ সাধকের পুণ্যা
কবে যে জীর্ণবাস ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, তাহা কেহই বুঝি
পারেন না। সনাতনেরও সেই ভাব আসিয়াছিল। একদিন
শিলাখণ্ড খানি সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছেন, চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছেন।
গিরিগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেছেন। আর দেখিতেছেন যেন
গোবর্দ্ধনধারী প্রভু সেই চরণ পাহাড়ীর উপর চরণ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে
শুধু তাহাই নহে, ধ্যানস্তিমিত-লোচন ভক্তের অব্যক্ত অভিলাষ বুঝি
সত্য সত্যই যেন তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি শ্রীরাধাশ্যামের যুগলরূপ তাঁহার
সমক্ষে স্বরূপে দেখা দিলেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ সনাতন দিব্যা
আত্মহারা হইয়া রহিলেন, বাহিরে কোন ভাব লক্ষণ নাই; নেত্রে
নাই, দেহে শ্বাস স্পন্দন নাই; সনাতনের সে সমাধি আর ভাঙ্গিল
তিনি ইষ্টচরণে আত্ম নিবেদন করিয়া ধরা ধাম ত্যাগ করিলেন। লো
কেহ জানিল না বটে, কিন্তু সনাতনের আত্মা স্বচ্ছন্দে লোকান্তর গ
করিলেন। ইহাকেই বলে অন্তর্ধান। ইহাকেই বলে সাধকে
নির্ব্বিকল্প সমাধির পরিণাম বা আদর্শ মৃত্যু

এইদিন ১৪৭৬ শাকের (১৫৫৪ খৃঃ) আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বৃন্দাব
ইহাকে "মুড়িয়া" পূর্ণিমা বলে। প্রতি বৎসর এই তিথিতে

দনমোহনের মন্দিরে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান মহোৎসব অনুষ্ঠিত
। মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত ভক্তগণ লীলা-কীর্ত্তন করিবার সময়ে
বিগ্রহের বিষন্ন বদন লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই সনাতনের তিরো-
রে সমস্ত বৃন্দাবনে শোকোচ্ছ্বাস বহিয়াছিল, তাঁহার লোকান্তরে বৃন্দাবন
কার হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ পাইবামাত্র সকল গোস্বামীরা শশব্যস্ত
া গোবর্দ্ধনে পৌঁছিলেন এবং সনাতনের শব-দেহ ভস্মীভূত করিয়া
াভস্ম বৃন্দাবনধামে আনিয়া ৺মদন মোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাহিত
লেন। তাঁহার সে সমাধিস্থল লক্ষ লক্ষ ভক্তের অশ্রুজল সিক্ত হইয়া
। রূপ ও সনাতন অভেদাত্মা ছিলেন, সেইভাবে তাহারা ভক্তসমাজে
ত হইতেছেন। ভ্রাতৃপ্রেমের এমন আদর্শ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল;
র জীবনের প্রকৃতি, গতি এবং লক্ষ্য সকলই এক; জীবনান্তেও
য়ে ইষ্টপদে পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন। অগ্রজ সনাতনকে রূপ
স্বামী নিজের আরাধ্য দেবতার মত ভক্তি করিতেন; * সনাতনের
রোধানের পর তিনি আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সে কথা
র বলিব। এখন শঙ্কিত চিত্তে সনাতনের কথা শেষ করিতেছি।
ার কথা ভাবিলে, লিখিলে বা বলিলে ইন্দ্রিয়গ্রাম পবিত্র হয়, পরিতৃপ্তি
ভ করে, তাহার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না, ভাষার আশা মিটে না।
দিন সন্ধ্যালোকে সনাতনের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভাবাবেশে
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া
তন-প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

* "উজ্জ্বল নীলমণি" নামক বিখ্যাত স্বকৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে রূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ
সনাতন উভয়কে সর্ব্বাগ্রে একই শ্লোকে একসঙ্গে প্রণাম করিয়াছেন।
শ্লোকটি এই :-

ভারতের পুণ্য সনাতন ধর্ম্ম
সনাতনী প্রথা রাখিয়া,
সনাতন তুমি ত্যাগের মহিমা
জগতে রাখিলে আঁকিয়া।
রম্য হর্ম্ম্যরাজি গৃহবাস ত্যজি
পথের ভিখারী সাজিলে,
কান্থা করঙ্গিয়া কাঙ্গাল সাজিয়া
মাধুকরী করি বাঁচিলে।
ভারত প্রলয়ে পায় যদি লয়,
তব স্মৃতি মুছে যাবে না;
ইতিহাস যদি উপহাস হয়,
তোমার বিনাশ হবে না।
অতুল সম্পদ উচ্চরাজপদ
চরণে দলিয়া দিয়াছ,
ধনের গৌরব যশের সৌরভ
তুচ্ছ করি চলি গিয়াছ।
স্বদেশ স্বজাতি স্বধর্ম্মের তরে
বিধর্ম্মীর সেবা কর নি,
বিবেকের মতে সত্য পথ হ'তে
রেখা মাত্র তুমি সর নি।

"নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন সদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥"

শ্লোকটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। "সনাতনাত্মা প্রভু" বলিতে নিত্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অথবা সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইতেছে।

কাঙ্গালের বেশে বৃন্দাবনে এসে
জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া,
কত তীর্থরাজি উদ্ধার করিলে
শাস্ত্রের বিচার করিয়া।
বজ্রের সেবিত ব্রজের সম্পদ
মদন গোপাল মূরতি,
তুমি যে তাঁহার সেবা প্রকাশিলে,
রাখিলে বিরাট কীরতি।
যোগে যাগে আর রাজভোগে যাঁ'র
ভোগের বিলাস বিহিত,
তোমার ভিক্ষান্নে "আঙ্গাকড়ি" ভোগে
তাঁহার যে তৃপ্তি হইত।
কুসুমের দলে, তুলসী সলিলে
করিলে যে তুমি অর্চ্চনা,
তন্ত্র মন্ত্রাচারে শত উপচারে
তেমন পূজা যে হয় না।
অশ্রুজলে অর্ঘ্য শোধন হইত;
বোধন কাতর রোদনে,
জ্ঞানের জলধি মন্থন করিয়া
স্তোত্র যে ফুটিত বদনে।
জনম ভরিয়া করম করিয়া
চরম সদ্গতি লভিলে,
রাধাশ্যামরূপ প্রেমরস কূপ
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলে।

শ্রুতি স্মৃতি আদি গ্রন্থ রাশি রাশি
স্তূপীকৃত হল কুটীরে,
সূক্ষ্ম বিচারেতে শাস্ত্র বিরচিলে
ভক্তিবাদ মূলে অচিরে।
বিরুদ্ধ বাদীর তর্কজাল ভেদি,
নব মত ধ্বজা উড়িল,
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মন্দির
সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িল।
দেশে দেশে তার তরঙ্গ ছুটিল
বৃন্দাবনে দৃষ্টি পড়িল,
লুপ্ত বৃন্দাবন মাথা তুলি পুনঃ
ভারত মাঝারে দাঁড়াল॥

সম্পূর্ণ

শ্রীরূপ গোস্বামী।

"যদ্বাক্যাৎ সাধবঃ কৃষ্ণং সংবিদন্তি সপার্ষদম্।
শ্রীরূপস্তত্ত্ববিদ্রূপঃ স মে কৃপয়তু প্রভুঃ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী

(১)

গৃহ-ত্যাগ

কুমার দেবের তিন পুত্র জগদ্বিখ্যাত *—অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। চৈতন্যদেব উহাদের নাম বদলাইয়া যথাক্রমে সনাতন, রূপ ও অনুপম খিয়াছিলেন, সেই নামেই তাঁহারা পরিচিত। এই তিন জনের মধ্যে মধ্যম। শৈশব হইতে সনাতন কিছু শান্তশিষ্ট ও গম্ভীর এবং রূপ ত্যন্ত চঞ্চল এবং উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে দের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের জন্মগ্রহণের পর অল্পদিন মধ্যে কুমার-বর মৃত্যু হয়। তখনও তাঁহার পিতা মুকুন্দদেব গৌড়-রাজসরকারে বা কোন উচ্চরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পূতচরিত্র পুত্রের কস্মিক মৃত্যুর পর, বড় দুই পৌত্রকে রামকেলিতে লইয়া আসিলেন। অমর বা সনাতনের বয়স ৮ বৎসর এবং সন্তোষ বা রূপের বয়স

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী স্বীয় "লঘুতোষণী"তে যে বংশপরিচয় দিয়াছেন, সেখানে রের পুত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"তৎপুত্রেষু মহিষ বৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে

যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্॥"

এখানে "তৎপুত্রেষু" কথা হইতে বুঝা যায় যেন তাঁহার আরও পুত্র ছিল। কুলগ্রন্থাদি কোথায়ও তাঁহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুতরাং া তিন পুত্রের কথাই ধরিব।

৫ বৎসর মাত্র। বল্লভ তখন একান্ত শিশু বলিয়া কিছুদিন বাক্‌ল বাটীতে থাকিলেন এবং কয়েক বৎসর মধ্যে অন্য পরিবারবর্গের স রামকেলিতে গিয়াছিলেন। অমর ও সন্তোষের রামকেলি আসিবার প মুকুন্দদেব ১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে উ ভ্রাতা রীতিমত বিদ্যার্জ্জন করেন। প্রতিভার পথ আপনি উন্ম হয় বটে, কিন্তু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মুকুন্দদেবের চেষ্টা, যত্ন ও বালকদিগের সুশিক্ষালাভের সুব্যবস্থাই হইয়াছিল। বাল্যকাল হই দুই ভ্রাতায় প্রাণে প্রাণে এমন মিলন হইয়া গিয়াছিল যে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারিতেন না। জীবনের প্রথম হইতে উভয়ের গতিমতি ধ্যানধারণা একই পথে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল

উভয়ের শিক্ষাগুরু একই ছিলেন। সনাতন যে সকল প্র পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন, তাঁহাদের কথা তিনি নিজেই বলি গিয়াছেন; উহাদের পরিচয় আমরা যথাস্থানে পূর্ব্বে দিয়াছি। (৬৬ পৃ রূপেরও শিক্ষাগুরু তাঁহারাই। তদ্ব্যতীত তিনি অন্য কোন কে অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় ন তবে পিতামহের মৃত্যুর পর যখন সনাতন রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হন, তখ রূপ শিক্ষার্থী ছিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে তিনিও রাজসরকারে কার্য্যর হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেহই কখনও পরবর্ত্তী জীবনে বিদ্যার্জ্জ বিরত হন নাই। আজীবন শিক্ষার্থী না হইয়া কেহই মানব-সমাজে শিক্ষক-পদবাচ্য হন নাই। দর্শনশাস্ত্রে সনাতনের এবং কাব্য-ব্যাকরণাদি রূপের কিছু বিশেষ অধিকার ছিল। যৌবনেই লোকের কবিত্বের উ হয়, রূপেরও তাহা হইয়াছিল। তিনি গৌড়ে থাকিতেই তাঁহার দুইখা কাব্য—হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ—রচনা করেন। অগ্রজ অপেক্ষা বোধ হয় পারসীক ভাষায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলে

কাব্যানুরক্তির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহার ভাষার মধ্যে
মলকাব্যকলার মধুর নিক্কণ অনুভূত হয়, তাহাতে পারস্য
র ঋণ অস্বীকার করা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,
মে থাকিয়া উভয় ভ্রাতায় তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাসনকর্ত্তা
ফকর্ উদ্দীনের নিকট থাকিয়া পারসীক ভাষা শিক্ষা করেন।*
নাতনের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ
র কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপকে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ পদ প্রদান করেন।
গের কার্য্যে যেরূপ সূক্ষ্মসন্ধান, কার্য্য-কুশলতা এবং লোক পরি-
ক্ষমতা থাকা প্রয়োজনীয়, রূপের তাহা ছিল। তিনি স্থূলকায়
, তাঁহার মুখাবয়বে এমন এক প্রকার কঠোর তেজস্বিতা প্রচ্ছন্ন
যে তাঁহাকে দেখিলেই লোকে মস্তক অবনত করিত। সুকুমার
তনের প্রশান্ত মূর্ত্তি ও ভাব-গাম্ভীর্য্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে
করিত, রূপের মুখপ্রতিভা দেখিয়া সকলে তাহাকে ভয় করিত।
মত ব্যক্তি লোকপাল হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা
দেখিব, বৃন্দাবনে গিয়া তিনিই তথাকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন।
মত রাশিভারী লোকদিগের অন্তঃকরণে কোন নীচতা বা
া আসিতে পারে না, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সবকার্য্যে বিশ্বাসী ও
শালী হন। রাজকার্য্যে রূপের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার

এই ফকর্ উদ্দীন সৈয়দ বংশীয়। তিনি কাস্পিয়ান হ্রদতীরস্থ "আমূল" নগর
সয়া সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করেন। তথায় তাঁহার বিদ্যাবত্তার যশঃ সর্ব্বত্র
য়। সেখানে তাঁহার নামীয় মস্‌জিদ্ আছে। উহাতে উৎকীর্ণ শিলালিপি
জানা যায়, মস্‌জিদ্‌টি তাঁহার পুত্র সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাসেন কর্ত্তৃক ৯৬৩
১৫২৯ খৃঃ) সুলতান নসরৎ শাহের সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই মস্‌জিদ্‌টি
পূর্ত্ত-বিভাগ হইতে সংরক্ষিত হইয়াছে। মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৩২।

জন্য সুলতান হুসেন শাহ তাঁহাকে "সাকর বা সাকের (বিশ্বস্ত) ম
এই সম্মানসূচক নাম ও উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি সকল ক
বলদর্পের সহিত করিতেন। তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইতে বিলম্ব হইত
সঙ্কল্প হওয়া মাত্র উহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ় চেষ্টা করি
রাজস্ব-সচিবরূপে রূপ যে রাজা প্রজা সকলের নিকট হইতে
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।
এমন সুন্দর ভাবে পারসীক লিখিতে, পড়িতে ও অনর্গল বা
পারিতেন, এবং সকল মুসলমান কর্ম্মচারীর সহিত মিশিয়া কার্য্য নি
করিতেন যে, সাকর মল্লিক মুসলমান বা হিন্দু ছিলেন, তাহা
বুঝিতে পারিত না। নানাভাবে বিধর্ম্মীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ
মিশিতে গিয়া তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা সকলেই কতকটা ম্লেচ্ছা
হইয়া গিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রাজকার্য্যে তাঁহ
অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত এবং মুসলমানী হাবভাবে তাঁহাদি
আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইতে হইলেও তাঁহারা নিজগৃহে কখনও
চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পণ্ডিতগণকে পাইলে দর্শ
শাস্ত্র লইয়া ঘোর তর্কবিতর্ক করিতেন।

এমন সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলিতে আসিলেন।
বৈদ্যুতিক প্রবাহে ভ্রাতৃগণের সকল মরিচা কাটিয়া গেল, তাঁহা
অন্তর্নিহিত জ্যোতিঃ বাহির হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু সনাতন ও রূ
ভক্তিপ্রীতি ও দৈন্যভাবে মুগ্ধ হইয়া উভয়কে ভক্তরূপে আত্মসাৎ ক
তাঁহাদের নামকরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহারা অ
প্রগাঢ়ভাবে ভক্তিসাধনে ও ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণে আত্মনিয়োগ করিলে
মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিয়া নিয়মিতভাবে জপানুশীলন করিতে লাগি
এবং সময়ে সময়ে নির্জ্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়া আধ্যাত্মিক জগ

রে উঠিতেছিলেন। চাকরী তাঁহাদের নিকট কখনও ভাল লাগে উচ্চপদ হইলে কি হয়, উহার শৃঙ্খল ভারী বলিয়া গায়ে যেন বাজিত। চৈতন্যদেবের কৃপা লাভের পর তাঁহারা অনেক হইয়া গেলেন। ম্লেচ্ছাচার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া াবে সাত্ত্বিক আচারাদি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নানা অনুষ্ঠানে এবং প্রাত্যহিক ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহারা নূতন মানুষ ান।

। অবস্থায় দাসত্বের চাকরী আর ভাল লাগিত না। সনাতন কিছু তিনি শান্তভাবে অবস্থা বিচার করিতে লাগিলেন, রূপ কিছু চঞ্চল, চাকরী তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। একটা ুনা যায়, এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটিল। একদিন প্রত্যূষে খুব ইতেছিল; গুরুতর রাজকার্য্যানুরোধে রূপ সেই সময় পাল্‌কীতে রবারে যাইতে ছিলেন। এক ধোপা ও ধোপানী তখনও াগ করে নাই। ঘরের পশ্চাত হইতে বাহকদিগের পদশব্দ ধোপানী অনুমান করিল শৃগাল, ধোপা বলিল রাজবাড়ীর কোন নতুবা এমন বর্ষায় এত সকালে রাজবাড়ী অভিমুখে যাইবে কেন। রূপের কানে গেল। প্রধান ঘটনা যাহা ঘটে, পূর্ব্ব হইতে উহা থাকে, তবে আপাততঃ একটা উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয় মাত্র। ামান্য ঘটনায় রূপের মনে ভীষণ বিতৃষ্ণা জন্মিল, চাকরী দাসত্বই বং চাকরেরা শৃগালের মতই ঘৃণ্য। ম্লেচ্ছ রাজার দাসত্ব পরিত্যাগ জন্য কৃতসংকল্প হইয়া রূপ সেদিন গৃহে ফিরিলেন, আর করিলেন না। উভয় ভ্রাতায় পরামর্শ হইল, দুইজনেই াগ করিবেন, ইহাই স্থির হইল। তবে সনাতন বিশেষ বিবেচনা বলিলেন, উভয়ে এক সময়ে কার্য্যত্যাগ করিলে তাঁহাদের উপর

ঘোর অত্যাচার হইতে পারে। সনাতনের পদ অতি উচ্চ এবং অ
দায়িত্বপূর্ণ; এজন্য স্থির হইল, তিনি অগ্রে চাকরী ছাড়িবেন না;
অগ্রে চাকরী ত্যাগ করিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রূপের সংকল্প গ
কার্য্যসিদ্ধিতে বিলম্ব সহ্য হয় না। বিশেষতঃ তাঁহার মনে এক ক
নির্ব্বেদ ভাবের উদয় হইয়াছিল।

সনাতন কোন দিনই তেমন সংসারী ছিলেন না; রূপই ছি
সংসারের কর্ত্তা, সকল কার্য্যের ব্যবস্থাপক, ধনসম্পত্তির রক্ষক
প্রকৃত অধ্যক্ষ। তবে রূপ অগ্রে চলিয়া গেলে যে সংসারের
অসুবিধা ঘটিবে, সনাতন তাহা বুঝিলেন। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল
রূপ কিছু ধরিলে ছাড়িবার পাত্র নহেন।

রূপ অল্পদিন মধ্যে সকলের সঙ্গে হিসাবপত্র মিটাইলেন, ধনস
গুছাইয়া লইলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কার্য্যাদি কিরূপে চ
তাহার ব্যবস্থা স্থির করিলেন। ধনসম্পত্তি যাহা পাইলেন সংগ্রহ ক
নৌকায় বোঝাই করিয়া রূপ গৃহাভিমুখে চলিলেন, কেবল মাত্র—

"গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে।"

সনাতনের আবশ্যক ব্যয়ের জন্য দশহাজার টাকা গৌড়ে এক
মুদির ঘরে গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। রূপ ও বল্লভ উভয়ভ্রাতা রাম
বাটী হইতে সমস্ত পরিবারবর্গ * নৌকাযোগে সঙ্গে লইয়া

* রূপ সনাতন গৃহত্যাগী হইবার পর এমনভাবে সংসার জীবনের গ
মুছিয়া ফেলিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পরিবারবর্গের
সংবাদই আমরা পাই না, কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে সে প্রসঙ্গ নাই। শ্রীচৈতন্য
আসিবার সময়ে সনাতন সস্ত্রীক তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, এ কথা
"চৈতন্যমঙ্গলে" আছে, জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং এ

দ্বীপে ও কতক ফতেহাবাদের অন্তর্গত প্রেমভাগে পাঠাইলেন।+ বহুধন লইয়া প্রেমভাগে নিজগৃহে আসিয়াছিলেন। তথায় অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে দান করিলেন, বাকী যাহা রহিল তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। এবং সরকারের অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া অপরার্দ্ধ পরিমাণ টাকা কস্মিক বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিশ্বস্ত

তনের স্ত্রী বাক্লায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ধরিতে পারি। রূপের স্ত্রী জীবিত লেন কিনা জানি না; সম্ভবতঃ ছিলেন না, রূপের অগ্রে গৃহত্যাগের তাহাও ণ হইতে পারে। প্রেমবিলাসে (২৩শ, ২২৩ পৃঃ) কিন্তু রূপের স্ত্রীর গল্প আছে। এতঃ সনাতন বা রূপের কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না, থাকিলে হারা জীবের সঙ্গে বৃন্দাবনে না গেলেও অন্ততঃ শিক্ষালাভের জন্য নবদ্বীপে সিতেন। বল্লভের পুত্র জীব এই সময়ে মাতার সঙ্গে বাক্লায় গিয়াছিলেন, হাতে সন্দেহ নাই, কারণ শ্রীচৈতন্যের রামকেলি আগমনের সময়ে জীব অতি শিশু লেন এবং তিনি মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ সময়ে রূপ ও বল্লভ একত্র যাত্রা করিয়া পথে আসিয়া রূপ প্রেমভাগের বাটীতে কেন এবং বল্লভকে দিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র জীব ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে ক্লার বাটীতে প্রেরণ করেন। উঁহাদিগকে রাখিয়া বল্লভ প্রেমভাগে আসিয়া তার সঙ্গে মিলিত হন।

\+ "পূর্ব্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে।
কত চন্দ্রদ্বীপে কত ফতেহাবাদেতে॥
শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকায় চড়িয়া।
বহুধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া॥"

ভ. র. ১ম, ৪৬ পৃঃ

ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। * শ্রীরূপ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে যে সব দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভূমিদানেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রপিতামহ পদ্মনাভ জাহ্নবীতীরে বর্ত্তমান কাটোয়ার সন্নিকটে নৈহাটি গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তৎপুত্র মুকুন্দদেবও সেইখানে বাস করিতেন। ঐ গ্রামের দুই তিন মাইল দূরে দক্ষিণখণ্ড নামে একটি গ্রাম এখনও আছে। তথাকার গোস্বামী বংশীয়েরা পদ্মনাভের গুরুপদে বরিত হন। রূপ প্রেমভাগে আসিয়া দক্ষিণখণ্ডের সেই কুলগুরু যিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে আহ্বান করেন এবং পারসীক ভাষায় দানপত্র লিখিয়া দিয়া প্রেমভাগের তৎসন্নিহিত স্থানে বহুল পরিমাণ ভূমি উহাকে দান করেন। এখনও দক্ষিণখণ্ডের ঠাকুর উপাধিধারী গুরুবংশীয়েরা ঐ সকল জমি ভোগ করিতেছেন এবং উহার দলিলপত্র তাঁহাদের নিকট আছে।

গৌড় হইতে চলিয়া আসিবার পূর্ব্বেই রূপ নীলাচলে দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন মহাপ্রভু চৈতন্য শীঘ্রই বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, তিনিও সেই সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইবেন, এই সংকল্প ছিল। যখন তিনি প্রেমভাগের বাটীতে বিষয় বিত্তের ব্যবস্থাদি লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে নীলাচল হইতে তাঁহার প্রেরিত লোকেরা ফিরিয়া

* "শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহুধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল॥"

চৈ. চ. মধ্য ১৯শ.

। সংবাদ দিল যে, মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া-
ণ ইতিমধ্যে বল্লভ বাক্‌লা হইতে প্রেমভাগে আসিয়া পৌছিলেন;
উভয় ভ্রাতায় ব্যস্ততার সহিত কার্য্যব্যবস্থা করিয়া চিরজীবনের মত
্যাগ করিলেন।

(২)

শিক্ষা ও দীক্ষা।

রূপ প্রেমভাগ হইতে অনুজ বল্লভের সহিত পদব্রজে যাত্রা করিয়া
: সোজা পথে গঙ্গাতীরে আসিয়া পড়িলেন এবং তীরবর্ত্তী রাজপথ
। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রাণে এশান্ত আবেগ, মনে
। উদ্যম, বাহিরে নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন ভাব,—উভয় ভ্রাতা গৌরাঙ্গের
াভের আশায় অবিশ্রান্ত হরিনাম করিতে করিতে প্রয়াগের দিকে
ন, কারণ তাঁহারা শুনিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল হইতে বৃন্দাবন
করিয়াছেন। পথে তাঁহাকে ধরিতেই হইবে। কোথায় অন্তরঙ্গ
, হর্ম্ম্য অট্টালিকা, বিপুল বৈভব পড়িয়া রহিল—সংসারের সকল
সুখ মলপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া সংসারবিরাগী ভ্রাতৃদ্বয় দেশত্যাগ
। বহুকাল হইতে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা হরি নামের
-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে এই গান যেখানে সেখানে শুনিয়া আসিতেছে—

"রূপ সনাতন, ভাইরে দু'জন,
তাঁরা ব্রজের পথে চ'লে যায়।"

সে গানে আমাদের প্রাণে যে উদাস নির্ব্বেদ ভাব আনিয়া দেয়, রূ
সনাতনের জীবন কথার স্বরূপ আলোচনা করিলে তাহা আরও দৃঢ় কর
দিবে। সনাতনের গৃহত্যাগের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কি
সময়ের হিসাবে তিনি এখনও গৃহত্যাগ করেন নাই। রূপই অ
গৃহত্যাগ করেন। তিনি পথে আসিয়া শুনিলেন, সনাতন হুসেন শা
কোপে পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তখন রূপ এক বি
গৌড়ীয় ভৃত্য কর্ত্তৃক অগ্রজের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তি
গৌড়ে এক মুদির নিকট যে দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছে
সনাতন যেন উহাই উৎকোচ দিয়া নিজে মুক্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বৃন্দা
যান। তথায় তাঁহারা সকলে মিলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয়
করিবেন। ইহার পর সনাতন কিরূপে কারামুক্ত হইয়া পলায়ন করি
কাশীধামে পৌঁছিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কিছুদিন মধ্যে রূপ ও বল্লভ প্রয়াগে আসিয়া শুনিলেন, মহা
বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে তথায় আসিয়াছেন। সেখানে প্রে
বন্যা বহিয়াছে। গঙ্গাযমুনা উভয়ে মিশিয়াও প্রয়াগকে ডুবাইতে প
নাই; কিন্তু মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্রয়াগকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে
তিনি যখন বিন্দুমাধব দর্শনে গেলেন, লক্ষ লক্ষ লোক নাচিতে নাচি
সঙ্গে সঙ্গে চলিল,

"কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায়
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়।"

রূপ ও বল্লভ নিভৃতে সেই লোক-সংঘের সঙ্গে চলিলেন, বিন্দুমা
মন্দিরে প্রভুর আবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথা হইতে বাহির
যখন শ্রীচৈতন্যদেব এক পূর্ব্বপরিচিত দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণের বা
নিমন্ত্রিত হইয়া গেলেন, তখন শ্রীরূপ ও বল্লভ উভয়ে গিয়া দণ্ডবৎ

প্রণাম করিয়া প্রভু সাক্ষাৎ করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়-কূপ হইতে কাড়িল দুই জন॥"

পরে উভয়কে নিকটে বসাইয়া সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি কারাবদ্ধ শুনিয়া বলিলেন, শীঘ্রই সনাতন মুক্ত হইয়া আসিবেন।

গৃহস্বামী দুইভাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহারা তথায় আসিয়া প্রসাদ পাত্র ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। ত্রিবেণীর উপর প্রভুর বাসরের সন্নিধানে দুই ভাই আসিয়া বাসা করিলেন। এই সময়ে বল্লভ নিকটবর্ত্তী আড়াইল গ্রামে ছিলেন, তিনি বৈদিক যাজ্ঞিক এবং প্রবীণ কুলীন। তিনি আসিয়া মহাপ্রভুকে এবং রূপ বল্লভ দুই ভাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভট্ট রূপের রূপ দেখিয়াই মোহিত হইয়াছিলেন, পরে যখন তাঁহাকে রূপের বিবরণ বলিলেন, তখন ভট্ট উহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে যান, উভয়ে "অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুইহ মোরে" বলিয়া সরিয়া পলাইতেছিলেন। মহাপ্রভু দূরে বসিয়া হাসিতে লাগিলেন। নৌকায় চড়াইয়া প্রভুকে স্বগণসহ নিজ বাটী লইয়া গিয়া পরমভক্তিতে সেবা করিলেন, রূপ ও বল্লভ প্রসাদান্নে ধন্য হইয়া সঙ্গেই ছিলেন। সংবাদ রটিলে যখন ভট্টের বাটীতে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল, তখন লোকভিড় ভয়ে প্রভু নৌকায় আসিয়া ত্রিবেণীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে এক নির্জন গৃহে অবস্থিতি করিলেন। তথায় দশদিন থাকিয়া তিনি রূপকে প্রেমধর্ম্মের নিগূঢ় স্বরূপ শিক্ষা দিলেন। কবিকর্ণপূর স্বপ্রণীত "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নাটকে রূপের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন।

রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করেন শক্তিসঞ্চারিয়া।
কৃষ্ণভক্ত ভক্তিতত্ত্ব রস-তত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইলা প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিল॥"

চৈ. চ. মধ্য, ১৯শ।

প্রভু বলিলেন, "রূপ! তুমি শুন ভক্তিরসের লক্ষণাদি অ[illegible] সংক্ষেপে সূত্ররূপে তোমাকে বলিতেছি। ভক্তিরস-সিন্ধু অসীম এ[illegible] অতল, তোমাকে আস্বাদন করাইবার জন্য উহার এক বিন্দুম[illegible] বলিতেছি। * জীব জগৎ স্থাবর ও জঙ্গম—এই দুই ভাগে বিভক্ত জঙ্গমের মধ্যে তির্য্যক্, জলচর, স্থলচর প্রভৃতি শাখাভেদ আছে। মনুষ্য জাতি উহার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক। তাহা হইতে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ বৌদ্ধ শবরাদি বাদ দিলে প্রকৃত ধর্ম্মাচারী লোকের সংখ্যা কম তন্মধ্যে আবার জ্ঞানী ও মুক্তিকামী অত্যল্প। সেই অত্যল্পের মধ্যে নিষ্কাম ও শান্ত কৃষ্ণভক্ত অতি সুদুর্ল্লভ। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশে সেবার নাম ভক্তি।

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।"

অর্থাৎ যখন কেহ অন্য বাঞ্ছা ছাড়িয়া, অনন্যচিত্ত হইয়া, অন্য দেবতা পূজা ছাড়িয়া জ্ঞান কর্ম্ম সব পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণসেবা করেন, তখন তাহাকেই বলে শুদ্ধা ভক্তি। তখন তাঁহা[illegible]

ন ভুক্তিমুক্তির কোন স্পৃহাই থাকে না। এই ভক্তি অনুরাগাত্মক। : অনুরাগ বা রতি ক্রমে গাঢ় হইয়া প্রেম উৎপন্ন হয়।

সাধনের ক্রম অনুসারে ভক্তি আট প্রকার; ভাব, প্রেম, প্রণয়, হ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাব এবং ভক্তের বিভিন্ন ভাবানুসারে ভক্তিরস পাঁচপ্রকার যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ক সনাতনাদি শান্ত ভক্ত, মহাবীরাদি দাস্য ভক্ত, ভীমার্জ্জুন ও দামাদি সখ্য ভক্ত, নন্দযশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য ভক্ত এবং ব্রজগোপীগণ রসভক্তের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শান্তভক্তির দুইটি প্রধান গুণ—কৃষ্ণনিষ্ঠা গ-ত্যাগ। দাস্যরসে এই দুই গুণ ত আছেই, অধিকন্তু সেবা ও ছে। দাস্যভক্ত ঈশ্বরকে পূর্ণৈশ্বর্য্যযুক্ত মনে করিয়া একান্ত মনে সেবা রন। এজন্য দাস্য দুইটি গুণের সমষ্টি। সখ্যরসে শান্তের মত সেবা ও তৃষ্ণাত্যাগ ত আছে; পরন্তু দাস্যে যেমন সম্ভ্রম ও গৌরব নে সেবা—সখ্যরসে বিশ্বাসময় এবং অসম্ভ্রম সেবা থাকে। অধিকন্তু অত্যন্ত মমতা ও আত্মসমজ্ঞান আনয়ন করে। এজন্য ইহা তিনটি ণর সমষ্টি। বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবন এবং সখ্যের চ ও অসম্ভ্রম ভাব আছে, এমন কি, মমতাধিক্যে ভর্ৎসনাদিও। এই চারিরসের গুণের সমাহারে বাৎসল্য অমৃততুল্য র হয়।

মধুর রসে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ অসম্ভ্রম ভাব ং বাৎসল্যের মমতাধিক্য ত আছেই, অধিকন্তু—

"কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ॥"

প্রভু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "রূপ! মি ভক্তিরসের দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম, তুমি ইহার বিস্তার মনে মনে

ভাবনা করিও। ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃকরণে কৃষ্ণের স্ফুরণ হয় কৃষ্ণ-কৃপায় অজ্ঞব্যক্তিও রসসিন্ধু পারে যায়।"

এই বলিয়া প্রভু রূপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে বৃন্দাব পাঠাইয়া নিজে বারাণসী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রূপ তদব তদ্গতচিত্ত হইয়া এই ভক্তিরসের তত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, বৎসরের প বৎসর এই তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিয়া, অবশেষে জ্যেষ্ঠ সনা গোস্বামীর সহযোগে সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু" রচনা করেন। কিন্তু সেই বিরাট গ্রন্থেও পঞ্চ অর্থাৎ মধুররসের বিশেষ বিস্তার হয় নাই বলিয়া পরে "উজ্জ্বল নীলমণি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখেন। সে কথা পরে বলিব।

(৩)

বৃন্দাবন ও নীলাচল।

মহাপ্রভু কাশীযাত্রা করিলে রূপ অনুজ বল্লভ বা অনুপমের স বৃন্দাবন যাইবার পথে প্রথমতঃ মথুরায় আসিলেন। সেখানে ধ্রুব তাঁহাদের সহিত আর একজন ভক্তের দেখা হয়; ইনি সুবুদ্ধি রা তিনি গৌড়ে একজন সঙ্গতিসম্পন্ন ভূম্যধিকারী ছিলেন। হুসেন রাজতক্তে বসিবার বহুপূর্ব্বে যখন ভাগ্যান্বেষণে গৌড়ে আসেন, তিনি এই সুবুদ্ধি রায়ের অধীন চাকরী গ্রহণ করেন। যখন এক দীঘি খনন করিবার ভার তাঁহার উপর ছিল, তখন ঐ কার্য্যে কে

াধের ফলে রায় তাঁহাকে চাবুক মারিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন। সে
কর ক্ষত তাহার পৃষ্ঠে ছিল। হুসেন গৌড়ে বাদশাহ হইলে একদা
র স্ত্রী পৃষ্ঠে ঐ দাগ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হুসেন
পূর্ব্বিক সকল ঘটনা বলিলে রাণী সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করিতে
। কিন্তু হুসেন পূর্ব্ব প্রভুর প্রাণ নাশ করিতে কিছুতে চাহিলেন
তখন তাঁহার মুখে করোয়ার পানী দিয়া তাঁহার জাতি মারা
। সুবুদ্ধি তখন সকল বিষয়-বিত্ত ছাড়িয়া দেশত্যাগী হইয়া কাশীতে
লেন। সেখানে তিনি পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা
তাঁহারা তাঁহাকে তপ্তঘৃত পান করিয়া মরিতে বলিলেন।
সময়ে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার পথে কাশীতে ছিলেন। তিনি
লন "সেরূপ কিছু করিতে হইবে না, তুমি বৃন্দাবনে গিয়া নিরন্তর
কীর্ত্তন কর, তাহাতেই তোমার পাপ যাইবে।" সুবুদ্ধির সুবুদ্ধি
তিনি তাহাই করিলেন। তিনি মথুরাতে আসিয়া দীনহীন
লের মত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ
করিয়া আনিয়া এক এক বোঝা পাঁচ ছয় পয়সায় বিক্রয় করিতেন,
নিত্য এক পয়সার চানা (ছোলা) চিবাইয়া জীবনরক্ষা করিতেন;
পয়সা বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তদ্দারা গৌড়ীয় ভক্ত
তাহাকে তৈলমর্দ্দন ও দধিভাত ভোজন করাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ
।

থুরায় আসিয়া এই সুবুদ্ধি রায়ের সহিত রূপের সাক্ষাৎ হইল।
উভয়কে পূর্ব্ব হইতে চিনিতেন, এখন উভয় নির্ব্বিণ্ণ ভক্তের সাক্ষাৎ
রূপ গোস্বামীকে পাইয়া সুবুদ্ধি আনন্দে গলিয়া গেলেন. তাঁহাকে
আদর ও প্রীতি করিলেন। তিনি রূপকে সঙ্গে লইয়া গিয়া
দ্বাদশ বন দেখাইলেন। বৃন্দাবন তখনও বনস্থলী মাত্র।

সে বনস্থলীকে তীর্থস্থল করিবার উদ্দেশ্যে রূপের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর আদে কেবলমাত্র লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী তথায় আসিয়া বৃক্ষতলে বাঁধিয়াছেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রূপ এই প্রথমবার বৃন্দা আসিয়া উঁহাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। পাইলে সেবারে উঁহাদের পরস্পর অন্তরঙ্গতা জন্মে নাই। কারণ রূপের মনপ্র তখন অত্যন্ত ব্যাকুল। একে তিনি কবি ও ভাবুক, তাহাতে মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন এবং শুদ্ধাভ সারতত্ত্ব মধুর রসের প্রকৃতি তাঁহাকে শিখাইলেন, তখন হইতে কেমন প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, একপ্রকার আত্মবি হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ নির্ব্বেদ বশতঃ বিষয় ত্যাগ, ত্যাগ ও ত্যাগ, তাহার উপর চৈতন্যদেব তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া একপ্র অচৈতন্য করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার মনের ভিতর ভাবের আগুন করিতেছিল। এদিকে হৃদয়ের দেবতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কারাগ তাঁহার কি গতি হইল, তিনি মুক্তি পাইয়া আসিতে পারিলেন প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও মুক্তিপথ উন্মুক্ত হইল কিনা, এতদিন বৃন্দাবনে আসিলেন না কেন, এই সকল ভাবিতে ভা রূপ আর একমাসের অধিককাল বৃন্দাবনে তিষ্ঠিতে পারিলেন সনাতনের সন্ধানে বাহির হইলেন।

"মাসমাত্র রূপ গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলিয়া আইল সনাতনানুসন্ধানে॥"

চৈ. চ.

রূপ ও অনুপম শুনিলেন, মহাপ্রভু গঙ্গাতীর পথে কাশী গি সুতরাং তাঁহারাও সেই পথে কাশী চলিলেন। এদিকে সেই

য়ে সনাতন কাশী হইতে রাজপথ ধরিয়া মথুরাতে আসিতে ছিলেন।
০০ পৃঃ) এজন্য তিন ভ্রাতায় পথে মিলন হইল না।

"গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাহা সনে না হইল মিলন॥"

দুই ভাই কাশীতে পৌঁছিয়া সনাতনের দীক্ষালাভ ও বৃন্দাবন যাত্রার
া শুনিলেন। দেখা হইল না বলিয়া কত শোক করিলেন, কিন্তু
নি মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিতে পারিয়াছেন শুনিয়া আনন্দও
ইলেন। প্রভু তখন নীলাচলে ফিরিয়াছেন। রূপ তখন কোন্
যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি প্রভুর আজ্ঞা ছিল,
বার নীলাচলে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিবার। বৃন্দাবন বা
লাচল কোন্ দিকে ফিরিবেন, সমস্যা বড় বিষম। অপর পক্ষে
পমের একবার গৌড়ে যাইবার প্রয়োজন ছিল। সনাতনের
ড়ত্যাগ করিবার পর বিষয়াদির শেষ ব্যবস্থা কি করা হইবে, তাহাও
ার কথা। সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিবার জন্য অনুপম ভ্রাতাকে
বার গৌড়ে যাইতে বলিলেন। অনুপম রঘুনাথজী বিগ্রহের উপাসক,
ভক্ত ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনবাসী হইবেন কিম্বা কোথায় থাকিবেন
ই ঠিক ছিল না। সুতরাং রূপ দেখিলেন, ভ্রাতার অনুরোধে
গিয়া ব্যবস্থাদির পর নীলাচলে প্রভুসন্দর্শন ও শুরুসঙ্গের পর
বনে গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করাই শ্রেয়ঃ।

তাহাই হইল। উভয় ভ্রাতা গৌড়ে গেলেন। বিধির বিধান
য়। তথায় অকস্মাৎ কয়েকদিনের অসুস্থতায় অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি
অভিন্ন হৃদয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার শোকে রূপের হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া
কিন্তু তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, চৈতন্যগতপ্রাণ। সকল শোক
। করিয়া বিষয়-বিত্তের কতক দান করিলেন, কতক বিক্রয় করিয়া

ভ্রাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্যয়িত করিলেন, কতক পরিবারবর্গে
ভরণপোষণ জন্য বাকলার বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, যত শীঘ্র
দেশত্যাগ করিলেন, আর তিনি কখনও দেশে ফিরিয়া আসেন নাই।
এই সময়ে অনুপমের একমাত্র পুত্র শ্রীজীব অল্পবয়স্ক বালক
তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।
পরিজনসহ বাকলার বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

রূপ পদব্রজে আসিয়া কতদিনে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। সে
খুঁজিয়া খুঁজিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে হরিদাস ঠাকুরের নিভৃত ভজন
উপস্থিত হইলেন। রূপ যে আসিবেন, তাহা হরিদাস প্রভুর
পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন।

"হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি আসিবে মোরে প্রভু যে কহিলা॥"

উভয়ে পরম প্রীতিতে নানা কথায় সে রাত্রি যাপন করি
মহাপ্রভু প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমন্দিরে উপলভোগের পর হরিদাসের কু
আসিতেন। পর দিন প্রাতে আসিবা মাত্র রূপ গিয়া তাঁহাকে দ
প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিয়
সনাতন প্রভৃতির কত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুক্ষণ
মিলিয়া সেইস্থানে পরমানন্দে ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। পুরীধামে উৎস
বর্দ্ধিত হইল

তখনও রথযাত্রার কয়েকদিন বাকী আছে। বহু গৌড়ীয়
এবার শ্রীধামে আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ
ছিলেন। পরদিন প্রাতে মহাপ্রভু সকল ভক্তকে সঙ্গে লইয়া
কুটীরে আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি বারংবার শ্রী
নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিতে লাগিলেন "আপনারা সকলে রূপকে আ

ন। সেই শক্তির বলে ইনি যেন কৃষ্ণ ভক্তিরস বিষয়ক গ্রন্থসমূহ
করিতে পারেন।" এইভাবে দিনের পর দিন পরমানন্দে কাটিতে
ল। ক্রমে রূপের কবিত্বের আভাষ সকলে পাইলেন; তাঁহার
চরিত্র, বিনীত প্রকৃতি এবং দিব্যমূর্ত্তির এমন এক মোহিনী শক্তি
যে, তাহাতে অল্পদিন মধ্যে প্রভুর গৌড়ীয় ও উড়িয়া সকল
রূপকে স্নেহভাজন করিয়া লইলেন। কোনদিন প্রভু ভক্তগণকে
গুণ্ডিচাবাড়ী মার্জ্জন করেন, কখনও সমুদ্র স্নানে আনন্দ করেন,
ও দিন বা সমুদ্রতীরে আইটোটায় আসিয়া বনভোজন করেন।
বে দৈনন্দিন উৎসব আমোদ চলিতে লাগিল। রূপ হরিদাস
রর নির্জ্জন কুটীরে থাকেন; সেখানে বাহিরের লোকের গতিবিধি
কোন গ্রাম্যবার্ত্তা সেখানে পৌছে না। প্রভু যখন ভক্ত সঙ্গে
ন, তখন যাহা আনন্দ, অন্য সময়ে কুটীর নির্জ্জন, তপোবনতুল্য
র নিলয়। সেখানে হরিদাস ঠাকুর অধিকাংশ সময় ইষ্ট-মন্ত্র-জপে
আর নিকটে বসিয়া রূপ গোস্বামী শাস্ত্র আলোচনা ও গ্রন্থরচনা
বিব্রত থাকিতেন। হরিদাস ও সনাতনের মত রূপ ও আপনাকে
ম বলিয়া মনে করিতেন, এজন্য কখনও শ্রীমন্দিরে যাইতেন না,
তে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করিতেন। প্রত্যহ মহাপ্রভুর ব্যবস্থায়
র হইতে উভয়ের জন্য প্রসাদ আসিত, তাহাই গ্রহণ করিয়া
স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ সাধনায় নিরত থাকিতেন।

বেই বলিয়াছি, রূপগোস্বামী আজন্ম সুকবি; একাধারে এমন
পাণ্ডিত্য ও ভক্তি অতি কম দেখা যায়। গৌড়ে থাকিতে তিনি
ও উদ্ধব-সন্দেশ নামক কাব্য রচনা করেন। উহা পরে বৃন্দাবনে
ইয়া প্রচারিত হয়। গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি
লা বিষয়ক নাটক লিখিতে থাকেন। উহাতে তিনি কৃষ্ণের

কাশী হইতে নীলাচলে আসিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে আত্ম সমর্পণ ক
এবং ক্রমে এমন অনুরঙ্গ ভক্ত হন যে, লোকে তাহাকে মহাপ্রভুর দ্বি
স্বরূপ বা কলেবর বলিত। বৈষ্ণবেরা বলেন ইনি পূর্ব্বলীলার ল
সখী। স্বরূপ ছিলেন "সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।" পাণ্ডি
ও কলা বিদ্যার এমন সমন্বয় বড় একটা হয় না। তাঁহার সুমধুর সঙ্গী
শ্রীচৈতন্য যখন তখন বিভোর হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। স্ব
সর্ব্বদা ছায়ার মত প্রভুর পার্শ্বচর থাকিয়া প্রেমোন্মোদে তাঁহাকে সা
প্রদান করিতেন। স্বরূপ যে শুধু সরস ভক্ত তাহা নহে, তিনি বৈ
সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং কঠোর সূক্ষ্ম সমালোচক। প্রভুর সম্বন্ধে
কোন কবিতা বা গ্রন্থ লিখিলে, তাহা স্বরূপের অভিমত ব্যতীত
গ্রহণ করিতেন না।

"গ্রন্থশ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥"

কারণ প্রভু কোন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা রসাভাস সহ্য করিতে পারি
না, এজন্য স্বরূপকে পরীক্ষকের (censor) কার্য্য করিতে হইত, তাঁহ
অনুমোদন ব্যতীত কোন রচনা প্রভুর মনঃপূত হইত না। রূপ প্র
বড় প্রিয়পাত্র; তাঁহাকে দিয়া তিনি ভক্তিরস শাস্ত্র লেখাইবেন।
কিছু কিছু রচনা শক্তির পরিচয়ও তিনি পাইয়াছেন, উহা তাঁহা
ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ভাল বলেন কিনা তাহাই তাঁহার
হইল। একদিন দৈব ক্রমে সন্দেহের মীমাংসা হইল। প্রভু "কা
প্রকাশের" একটু শ্লোক * উদ্ধার করিয়া রথাগ্রে নৃত্য করি

* কাব্য-প্রকাশের শ্লোকটি এই:—
"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্র ক্ষপাস্তেচোন্মীলিত মালতী স
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ। সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার লীলা বিধৌ
রোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

কটির ভাব এই, প্রকৃত স্থান মাহাত্ম্যে চারিপাশের স্বাভাবিক
ভার মধ্যে অনাড়ম্বরে ভক্তের মনে যে ভাব স্ফুরণ হয়, অন্যত্র নানা
রপাট্যেও সে প্রেমের সমুদ্রেক হয় না। স্বরূপ একটি গানে উহার
সংক্ষেপে প্রকটিত করেন, অন্য কেহ প্রকৃত মর্ম্ম বুঝেন নাই।
ন প্রভু আসিয়া দেখিলেন হরিদাসের কুটীরের চালে রূপ ঠিক ঐ
একটি অতি সুন্দর রচনা* তালপত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন। রূপ
হার মনের ভাব টানিয়া লইয়া কিরূপে শ্লোক লিখিলেন, প্রভু তাহাতে
বিস্মিত ও রূপের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেন।

ইহার পর একদিন প্রভু রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ এই দুইজন
শাস্ত্রজ্ঞ ভক্ত সমালোচক সঙ্গে লইয়া রূপের নাটক পরীক্ষা করিলেন।
ও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে
নিজেই রূপের খাতা পত্র টানিয়া স্থানে স্থানে পড়িতে লাগিলেন;
ত রূপের হস্তাক্ষর বড় সুন্দর,

"শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥"

তে কবিতাগুলির সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব কবিত্ব এবং ছন্দের লালিত্য যেন
চ্ছুসিত হইয়া পড়িতেছিল। সে কাব্য কলার অন্তরালে নিগূঢ় ভাব
মানব হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া অপার আনন্দ দান করে।
বিদগ্ধ মাধবের পাণ্ডুলিপি প্রারম্ভ হইতে একটি সুন্দর শ্লোক

---

*শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামীর শ্লোকটি এই :—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"

পড়িতে লাগিলেন। সেই মধুর শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়-কডম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥
চেতঃ প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

ইহার ভাবার্থ এই—কৃষ্ণ এই দুইটি বর্ণ কি অমৃত দিয়াই গঠিত। ই যখন জিহ্বায় উচ্চারিত হয়, তখন শত শত রসনা প্রাপ্তির ইচ্ছা কা কর্ণে শুনিলে কোটি কোটি কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে, মনে জাগিলে সব ইন্দ্রিয়গ্রামই ইহার নিকট পরাভূত হয়।* নাম মাহাত্ম্য সূচক এ মধুর শ্লোক কেহ কখনও শুনেন নাই।

"সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥"

স্বরূপ তখন রামানন্দের নিকট রূপের নাটক রচনার কথা দিলেন। রায় তখন একে একে নাটকের লক্ষণানুযায়ী নানা গ্র হইতে নানা প্রসঙ্গের শ্লোক পাঠ করিতে রূপকে বলিলেন। লাজুক, অতি বিনীত, সহজে নিজের শ্লোক পড়িতে চান না মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায় না। সুতরাং একে একে রামান ফরমাইজ মত নানাস্থান হইতে শ্লোক গুলি পড়িয়া শুনাই লাগিলেন। সে শ্লোকগুলি এত মধুর, নাটকের ও অলঙ্কার শা নিয়মানুসারে এমন ভাবে লিখিত এবং এরূপ ভাবে সিদ্ধান্তবিরোধ যে শুনিয়া মহাপ্রভুর ত কথাই নাই, দুই কঠোর সমালোচক

* বিখ্যাত পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাস এই অপূর্ব্ব শ্লোকটির অতি সুন্দর পদা করিয়াছেন।

ন্দ ও স্বরূপ উভয়ে অবাক্ হইয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়ে
র অসংখ্য শ্লোক পঠিত, ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত হইল। কাহারও
বলিবার ছিল না। সকলের মুখে এক কথা—সে শুধু প্রশংসার
প্রেমরসের উৎপত্তি, স্বভাব, সহজ প্রেম এবং এমন কি, প্রেম-
র কবিতাগুলিও অতি সুন্দর। গ্রন্থদ্বয় সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়,
ায় লক্ষণাবলী অনুসারে বিচার করিলে আদর্শ নাটক এবং প্রেম
রসের সিন্ধু-স্বরূপ। এমন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তযুক্ত, এমন সরল, সরস ও
কাব্য অতি বিরল। রামানন্দ শতমুখে রূপের কবিতার প্রশংসা
ত লাগিলেন।

"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥"

চৈ, চ, অন্ত্য, ১ম।

অপেক্ষা সে সময়ে আর কোনও বড় প্রশংসাপত্র হইতে পারিত না।
নিজে সূক্ষ্মদর্শী নাট্যকার। কিন্তু তাঁহারও একটা সন্দেহ
নিরস্ত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেন তিনি যেমন সতর্ক
সূক্ষ্মরসতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া "জগন্নাথ-বল্লভ" নাটক লিখিয়াছেন,
করিয়া বোধ হয় অন্যে লিখিবে না। আজ তিনি বুঝিলেন,
তাঁহার নহে, রূপেরও নহে, শক্তি সকলই ঈশ্বররূপী শ্রীগৌরাঙ্গের।
মহাপ্রভুকে বলিলেন,

"ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥

মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সে করিবে, জগৎ তোমার বশ॥

চৈ,।

রূপের লেখনী সার্থক হইয়াছিল। তিনি দোল পূর্ণিমার কিছুদিন নীলাচলে ছিলেন। মোট দশ মাস থাকিবার পর তিনি বৃন্দা ফিরিবার অনুমতি পাইলেন। প্রভু ভক্তদিগের নিকট তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন, সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া রূপ গোস্বামী অবশে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। প্রভু বলিয়া দিলেন,

"ব্রজে যাই রস শাস্ত্র কর নিরূপণ
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার॥"

প্রভুর পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হয়। তিনি সনাতনকে একবার নীলাচলে পাঠাইবার জন্য রূপের নিকট দিলেন। সনাতনও ঠিক সেই সময় নীলাচলে আসিতে ছিলেন, তিনি আসিতে ছিলেন ঝাড়িখণ্ডের বনপথে, রূপ চলিয়া গেলেন বিষ্ণুপু রাজপথে। উভয়ের সঙ্গে পথে দেখা হইল না। রূপের চলিয়া যাই ৮।১০ দিন মাত্র পরে সনাতন নীলাচলে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। কথা যথাস্থানে বলিয়াছি (১০২ পৃঃ)।

(৪)

সেবার ত্রিমূর্ত্তি

১৫৪০ শকের শেষভাগে (১৫১৯ খৃঃ) শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে
য়া আসিলেন এবং জ্যেষ্ঠ সনাতনের সাক্ষাৎ পাইয়া পরমানন্দিত
নে। এই বার বহুকাল পরে উভয় ভ্রাতার সম্মিলন হইল। উভয়ে
র সাধনায় ও শাস্ত্রালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরিমূর্ত্ত প্রেমিকের
র্ণ স্বরূপ শীঘ্রই সর্ব্বজাতীয় ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। একদিকে
। দৈন্যমূর্ত্তির অন্তরালে পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইতে লাগিল, অন্যদিকে
নই রাগানুগা ভক্তির দিব্যোন্মাদে তাহাদিগকে সকলের স্মরণীয় ও
য় করিয়া তুলিল। একভাবে যেমন কাহারও মনে কোন আধ্যাত্মিক
। উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সমাধানের প্রত্যাশায় উঁহাদের দীর্ণ
রর দ্বারস্থ হইতেন, অন্যভাবে তেমনই কেহ মানবরূপী দেবতা দেখিয়া
চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের দর্শন লাভের জন্য লালায়িত
ন। তাঁহাদের ভজনকুঞ্জ মানবপুঞ্জের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত
।

কত ভক্ত ও শিষ্য আসিলেন। তাহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের
প্রদেশ হইতে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া বৃন্দাবনে আসিল।
দের সাহায্যে সনাতনের বিচার-শক্তি ও রূপের কবিত্ব-প্রতিভা নূতন
শাস্ত্রপথ পাইয়া গিরি নদীর মত ক্ষিপ্র গতিতে ছুটিয়া চলিল।
দের লিখিত, সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত ভক্তিগ্রন্থ সমূহ বিশ্বমানবের সার
ত্ত হইতে লাগিল। সনাতনের গ্রন্থরাজির মর্ম্ম কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি,
গ্রন্থরচনার পরিচয় পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দিব। এখানে রূপ গোস্বামীর
জীবনের অন্ত চিত্র দিতেছি। মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার

সময় বলিয়া দিয়া ছিলেন (৯৮ পৃঃ) যে তিনি যেন শ্রীধামে তাঁহার ভক্ত বৃন্দের আশ্রয় স্থল হন। কিন্তু সে কার্য্য তাঁহার একনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারাই বিশেষভাবে সাধিত হইয়াছিল। সনাতন কিছু আত্ম গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সাধারণ কর্ম্মপটুতা রূপেরই অধিক উপযুক্ততার অনুপাতে মানুষের কর্ম্মভার আপনিই জুটিয়া থাকে। চৈতন্য দেবের প্রবর্ত্তনায় বা প্রচারিত উপদেশের ফলে, যেমন দলে দলে ভক্ত নানাদিক হইতে বৃন্দাবনে আসিতে ছিলেন, রূপ অগ্রণী ও উদ্যোগী তাহাদের সকলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যিনি যেমন প্রকৃতির লোক, তাহাকে সেইভাবে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে দিয়া, সকল অভাব অভিযোগের সুমীমাংসা করিয়া, রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের ভক্ত মণ্ডলীর কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। এই কর্ত্তৃত্ব গোস্বামী নামের সার্থকতা রাখিল। কাযের লোক চিনিয়া লইতে কাহারও বিলম্ব হয় না। নূতন ভক্ত কেহ আসিলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে রূপকেই খুঁজিয়া বাহির করি[illegible] প্রবাসী ভক্তেরা অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকেই দেখাইয়া দিতেন; [illegible] পর্ব্ব উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইলে রূপই তাহার ব্যবস্থা করি[illegible] এই প্রকার নানারূপে রূপ শ্রীকৃষ্ণরঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগি[illegible] শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবনের রাজা, রূপ হইলেন তাঁহার রাজ-প্রতিনিধি নাম শীঘ্রই দেশে দেশে প্রচারিত হইল, শত শত ভক্ত তাঁহার অনু[illegible] করিয়া ব্রজমণ্ডলে এক সংঘ গড়িলেন। লোকে রূপের কথায় বসিত এবং তাঁহার উপদেশের বলে জ্ঞানে ও সাধনায় পথে অগ্রসর ধন্য হইল। কে বড়, কে ছোট, তাহা সকলে জানিত না, রূপ এই জোড়া নামে সকলে রূপেরই প্রাধান্য স্বীকার করিত। [illegible] প্রতি এমন অবাধ প্রতিপত্তি কম শক্তির পরিচায়ক নহে।

এই ভাবে রূপ লোক-সেবা বা ভক্ত-সেবা করিতেন। সেবাই

সে সেবার ত্রিমূর্ত্তি ছিল। প্রথম লোক সেবার কথা বলিলাম, তঃ শাস্ত্র সেবার কথা বিশেষ ভাবে পরে বলিব, তৃতীয়তঃ অধ্যাত্ম া সাধক জীবনের প্রধান অঙ্গ যে বিগ্রহ-সেবা তাহারই কথা এইস্থানে ছি। রূপ-সনাতনের বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিবার পর কত বৎসর গেল। গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ভক্তগণ আসিয়া মিগণের দলপুষ্টি করিতেছিলেন। এমন সময়ে মহাপ্রভু অকস্মাৎ লে অপ্রকট হইলেন, তখন রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বৃন্দাবনে আসিয়া লইলেন। কয়েক মাস পরে ১৪৫৫ শকের শেষভাগে (১৫৩৪ খৃঃ) ৷ গোস্বামী ৺ মদন গোপাল বিগ্রহ আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার হাপন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রূপ গোস্বামী ও অতি সুপ্রাচীন বিগ্রহ বিন্দদেবের আবিষ্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সেবার জন্য ভুর যে আদেশ ছিল, তাহা প্রতিপালিত হইল। ক্রমে সকল ভক্তই ক বিগ্রহের সেবা স্থাপন করিয়া বিগ্রহের নামে পরিচিত হইয়া ।

ই সকল বিগ্রহের মধ্যে ৺গোবিন্দদেবই সর্ব্বপ্রধান। ইনি ব্রজ-র প্রসিদ্ধ অষ্ট মূর্ত্তির অন্যতম (১০৮ পৃঃ)। মদন গোপালের সঙ্গে াপ গোস্বামী তাঁহার আবিষ্কার করেন। কেহ কেহ বলেন মহাপ্রভুর শায় তাঁহার উদ্ধার হইয়াছিল এবং সে সংবাদ নীলাচলে প্রেরিত শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া জনৈক ভক্তকে বৃন্দাবনে করিয়াছিলেন। হইতে পারে, কারণ যে "চৈতন্য চরিতামৃতে" ভুর অপ্রকট হওয়ার পরবর্ত্তী কোন ঘটনার বর্ণনা নাই, তাহাতে াই দুই বিগ্রহের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু একথাও সঙ্গে সঙ্গে যে, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কয়েক মাস পরে সনাতন কর্ত্তৃক মদন ল বিগ্রহ স্থাপিত হন। এবং ইঁহার বৎসরাধিককাল পরে ৺গোবিন্দ

দেবের সেবা স্থাপিত হয়। হয়তঃ পূর্ব্বে এই বিগ্রহের আবিষ্কার হইলে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাসমারোহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে ৺গোবিন্দদেব আবিষ্কার যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে মহারাজ বজ্রনাভ-বিনির্ম্মিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ বিরাজ করিতেন, তাহা শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ছিল। উহার আবিষ্কার করিবার জন্য রূপের মনে একান্ত বাসনা হয়। তিনি যখন ব্রজের তীর্থস্থানের অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, তখন কোথায় যোগপীঠ কোথায় গোবিন্দ তাহাই চিন্তা করিতেন। সর্ব্বদা হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ বলিয়া ইষ্ট চরণে মনের বাসনা জানাইতেন। শ্রীভগবান চিরকালই ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কোনরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন; ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীরা বিশেষতঃ হিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস করেন; কারণ চিরদিনই স্বয়ং প্রকাশিত হন।

একদিন রূপ গোস্বামী যখন যমুনা তীরে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সজলনে শ্রীভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ এক পরম ব্রজবাসী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়া গেলেন, "যেখানে এ গোমাটিলা দেখিতেছ, এইস্থানে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে একটি গাভী আসিয়া এ স্থানে দুগ্ধ বর্ষণ করিয়া চলিয়া যায়, এইস্থানে গোবিন্দ বিগ্রহ আছেন" সে কথা শুনিতে শুনিতে রূপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; কিছুক্ষণে মেলিয়া দেখিলেন, ব্রজবাসী আর নাই। তখন তিনি অবিরাম নিষিক্ত হইতে হইতে নিকটবর্ত্তী ব্রজবাসীদিগের নিকট গিয়া সব বলিলেন। তাহারাও দুগ্ধস্রাবের কথা অনেকে জানিতেন, কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তখন আবালবৃদ্ধ সকলে মিলিয়া গোমাটিলা নামক প্রাচীন ভগ্নাবশেষের উচ্চ স্তূপে আসিয়া দুগ্ধধারাসিক্ত স্থান খনন করি

অপরূপ প্রাচীন বিগ্রহ পাইয়া আনন্দ ধ্বনিতে সকলে গগন বিদীর্ণ লেন।* গোমাটিলা যে পুরাতন যোগপীঠ এবং সেই "কোটী মোহন" শ্রীকৃষ্ণ-মুর্ত্তিটি যে প্রাচীন ৺গোবিন্দ বিগ্রহ, তাহা রূপ গোস্বামী াণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমে কথা রাষ্ট্র হইল, অসংখ্য আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করিল, কয়েক দিন ধরিয়া ঐস্থানে এক ৎসব চলিয়াছিল। •

বিগ্রহপ্রাপ্তি মাত্র রূপ গোস্বামী পত্র সহ একজন লোককে নীলাচলে ইলেন।

"গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্রীরূপ গোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঞি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু পার্ষদ সহিতে।
পত্রীপড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে॥"

ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ, ৯১পৃঃ

প্রভু আনন্দে অধীর হইয়া স্বীয় পার্ষদ কাশীশ্বরকে পাঠাইলেন। সঙ্গ ছাড়িয়া কাশীশ্বরের পুরীধাম ত্যাগ করিতে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। প্রভুর আদেশ অলঙ্ঘ্য। কাশীশ্বরের তৃপ্তির জন্য মহাপ্রভু তাহাকে

---

*শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামীকৃত "সাধন-দীপিকা" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই বিবরণ ছিল। উহা হইতে মূল শ্লোক সকল উদ্ধার করিয়া "ভক্তি-রত্নাকরে" ৺গোবিন্দ বঙ্গার বর্ণিত হয়। সাধন-দীপিকা গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইলেও, ভক্তি রে উদ্ধৃত মূল শ্লোকগুলি অবিশ্বাস্য নহে। রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বৃন্দাবনের বিখ্যাত াস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। তিনি যখন মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তের নিজ মুখে অনেক কথা লিখিয়াছেন বলিয়া উক্ত আছে, তখন তাহাকে রূপ সনাতনের দের সমসাময়িক বলিয়া ধরিতে পারি। এমন ভক্তের গ্রন্থের কথা অসন্দিগ্ধভাবে হইবার যোগ্য।

"শ্রীগৌর-গোবিন্দ" নামক নিজের একটী স্বরূপ-বিগ্রহ সঙ্গে দি
ইহাই বোধ হয়, বৃন্দাবনে আনীত সর্ব্বপ্রথম চৈতন্যমূর্ত্তি। কা
বৃন্দাবনে আসিয়া গোবিন্দদেবের মূর্ত্তির সন্নিকটে উক্ত ইষ্টবিগ্রহ
করিয়া প্রেমাবিষ্ট চিত্তে অদ্ভূত সেবা করিতে লাগিলেন।* এই
বিগ্রহ প্রথমতঃ পর্ণকুটীরেই স্থাপিত হন। পরে মন্দির নির্ম্মিত হয়।

বিগ্রহ আবিস্কারের বহু পূর্ব্বে মহাপ্রভুর আজ্ঞা ক্রমে শ্রীরঘুনাথ
গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া রূপসনাতন সন্নিধানে আশ্রয় লইয়াছি
তিনি অতি উৎকৃষ্ট ভাগবত-পাঠক এবং সুকণ্ঠ গায়ক। দেখিতে
সুপুরুষ, তাঁহার চরিত্র ততোধিক মধুর। অল্পদিনেই তিনি বহু
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে স্পষ্ট উ
আছে, এই রঘুনাথ ভট্ট,

"নিজশিষ্য কহি, গোবিন্দ মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভুষণ করি দিল॥"

অন্ত্য, ১

রঘুনাথ নিজের মনোমত অলঙ্কারে বিগ্রহকে ভূষিত করিলেন।
কোন শিষ্য গোবিন্দের জন্য মন্দির ও জগমোহন নির্ম্মাণ করিয়া।

* এই কাশীশ্বরের নিজ মুখে শুনিয়া "সাধন-দীপিকা" গ্রন্থে বিবরণ প্র
ইহাতে বুঝা যায়, সর্ব্বাগ্রে রূপ কর্ত্তৃক গোবিন্দ দেব আবিষ্কৃত হন, তখন
প্রকট ছিলেন; উহার কিছু দিন পরে, সনাতন মথুরা হইতে মদন গোপাল
প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ তখনও প্রকৃষ্ট বিধানে মহাসমারোহে ৺গোবিন্দ
অভিষেক কার্য্য হয় নাই। এইজন্য ৺গোবিন্দ দেব অগ্রে আবিষ্কৃত হইলে
অভিষেক উৎসব পূর্ব্বোক্ত সেবাপ্রাকট্য পুথির মতে অনেকদিন পরে ঘটয়াছি
পুঁথিতে লেখা আছে, ১৫৯২ সম্বৎ অর্থাৎ ১৪৫৭ শক (১৫৩৬ খৃঃ) মাঘ
শুক্লপঞ্চমী তিথিতে ৺গোবিন্দ দেবের অভিষেক হয়।

জগমোহনে বসিয়া রূপ সনাতন ও অন্য ভক্তেরা প্রত্যহ অপরাহ্নে
...থের মুখে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতেন। সে ব্যাখ্যাও যেমন মনোরম,
...কালে অপূর্ব্ব রাগ-রাগিনীর সমাবেশ ততোধিক চিত্ত-মনোহারী।

"পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।"

চৈ, চ, ১৩

...থ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য কর্ত্তৃক গোবিন্দদেবের প্রথম মন্দির নির্ম্মিত
কিন্তু এই শিষ্যটির নাম কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।
কিছুদিন পরে রূপ গোস্বামীর অন্তর্ধানের পূর্ব্বে গোবিন্দদেবের
শ্রীরাধিকামূর্ত্তি সংস্থাপিত হন। উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্র মহা-
ভক্ত শিষ্য ছিলেন। নীলাচল হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের তিনিই
সহায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র পুরুষোত্তম জানা বংশানুক্রমে
বৈষ্ণব। তিনিও প্রতাপরুদ্রের মত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন।
...ই বলিয়াছি (১১৪ পৃঃ) পরম ভক্ত পুরুষোত্তম বৃন্দাবনে মদন গোপাল
গোবিন্দদেব বিগ্রহদ্বয় শ্রীহীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন
...া, উঁহাদের বাম ভাগে প্রতিষ্ঠার জন্য দুইটি ধাতুময়ী রাধিকা-মূর্ত্তি
করাইয়া মহাড়ম্বরে বৃন্দাবনে পাঠান। কিন্তু স্বপ্নাদেশ হয় যে, উহার
একটি রাধিকা ও অপরটি ললিতা সখী। এজনা রাধিকা ৺ মদন

...বিন্দ দেবের এই প্রথম মন্দির সম্ভবতঃ তত সুন্দর, স্থায়ী বা বৃহৎ ছিল না।
...ৎসর পরে সেই মন্দির জীর্ণ ও সৌন্দর্য্যবিহীন হইলে, অম্বরাধিপতি মহারাজ
...হ ৺গোবিন্দদেবের সুবৃহৎ এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত পাষাণ মন্দির রচনা
। চরিতামৃতের বর্ণিত শিষ্যটি যে মানসিংহ নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।
...নিক ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে ৺গোবিন্দদেবের প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হয়। মানসিংহের
তারিখ আছে—১৫৯০ খৃঃ অর্থাৎ প্রায় ৫৫ বৎসর পরে।

গোপালের বামে ও ললিতা তাঁহার দক্ষিণে একই মন্দিরে স্থাপিত। এই বার্ত্তা শুনিয়া পুরুষোত্তম ৺গোবিন্দদেবকে কিরূপ ভাবে শ্রী করিবেন, তাহারই জন্য উৎকণ্ঠিত হন। কথিত আছে, সাক্ষীগো যেমন একসময়ে বৃন্দাবন হইতে উৎকলে গিয়াছিলেন, সেইরূপ

"কোন এক সময়ে রাধা বৃন্দাবন হৈতে।
আইলা উৎকল দেশে ভক্তাধীন মতে॥"

ভ, র, ৪৬১

সে প্রদেশে বৃহদ্ভানু নামে এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বাস করিতে ভাগ্যক্রমে উক্ত রাধামূর্ত্তি তিনিই পান এবং তদবধি তাঁহার নিবাস স্থা নাম হয়—রাধানগর। শ্রীরাধা বৃহদ্ভানুর গৃহে কন্যাতুল্য স্নেহ সেবায় বাস করিলেন। কিছুকাল পরে পুরীর রাজা রাধানগর হইতে ঐ মূর্ত্তি আনিয়া পুরীর সন্নিকটে চক্রবেড় নামক প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানে সেই মূর্ত্তি লক্ষ্মী বলিয়াই পূজিত ও ছিলেন। পুরুষোত্তম এই লক্ষ্মীমূর্ত্তিকেই মহাসমারোহে শোভা করিয়া ৺গোবিন্দদেবের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং তি আসিয়া গোবিন্দের বামে রাধা হইয়া বসিলেন।* এই রাধাগো সম্মেলন উৎসবে রূপ গোস্বামী ভক্তির উৎস ছুটাইয়া "চাটু পুষ্পাঞ্জ নামে শ্রীরাধিকার এক অপূর্ব্ব স্তোত্র রচনা করেন।

সনাতনের অন্তর্দ্ধানের কয়েকমাস পরে রূপ; ও অল্পদিন

* সেই ভাবে এখনও আছেন, তবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের অত্যাচার ভয়ে মূল দ্বয় জয়পুরে নীত হন এবং এখনও সেই খানে আছেন। প্রতিভূ-বিগ্রহ নির্ম্মাণ পরে বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই রাধার আগমনের গল্পটিও "সাধনদী গ্রন্থের অনুবর্ত্তনে নরহরি-কৃত ভক্তিরত্নাকরে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভ, র, ষষ্ঠ ৪৬১ পৃঃ।

নাথ ভট্ট দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে আকবর দিল্লীশ্বর, মথুরার
টে আগরায় তাঁহার রাজধানী। তাঁহার মত সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শী
নুভব নৃপতি আর কথনও মোগলতক্তে বসেন নাই। তিনি
মাড়বার জয় করিবার পর চিতোর দুর্গ অধিকার করিয়া (১৫৬৮খৃঃ)
মীঢ়ে অবস্থান পূর্ব্বক সমগ্র মিবার রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ
তে ছিলেন, নিকটবর্ত্তী শিক্রীতে তাঁহার প্রথম পুত্র সেলিমের
হয় বলিয়া যখন তিনি সেই স্থানে রাজধানী স্থাপনের আয়োজন
তে ছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তিনি একসময় বৃন্দাবন
ণ আসিয়া গোস্বামী প্রভুদিগের ক্রিয়া কলাপ দর্শনে একান্ত মুগ্ধ
। রূপ সনাতন তখন জীবিত ছিলেন না; আকবরের সিংহাসন
ভর দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা পরলোকগত হন। এ সময়ে জীব
স্বামী ব্রজ-মণ্ডলের কর্ত্তা ছিলেন; তাঁহারই সঙ্গে বাদশাহের সাক্ষাৎ
হয়। তখনও মানসিংহ রাজসরকারে উচ্চ রাজপদ পান নাই;
নও আকবর বঙ্গ-বিজয়ে মনঃসংযোগ করেন নাই। ইহার প্রায়
বৎসর পরে যখন মহারাজ মানসিংহ পাঁচ হাজারী মনসবদার হইয়া
কবরের নিকট পুত্রবৎ স্নেহগৌরবের অধিকারী হন, এবং বঙ্গ বিহার
ড়্যার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া যাত্রা করেন, (১৫৯০খৃঃ) তাঁহারই
চালে তিনি বৃন্দাবনে ৺গোবিন্দদেবের জন্য একটি অপূর্ব্ব মন্দির
াণ করিয়া দেন। সে কথা উক্ত মন্দির-গাত্রের একটি শিলালিপিতে
ছ; পরে তাহার আলোচনা করিতেছি।

সম্ভবতঃ এ সময়ে ৺গোবিন্দদেবের প্রথম মন্দিরটি জীর্ণদশায় পড়ে।
জন্যই মানসিংহ স্বীয় পদোচিত গৌরব ও আন্তরিক ভক্তির নিদর্শন

বাদশাহের বৃন্দাবন দর্শনের তারিখ সম্ভবতঃ ১৫৭০ খৃঃ; গ্রাউস সাহেবও তাহাই
Mathura, p. 123

স্বরূপ এই বহুব্যয়সাধ্য বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করেন। অম্বরের রাজবংশীয়েরা চিরদিন পরম বৈষ্ণব ছিলেন; মানসিংহও ঐ সময় পর্য্যন্ত বংশধারানুসারে পরম বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাই। যখন তিনি "গৌড় উৎকল অধিপ" হইয়া আসেন, তখনকার কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে তাঁহাকে "বিষ্ণু-পদাম্বুজ ভৃঙ্গ" বলিয়া বর্ণনা করা আছে। মন্দির রচনা শেষ হইলে তথায় ৺গোবিন্দ দেবের অভিষেক ক্রিয়া ও সেবার বিপুল ব্যবস্থা করিবার পর মানসিংহ বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি কাশীতে আসিয়া রাজার মন্দির, মান-সরোবর নামক বাপী এবং মা... মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে, বারাণসীতে আসিয়া তিনি কামদেব ব্রহ্মচারী নামক বঙ্গীয় সন্ন্যাসীর নিকট শাক্ত-মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং সেইজন্যই পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিক্রমপুর হইতে মহাবীর কেদার রায়ের শিলাদেবী নামক দুর্গামূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া যান। সেই দেবী এখনও অম্বরে সল্লাদেবী নামে বাঙ্গালী পুরোহিত কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন। *

মানসিংহ যখন গোবিন্দদেবের মন্দির গঠনে উদ্যোগী হন, তাহার পূর্ব্ব হইতে বাদশাহ আকবর জয়পুরী লাল পাথর দিয়া আগ্রার দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এই লাল পাথর তখন অন্য কাহারও পাইবার অধিকার ছিল না; মানসিংহের অনুরোধে বাদশাহ একমাত্র তাঁহাকে গোবিন্দ-মন্দিরের জন্য বিনামূল্যে এই পাথর লইতে দিয়াছিলেন। তখনকার সেই সুলভ মজুরীর দিনে গোবিন্দ-মন্দিরের ব্যয় তের লক্ষ টাকা পড়িয়াছিল বলিয়া "ভক্ত-কল্পদ্রুম" প্রভৃতি হিন্দী গ্রন্থে উল্লেখ...

---

* সতীশচন্দ্র (?) নাথ রায়ের "প্রতাপাদিত্য," ৪৯৪-৫১২ পৃঃ, যশোহর-খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড, ৩৫৮-৩৬১ পৃঃ।
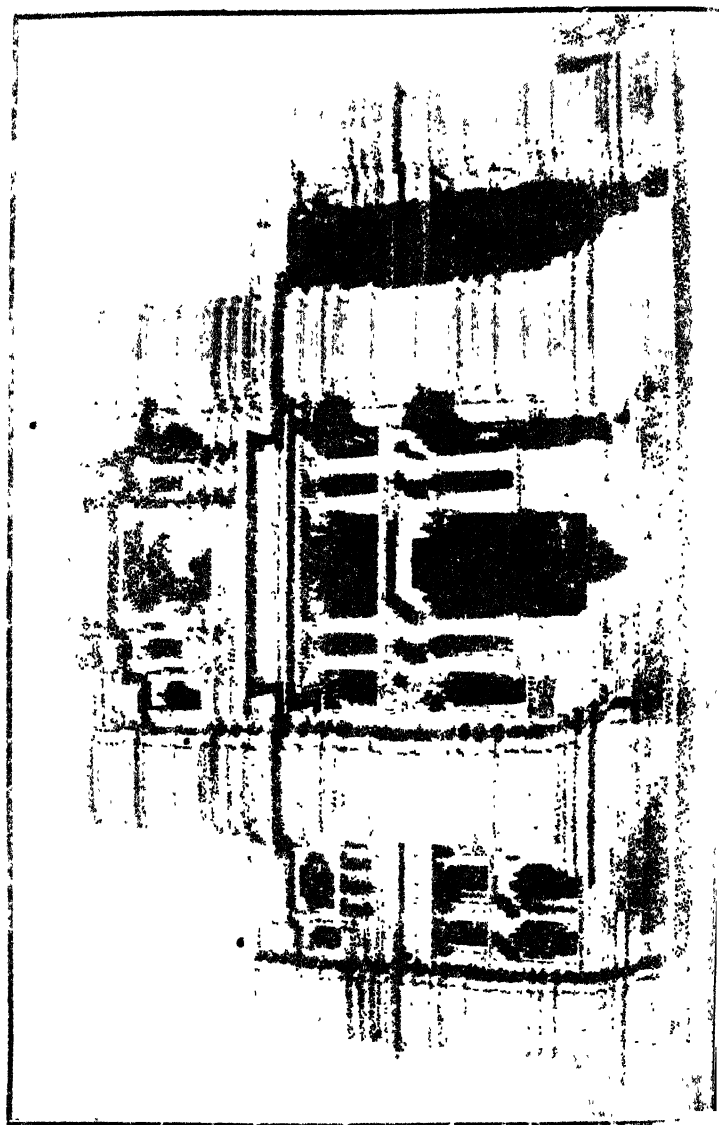
য়াছে। রক্ত পাষাণে নির্ম্মিত এই বিরাট মন্দির মোগল আমলের রতীয় হিন্দুস্থাপত্যের একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য সমালোচকগণই লিয়া গিয়াছেন, এমন মনোহর মন্দির উত্তর ভারতে আর নাই। *

মন্দিরটির বাহ্যাকার একটি গ্রীক ক্রুশের (Cross) মত, গাঁথুনি দুস্থাপত্যানুযায়ী এবং শীর্ষ দেশীয় গুম্বজগুলি মোগল আমলের শিল্প দর্শন। গ্রীক, হিন্দু ও মুসলমানদিগের ত্রিবিধ স্থাপত্যের যে অপূর্ব্ব মন্বয় এই মন্দিরে দৃষ্ট হয়, তাহাতে কলাবিদ্‌গণ অনুমান করেন, াকবরের রাজ-দরবারে যে সকল জেসুইট পাদরী ছিলেন, তাহারাই মে বিলাতী গীর্জ্জার অনুকরণে এই মন্দিরের ভিত্তিবিন্যাসের নক্‌সা রয়াছেন, হিন্দুস্থপতিগণ তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চরাচরিত প্রথায় ন্দির গঠন করেন এবং তুর্কীস্থানের রাজমিস্ত্রীগণের অনুকরণে উহার পরি ভাগের গুম্বজ রচিত হয়। কিন্তু কোন খৃষ্টান কর্ত্তৃক এই রর নক্‌সা প্রস্তুত হইবার অনুমান ঠিক নহে; কারণ ইহারও র্ব্ববর্ত্তী কালে হিন্দুস্থানে হিন্দু-স্থপতিগণ এই ভাবের আরও মন্দির নির্ম্মাণ রিয়া ছিলেন, খাজুরাও প্রভৃতি কোন কোন স্থানে তাহার নিদর্শন খনও আছে। হিন্দুকারুকরগণ পূর্ব্বকালে নানাদেশে গিয়া শিল্প-কলার কবিতেন, সৌধ গড়িয়া অর্থ আনিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেন, ারা বিদেশীয় কলাবিদ্যার অবিকল নকল না করিয়া পরদেশীয় শিক্ষণীয় রবিশেষকে পরিপাক করিয়া স্বদেশীয় শিল্পের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে নিতেন। গলাধঃকরণ করিয়া উদ্গীরণ করা দোষাবহ হইতে পারে, কিন্তু পণ্যকে পরিপাক করিয়া আত্মগত করিয়া লওয়া স্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

"(The temple of Govinda deva) is not only the finest of particular series, but is the most impressive religious edifice it Hindu art has ever produced, at least in upper India." owse's Mathura p. 123.

শিক্ষার্থীকে পরদেশীর নিকট ঋণী হওয়া দোষের নহে, কিন্তু শিক্ষার পরদেশী পরবেশী হইয়া যাওয়া নিন্দনীয়। ৺গোবিন্দদেবের মন্দিরে স্থাপত্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছিল।

এই মন্দির গোমাটিলা নামক স্তূপের উপর অধিষ্ঠিত। সে পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি হইতে ১০।১২ হাত উচ্চ। এই মন্দিরে কড়ি ব কারবার নাই। ইহা খিলানের উপর গঠিত এবং গুম্বজের দ্বারা মন্দিরটি পূর্ব্বমুখী এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। পশ্চিম প্রান্তে মূল ছিল, তাহার চিহ্নও অনেকটা বিলুপ্ত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বদিকে পার্শ্বে বৃন্দাদেবীর মন্দির এবং দক্ষিণ পার্শ্বে যোগপীঠ ছিল। এই উ সম্মুখে বা পৃষ্ঠভাগে অন্তরাল বা জগমোহন দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রত্যেক ১০০ ফুট করিয়া। জগমোহনের পূর্ব্বদিকে সভা-মণ্ডপ বা নাট-ম নাট-মন্দিরের সম্মুখে তোরণ বা প্রবেশ পথ। এই বিরাট মন্দি দক্ষিণ দিকে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে রূপ গোস্বামীর নিজের জন্য নি লাল পাথরের আবাস-গৃহ ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ গোবিন্দজীর নাট-মন্দিরের বাহিরের বারন্দার দেওয়াল নানাবিধ খচিত ছিল। একদিন এই বারান্দা হইতে বৃন্দাবনের শ্যাম শোভা সুন্দর দেখা যাইত। উহার সম্মুখে ছিল নহবৎ খানা, তাহাতে সন্ধ্যায় সুসঙ্গত বাজনা বাজিত। সমস্ত মন্দিরসৌধগুলি চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। যোগপীঠের মন্দিরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার মধ্যে সিঁড়ি দিয়া নামিলে পাষাণ গাত্রে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনীর দেবীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা ইনি নন্দসুতা যোগমায়া দেবী বলিয়া পরিচিত। বৃন্দার মন্দিরের প্রাচীরে হিন্দী অক্ষরে নিম্নলিখিত লিপি খোদিত আছে :—

"সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্দ আকবর শাহ রাজশ্রী কর্ম্মকুল শ্রীপৃথ্বীরা

বংশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহদেব বৃন্দাবন যোগপীঠস্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দ দেবকো, কাম উপরি কল্যাণ দাস, আজ্ঞাকারী মাণিক চংদ চোপাড়, শিল্পকারি গোবিন্দ দাস দিল্লী কারিগর। দঃ গণেশ দাস বিমবল॥" *

অর্থাৎ আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে (বা ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরাজাধিরাজ বংশীয় ভগবন্ত দাসের পুত্র মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে যোগপীঠে শ্রীগোবিন্দদেবের এই মন্দির বিনির্ম্মিত হয়। ই নির্ম্মাণকার্য্যে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন কল্যাণদাস, মাণিকদাস চোপাও াহার সহকারী ছিলেন, দিল্লী নগরীর কারিগর গোবিন্দদাস ছিলেন ধান শিল্পী। (সম্ভবতঃ) গণেশদাস বিমবল † নামক প্রধান রাজ-র্ম্মচারী এই বিরাট ব্যাপারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে (জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বর্ষ) মানসিংহ দেহত্যাগ রেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও শতাধিক বর্ষ ধরিয়া এই বিরাট মন্দিরে াড়ম্বরে নিত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। মন্দিরের প্রধান চূড়া এত উচ্চ ল যে, তথাকার আলোকমঞ্চ আগ্রা হইতে দেখা যাইত। একদা ান আওরঙ্গজেব শুনিতে পাইলেন যে সেই আলোকরাশি হিন্দুমন্দিরের তুঙ্গ চূড়া হইতে বিচ্ছুরিত, তখন উহা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইল। তিনি কজন ফৌজদার পাঠাইয়া গোবিন্দদেবের মূল মন্দিরটি এবং তাহার লগ্ন বিপুল সৌধের উপর পাঁচটি চূড়া একেবারে ভাঙ্গিয়া দিলেন। ম্ভবতঃ ছাদের উপর দিয়া একটি প্রাচীর গাঁথিয়া মন্দিরশিখরের দৃশ্যরোধ রাও এই সময়ে হইয়াছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব যে উত্তর ভারতের নাস্থানে এইরূপ কত শত প্রধান প্রধান মন্দির ধ্বংস করিয়া হিন্দুর

* Growse's "Mathura" p. 145, বৃন্দাবন-কথা, ৩৮পৃঃ

† গ্রাউস্ সাহেব গণেশদাস স্থলে গোরক্ষদাস পড়িয়াছিলেন।

প্রাণে শূলাঘাত করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একমাত্র মথু
সহরেই ৬৩টি মন্দির তাঁহার আদেশে বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, ফৌজ
মন্দির ভাঙ্গিবার জন্য ব্রজমণ্ডলে পৌঁছিব'র পূর্ব্বেই ৺গোবিন্দদেব প্রভৃ
প্রধান প্রধান বিগ্রহগুলি ত্বরিতগতিতে জয়পুর রাজধানীতে স্থানান্তরি
হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরও জয়পুর প্রভৃতি স্থান হইতে মূ
বিগ্রহগুলি আর বৃন্দাবনে প্রত্যর্পিত হন নাই।' তখন বৃন্দাবনবা
ভক্তবৃন্দ দিল্লীপতি মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯-৪৮) কোন সম
প্রতিভূমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া পুরাতন মন্দিরগুলির মধ্যে স্থাপনা করেন
আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে কলঙ্কিত হয় বলিয়া আর মানসিংহে
সেই পুরাতন মন্দিরে গোবিন্দমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন নাই, নিকটবর্ত্তী গৃ
পূজিত হইতেন। অবশেষে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে (১১২৫ সালে) ৺নন্দকুমা
বসু নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত মানসিংহের মন্দিরের উত্তর-পশ্চি
দিকে ঐ বিগ্রহের জন্য একটি নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। ই
বাঙ্গালী, চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামের জমিদার এ
ইংরাজ আমলে হিজলীর নিমকমহলের দেওয়ান ছিলেন। নন্দকুম
শুধু ৺গোবিন্দদেবের জন্য নহে, অন্যান্য বিগ্রহের নিমিত্তও সাধা
ধরণের কয়েকটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সে মন্দিরগুলি এক্ষ
নানাজাতীয় ভক্তকর্ত্তৃক নানাভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছে, গোবিন্দজী
মন্দিরের বারান্দা ও প্রাঙ্গণ এক্ষণে শ্বেত প্রস্তরে বিমণ্ডিত এবং গোবি
দেবের ত্রিভঙ্গিম শ্রীমূর্ত্তি বহুবিধ নূতন আভরণে বিভূষিত।

মানসিংহের প্রসিদ্ধ মন্দির ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ভগ্নদশায় পড়ে। উপ
মূল মন্দির এক্ষণে নাই, ছয়টি চূড়া বিলুপ্ত হইয়াছিল, নাটমন্দিরের
নাই। বহুদিন সংস্কারাভাবে অসংখ্য বৃক্ষবল্লরীর মূলবিদ্ধ হইয়া
সুদৃঢ় মন্দিরটিরও অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনা হইয়াছিল। এমন সম

ন বৈদেশিক মহানুভব ব্যক্তির চেষ্টায় জয়পুরাধিপ এবং গবর্ণমেণ্টের ত্য বিভাগীয় বিপুল সাহায্যে কীর্ত্তিমন্দিরটি সংরক্ষিত হইয়াছে। *

স্কন্দপুরাণে মহামুনি নারদের উক্তি আছে :—

"অস্মিন্ বৃন্দারণ্যে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনং
তৎসেবক-সমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময় ॥"

যেখানে গোবিন্দ, সেখানেই নারদ বা একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের বিশ্রামভূমি। ন ভক্তাশ্রয়, সেখানেই বৃন্দাবন। একদা মহাযোগী শ্রীরূপগোস্বামী মি বৃন্দাবনের যোগপীঠে স্বীয় ইষ্টদেবের সেই বিজয়মূর্ত্তির আবিষ্কার ব স্থাপন করিয়া যুগে যুগে কোটি কোটি ভক্তের পূজার স্থান নির্দ্দেশ া গিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্রিত বা নিরাশ্রয় ভক্তগণের াধনোদ্দেশে শাস্ত্রোদ্ধার করিয়া চিরজীবী হইয়া রহিয়াছেন। । সেই গোবিন্দজীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের ঐতিহাসিক আলোচনা শেষ । আমরা সেই মহাকবি ও মহামনীষীর অকুণ্ঠিত শাস্ত্রচর্চ্চার সংক্ষিপ্ত । দিব।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি গ্রাউস্ সাহেব যখন মথুরার কালেক্টর ছিলেন, তখন গোবিন্দমন্দিরের সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ভগ্নাবশেষের স্তূপীকৃত রাশি দূরীকৃত করিয়া, শিল্পমতানুক্রমে উহার ভিতর বাহিরের সংস্কার করিয়া, উপর দিয়া মুসলমানগণ যে দেওয়াল তুলিয়া মন্দিরশিখর হতশ্রী করিয়াছিলেন, ঙ্গিয়া ফেলিয়া, লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে এই মন্দির স্থাপত্য (Archaeological) কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছে। জয়পুরের মহারাজ গ্রাউস্ সাহেবের রে এই সংস্কারের সাহায্যকল্পে ৫০০০ পাঁচ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন।

(৫)

শাস্ত্রোদ্ধার

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী আজন্ম কবি এবং অল্পবয়সেই পরম পা
তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন মুক্তাপংক্তির মত সুন্দর, তাঁহার ভাষাও
মার্জ্জিত, অলঙ্কৃত এবং নিরুপম কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার রচনাব
গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়; নব নব ভাব ও সুন্দর শব্দ-সম
তাঁহার শ্লোকগুলি বিষয়ানুরূপ গাম্ভীর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া কাব্যরস
ভরপূর থাকে। সেই গুরু গম্ভীর শব্দ-সম্ভারে ভারাক্রান্ত
পড়িবামাত্র রূপ গোস্বামীর লেখনী-প্রসূত বলিয়া ধরিতে পারা যায়
অর্থের উপলব্ধি হইবামাত্র উহাদের কবিত্ব-কৌশলে মুগ্ধ হইতে
এমন ভাবুক, এমন লেখক কেন যে যৌবনাবধি মুসলমান-শাসকের
সচিব হইয়া তৃপ্ত ছিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। পারিপার্শ্বিক
দোষে প্রমত্ত কবিকেও প্রচণ্ড বৈষয়িক করিতে পারে, ইহা
দৃষ্টান্ত। সংসারকে যে ভাল করিয়া ধরিতে জানে, কর্ম্মফলের পা
হইলে সেই আবার সংসারকে ভাল করিয়া ছাড়িতে পারে।
কাটিয়া গেলে সকল ধাতুরই ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, বিষয়-মর
হাতে নিস্তার পাইয়া রূপ যে নবজীবন পাইয়াছিলেন, তাহার
সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারী থাকিবার
তিনি কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চ্চায় বিরত হন নাই,
কবি-প্রতিভা কখনও সম্পূর্ণ লুকায়িত থাকে নাই। সংসার
বৃন্দাবনে আসিবার পর, যখন তিনি রাশি রাশি শাস্ত্র-গ্রন্থ সংগ্রহ
তাহা লইয়া তদ্গতচিত্ত থাকিতেন, তখন তাঁহার চিন্তার ধারা
উছলিয়া পড়িত, ভাষা আসিয়া দাসীর মত উহা বহন করিয়া লোক

গ্রন্থিত করিয়া রাখিত। কত কাব্য নাটক, কত স্তোত্র বা খণ্ড তা, কত সারার্থ-ব্যাখ্যা বা শাস্ত্র-সংগ্রহ যে তাঁহার লেখনীমুখে শিত হইত, তাহা বলিবার নহে।

রূপগোস্বামী বহু প্রকারের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীজীবগোস্বামী ক "লঘুতোষণী"-গ্রন্থে নিজ বংশের পরিচয় কালে ঐ সকল গ্রন্থের ভাবে পরিচয় দিয়াছেন :—

"তয়োরনুজস্‌হৃষ্টেষু কাব্যং হংসদূতকং।
শ্রীমদুদ্ধব সন্দেশ শ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা॥
স্তবস্তোৎকলিকাবলী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাস্থাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥
বিদগ্ধ-ললিতাগ্রাখ্যামাধবং নাটকদ্বয়ং।
ভাণিকা দানকেল্যাহ্বা রসামৃত যুগং পুনঃ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটক-চন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ॥"

তিনি হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ ও অষ্টাদশ লীলাছন্দঃ নামক ৩ খানি ব্য, স্তবমালা, উৎকলিকাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী ও প্রেমেন্দুসাগর খানি স্তোত্র-গ্রন্থ, বিদগ্ধ-মাধব ও ললিত-মাধব নামক ২ খানি টক, দানকেলিকৌমুদী নামক ১ খানি ভাণিকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি নামক ২ খানি রসগ্রন্থ এবং মথুরা-, নাটক-চন্দ্রিকা, পদ্যাবলী, ও লঘু ভাগবতামৃত এই ৪ খানি গ্রহ-পুস্তক—মোট ১৬ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।* ইহা ব্যতীত

---

* ভক্তি রত্নাকরে (১ম, ৫৬-৫৭ পৃঃ) শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর গ্রন্থ আরও বিবৃত করিয়া রূপ গোস্বামীর রচনা সমূহের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এতদতিরিক্ত বৃহৎ ও লঘুগণোদ্দেশদীপিকা নামক দুইখণ্ড পুস্তকের উল্লেখ

তাঁহার আরও অনেক প্রবন্ধ, প্রকীর্ণক শ্লোক ও টীকা প্রভৃতি উহার কতক তাঁহার স্তবমালা ও পদ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জীব। সংগৃহীত করিয়া যান এবং কতক বিশেষভাবে উল্লিখিত বা সমা হওয়ার অবসর পায় নাই। আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে শ্রীপা গোস্বামীর এই দুরূহ গ্রন্থগুলির অন্ততঃ আখ্যান বিষয়ের আভাস দি

হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কৃষ্ণলীলা এই দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্য রূপ কর্ত্তৃক গৌড়ে থাকিতেই রচিত হয়। তিনি মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেন নাই। সেই জন্য এই দু মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণাম-সূচক কোন মঙ্গলাচরণ নাই। বিদ ও ললিত-মাধব নাটকেরও বিশেষ উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। গ্রন্থ শ্রীরূপের বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে একখানি নাটক রচনার আরব্ধ হয়, পরে উহা মহাপ্রভুর আদেশে দ্বিধা বিভক্ত হয়। উভয়ের অধিকাংশ রূপ নীলাচলে বসিয়া রচনা করেন এবং পরে বৃন্দাবনে অগ্রে বিদগ্ধ-মাধব ও তাহার ৫ বৎসর পরে ললিত-মাধব সমাপ্ত ক

আছে। ঐ গ্রন্থে কিরূপে কৃষ্ণ লীলার পাত্রগণ গৌরাঙ্গ-লীলার ভক্তরূপে হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের বিবরণীতে অষ্টাদশের কথা নাই, তৎস্থলে কৃষ্ণ-জন্মাতিথিবিধির উল্লেখ আছে। গ্রন্থ সংখ্যা যোল আছে। চরিতামৃতে অতি সংক্ষিপ্ত ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে রূপসনাতনের গ্রন্থ আছে, প্রধান প্রধান গ্রন্থ ছাড়া উক্ত তালিকায় অতিরিক্ত কোন নূতন গ্রন্থের কথা ব্রজলীলাবর্ণনা রূপের সকল গ্রন্থের সাধারণ উদ্দেশ্য। কবিরাজ গোস্বামী বলি রূপ "লক্ষগ্রন্থে কৈল ব্রজ বিলাস বর্ণন।" এস্থলে বহু অর্থেই লক্ষ শব্দ প্রযুক্ত সকল গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

* নাটক দ্বয়ের শেষ ভাগে সমাপ্তির তারিখ আছে।

"নন্দ সিন্ধুর বাণেন্দু সংখ্যে সম্বৎসরে গতে।
বিদগ্ধ-মাধব নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥"

আছে, ব্রহ্মকুণ্ড-তীরবর্ত্তী গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশে বিদগ্ধ-
চত হয় এবং কেশিতীর্থের উপকণ্ঠে নানাদেশ হইতে সমাগত
লীর আগ্রহে তাঁহাদের সমক্ষে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়।
ক বৃন্দাবনের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ভক্তই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকা
রিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই নাটকের বিবৃতি
প্রণয়ন করেন এবং ভক্তচূড়ামণি যদুনন্দন দাস ঠাকুর গ্রন্থের
রেন। যদুনন্দন কৃত সেই পদাবলীর নাম—"রাধাকৃষ্ণলীলা-
" বিদগ্ধ-মাধব ৭টি অঙ্কে সম্পূর্ণ, উহাতে রাধাকৃষ্ণ সম্মিলনই
না এবং তাহা বেণুবাদন, বেণুহরণ ও নানাতীর্থ বিহার প্রসঙ্গে
ত হইয়াছে। ললিত-মাধব বৃহত্তম গ্রন্থ, উহা ১০টি অঙ্কে সম্পূর্ণ;
রাধিকা প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে চন্দ্রাবলী ও ললিতা
সহিত সম্মিলন অন্যান্য ঘটনা ও উৎসবের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।
ললিত নায়কের দুইটি প্রকার ভেদ। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে
পরিচয় আছে। চতুঃষষ্টি কলা ও বিলাসে যে নায়কের চিত্ত
তাহাকে বিদগ্ধ নহে; আর যিনি বিদগ্ধ, নবযুবা এবং, কেলি

মুর (হস্তা)=৮, বাণ=৫, ইন্দু=১, অঙ্কের বামাগতিতে ১৫৮৯ সম্বৎ হয়।
১৪৫৪ শক (১৫৩২ খৃঃ) পাওয়া যায়। অর্থাৎ মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার
বৃন্দাবনে বিদগ্ধ-মাধব সমাপ্ত হয়। ললিত-মাধবের শেষে এই শ্লোক

"নন্দেষু বেদে-দুমিতে শকাব্দে শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাং।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধং॥"

নন্দ=৯, ইষু=৫, বেদ=৪, ইন্দু=১, বামাগতিতে ১৪৫৯ শক (১৫৩৭ খৃঃ)
সের জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে ভদ্রবনে ললিত-মাধব সমাপ্ত
৪০ বৎসর পূর্ব্বে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে ৺রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন এই
বাঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন।

বিষয়ে সুনিপুণ ও নিশ্চিন্ত, তাহাকেই ললিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়
দুইখানি নাটকে ব্রজলালার নায়ক মাধব বা শ্রীকৃষ্ণের এই
প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই দুই নাটকের পর শ্রীরূপ গোস্বামী "দান-কেলিকৌমুদী
দিয়া আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করেন। ইহা একটি মাত্র
সম্পূর্ণ এবং প্রহসন-মূলক, এজন্য ইহাকে ভাণিকা বলে। রূপ
নন্দীশ্বর নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন, তখনই তিনি রঘুনা
গোস্বামীর চিত্ত বিনোদনের জন্য এই ভাণিকা লিখেন। একদিন
ললিতা বিশাখা প্রভৃতি পঞ্চসখীকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যেকে এক
কলসী যজ্ঞ-ঘৃত মস্তকে করিয়া, গোবর্দ্ধন তটস্থ পথ দিয়া এক যজ্ঞ
যাইতেছিলেন। সহসা শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সঙ্গিগণ সহ দানঘাটে
আদায়ের আড্ডা) উঁহাদের পথ রোধ করেন। এই সময়ে
তাহার সখীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সহায় সুবল ও মধুমঙ্গল
মধ্যে পরস্পর অনেক রঙ্গকৌতুক ও বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। সেই
প্রেমিকা রাধার যুগপৎ হর্ষ, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও
এই সাতটি (অর্থাৎ কিল কিঞ্চিত *) ভাবের উদয় হয়। এখানে
দানী সাজিয়া রাধিকার নিকট পণ্য ঘৃতের শুল্ক গ্রহণের ছল করিতেছি
তাঁহার ও তদীয় সহচরবৃন্দের বাক্য ও কার্য্য-কৌশলে রাধিকার
কিঞ্চিত ভাবের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ সেই ভাবের দৃষ্টান্ত দিবার
এই ক্ষুদ্র নাটকের পরিকল্পনা হয়।

---

* রসগ্রন্থে "কিলকিঞ্চিত" ভাবের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া আছে :—

গর্ব্বাভিলাষরুদিত স্মিতাসূয়া-ভয়-ক্রুধাং।
সঙ্করীকরণাং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং॥

উজ্জ্বল-নীলমণি, উদ্দীপন।

শ্রীপাদ রূপ ধ্যান-ধারণার সময়ে যখন তখন প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে যে সকল স্তবস্তুতি রচনা করিতেন, উহা তাঁহার কাগজ পত্রে সেখানে লেখা থাকিত। তাঁহার দেহান্তর প্রাপ্তির পর তদীয় জীব গোস্বামী ঐ সকল একত্র করিয়া স্তবমালা নামে অভিহিত ইহার মধ্যে শ্রীবিগ্রহের অষ্টকালীন সেবার স্তোত্র, গঙ্গাষ্টক ক, চৈতন্যাষ্টক প্রভৃতি স্তোত্র, চাটুপুষ্পাঞ্জলি নামে শ্রীরাধার ভৃতি বহু সংখ্যক স্তোত্র আছে। উৎকলিকাবলী, গোবিন্দ বলী, প্রেমেন্দুসার প্রভৃতি গ্রন্থও এই স্তবমালার পর্য্যায়ে ফেলা গোবিন্দবিরুদাবলীতে শ্রীগোবিন্দের নাম মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অনুকরণে জীব গোস্বামী গোপালবিরুদাবলী রচনা করেন।

রূপকৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে হরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধু এবং উজ্জ্বল ণি সর্ব্বপ্রধান। এই দুইখানি রস-গ্রন্থ নামে খ্যাত। সনাতন উভয় ভ্রাতা একত্র যোগে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু রচনা করেন। তন্মধ্যে সনাতন বিচারকর্ত্তা এবং রূপ তাহার সঙ্গে পরামর্শ ও স্থির করিয়া গ্রন্থখানি ক্রমে ক্রমে বহু বৎসর বসিয়া লিপিবদ্ধ * এজন্য তিনিই গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত। ইহাতে রূপ শাখা ক্রমে মুখ্য ভক্তি-রসকে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ নিরূপণ প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব য়ের মত সংস্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পূর্ব্ব দক্ষিণাদি ক্রমে গে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে কতকগুলি লহরী আছে। সামান্য,

* রামাঙ্গ শক্র-গণিতে শকে গোকুলাধিষ্ঠিতেনায়ং।
শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ বিটঙ্কিত ক্ষুদ্র রূপেণ॥
, অঙ্গ = ৬, শক্র = ১৪ অর্থাৎ ১৪৬৩ শকে (১৫৪১ খৃঃ) রসামৃত-সিন্ধু খনিত বা

সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে ভক্তি চারি প্রকার; তন্মধ্যে সাধন দুই শাখা—বৈধী ও রাগানুগা। বৈধী ভক্তির অভ্যাসে ও চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ জড়ভাব ত্যাগ করিয়া ভক্তিলাভের জন্য চি প্রস্তুত করে। এই ভক্তি লাভই পরমার্থ লাভের নামান্তর।

ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শান্ত দাস্যাদি মুখ্যরসের বর্ণনাকালে গূঢ় বলিয়া মধুর রসের কথা অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মধুর রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য "উজ্জ্বল নীলমণি" নামক সুবিস্তীর্ণ রচিত হয়। মধুর বা শৃঙ্গার রসকেই উজ্জ্বল রস বলে। ভ সমুদ্র হইতে উজ্জ্বল নীলমণিতুল্য এই মধুর বা উজ্জ্বল রস উত্থিত ইহা হইতেই গ্রন্থের নামকরণ হয়। গ্রন্থশেষে শ্রীরূপ লিখিয়া গিয়া "গহন মহাঘোষ সাগর" অর্থাৎ গোকুল সাগর বা নিগূঢ় গোকুল হইতে এই প্রেম রসের উৎপত্তি হইয়াছিল; উহার স্বরূপ উপলব্ধি বড় কঠিন, তটস্থ হইলে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যায়।

উজ্জ্বল নীলমণিতে প্রথমেই বহুপ্রকার নায়িকার প্রকৃতি, অবস্থা, বিভাব ও অনুভাব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ব্রজলীলার নায়ক; তাঁহার নায়িকা বা কৃষ্ণবল্লভাগণ স্বকীয়া ও পর ভেদে দুই প্রকার। যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধী অপেক্ষা না করিয়া আসক্তি বশতঃ পর পুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং যাহাদিগকে বিবাহ বিধি অনুসারে স্বীকার করা হয় না, তাহ পরকীয়া। পরকীয়া দুই প্রকার—কন্যা ও পরোঢ়া।

* শ্রীজীব গোস্বামী এই গ্রন্থের "লোচন-রোচনী" নামক বিবৃতি এব পদানুসরণ করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উহার "আনন্দচন্দ্রিকা" নাম্নী টীকা প্রণয়ন রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন টীকা ও স্বকৃত বঙ্গানুবাদ সহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ করিয়াছিলেন।

ণীগণ অভিসারকালে যোগমায়া দ্বারা গৃহান্তবর্তিনী থাকিতেন, সুতরাং ওর প্রতি গোপগণের অসূয়া হইত না। এই পরোঢ়া কৃষ্ণ-বল্লভাগণের কোন সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। এই সকল তথ্যের উপর প্রচলিত ীয়া মত প্রতিষ্ঠিত এবং এই গ্রন্থ উক্ত মতের ভিত্তিস্বরূপ। এই প্রেমের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে :—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণং।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ঃ ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না, এমন যুবকযুবতীদ্বয়ের ার ভাববন্ধনের নাম প্রেম। এই প্রেমের প্রধান দুই অবস্থা— ম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ বা বিরহেরও চারিটি অবস্থা আছে— াগ, মান, প্রেম-বৈচিত্র্য ও প্রবাস। প্রেমের উৎকর্ষ হেতু ্যক্তির সন্নিধানে থাকিয়াও তৎসহ বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার অনুভব তাহাই প্রেমবৈচিত্র্য নামে কথিত হয়। বিরহের অবস্থা চতুষ্টয়ের েকেরও প্রকার ভেদ আছে। এই সকল অবস্থা লইয়াই আধুনিক লাকীর্ত্তন বিভিন্নভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সূক্ষ্মভাবে সেই সকল াই বিশেষ আলোচনা এই পুস্তকে আছে। প্রকৃতপক্ষে মধুররসের ত বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা কোন গ্রন্থে হইতে পারে, বোধ হয় উজ্জ্বল নীলমণি রচনার পূর্ব্বে বা পরে কেহ অনুমান ত পারেন নাই।

রূপ-কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে "মথুরা-মহিমা"য় মথুরাতীর্থের সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রোদ্ধার করা হইয়াছে, "নাটক-চন্দ্রিকা"য় মতানুসারে নাটক রচনা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে, াতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা প্রসঙ্গে কবির ভাবোচ্ছ্বাস শ্লোকাকারে হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রসংগ্রহ-গ্রন্থ মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীর

লঘুভাগবতামৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা তদীয় অগ্রজ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বাম বৃহদ্ভাগবতামৃতের সংক্ষিপ্ত সার। অসংখ্য দার্শনিক নিবন্ধ-প্রণেতা টীকাকার পরমভাগবত শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থের টী করেন। * রূপ গোস্বামী মন্দরশৈলের মত শাস্ত্রক্ষীরাব্ধি হইতে ভ দিগকে অমর করিবার জন্য এই অমৃত আহরণ করেন। তিনি বলে ভাগবতামৃত দ্বিবিধ—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত। এই জন্য গ্রন্থখানি এই দু খণ্ডে বিভক্ত। সর্ব্বপ্রথমে রূপ বহু শাস্ত্র বিচার ও সমুদ্ধার করি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, পরে শ্রীভগবানের অবতার আলোচনা করিতে গিয়া ২৫টি কল্পাবতার, ১২টি মন্বন্তরাবতার এবং ৪টি যুগাবতা এই মোট ৪১টি অবতারের বিচার করিয়া কৃষ্ণাবতারের শ্রেষ্ঠত্ব, কৃষ্ণলীলা নিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নানাবিধ শাস্ত্রের বাক্য দ্বারা রূপগোস্বামী দেখাইয়াছেন যে, মথুরা-মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ এখনও নিত্যলীলা করিতেছে ভাগ্যবানেরা তাহা দেখিতে পান।

লঘুভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডে শ্রীপাদ রূপ শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা দেখাই ছেন, সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু আরাধনা শ্রেষ্ঠ, এবং তদপেক্ষা তাঁহা ভক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মার্কণ্ডেয়াদি ভক্তগণের ম প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষাও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের অপেক্ষাও যাদব শ্রেষ্ঠ, সেই যাদবগণের মধ্যে আবার উদ্ধবের মত কেহ নহেন। উ অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ (বা গোপীগণ) শ্রেষ্ঠ এবং তাহার মধ্যে শ্রীরাধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার গোকুলে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার শ্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডে ৫৪০ এবং উত্তরখণ্ডে ৪ শ্লোকে এমনভাবে অসংখ্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতঃ উহাদিগকে সুগ্রথি

---

* ৺ মদনগোপাল গোস্বামী অতি সুললিত ভাষায় এই লঘুভাগবতামৃতের প অনুবাদ করিয়াছিলেন।

সন্নিবেশ করিয়া নিজ সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন, যে তাহাতে এই গ্রন্থ শুধু শ্রীমদ্ভাগবতের নহে, সমগ্র পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষা গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্রের দ্বারস্বরূপ। নিখিল-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও সঙ্কলন করিয়া ভক্তজন-মণ্ডলীর গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। *

(৬)

রূপান্তর

১৪৭৬ শকের (১৫৫৪ খৃঃ) পর শ্রীরূপকর্তৃক আর কোনও গ্রন্থ-[র]চনার পরিচয় নাই। ঐ বৎসরই প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে সনাতন দেহত্যাগ [ক]রেন। রূপ তাঁহার অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের কনিষ্ঠ। তাঁহার বয়সও [প্রা]য় অশীতি বর্ষ পার হইয়াছে। সনাতন অপেক্ষা রূপ কিছু স্থূলকায় [ছিলে]ন, সুতরাং তাঁহার শরীর যেন আরও অধিক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। [ত]দুপরি অভিন্নাত্মা সনাতন গোস্বামীর পরলোকগমনে তিনি একেবারে [শো]কাপহত হইয়াছিলেন। জগতে কাহারও অভাবে সেই সর্ব্বত্যাগী [স]ন্যাসীর এ দশা হইত না। ইহলোকে যেমন উভয় ভ্রাতা সকল ঐশ্বর্য্য [ত্য]াগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নভাবে বৃন্দারণ্যে একাত্মভাবে প্রকট ছিলেন, সনাতনের

---

* যে কয়খানি প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, তাহা ব্যতীত গোস্বামীর আরও কত ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তকাদি স্থানান্তরে নীত হইয়া বিপ্লব-বিপর্য্যয়ে [কী]টের মুখে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? "কারিকা" নামে তৎকৃত একখানি [বাঙ্]গালা গদ্য পুস্তকেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহার ভাষা অতি প্রাচীন।

অন্তর্ধানে পুনরায় পরলোকে উভয়ে সেইভাবে মিলিত হইবার জন্য প্রতিক্ষণে তাঁহার কাতর প্রার্থনা শ্রীভগবানের চরণে নিবেদিত হইতেছিল।

সেই বৃদ্ধ বয়সেও রূপ সাধন ভজনের সুবিধার জন্য বৃন্দাবনের নানাস্থানে বাস করিতেন। তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্তির বিবরণ হইতেই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তিনি কখনও ভদ্রবনে, কখনও নন্দীশ্বর সান্নিধ্যে, আবার কখনও বা সনাতনের জীবদ্দশায় গোবর্দ্ধন-গিরিমূলে উঁহার শেষ সাধন-কুটীরে অবস্থান করিতেন; কখনও বা রাধাকুণ্ডতীরে আসিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সঙ্গে ভজনানন্দে দিনক্ষয় করিতেন। তাঁহার চক্ষুঃজ্যোতি ক্ষীণ হইয়াছে, সর্ব্বদা ধ্যানস্তিমিত মুদ্রিতনেত্রে ইষ্টদর্শনের জন্য জ্ঞানহারা হইয়া থাকিতেন। তাঁহার শরীর অবশ, হস্তে লেখনী আর চলে না। গ্রন্থলেখা বন্ধ হইয়াছে। পুত্রোপম ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব সর্ব্বদা সেই অচল দেবমূর্ত্তির সেবা লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। স্বাভাবিক কবিত্বে ও ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখ হইতে যখন যে স্তবমূলক শ্লোকাদি বিনির্গত হইত, সতর্ক শিষ্য তাহা সযতনে পুঁথির কোণে লিখিয়া রাখিতেন।

কত ভক্ত বৈষ্ণব আসিয়া রূপ গোস্বামীর বচনামৃতের প্রত্যাশা করিতেন, কিন্তু স্বরসে রসিক সাধক অনেক সময়ে আত্মানন্দে বিভোর থাকিতেন যে, তাহাদের পানে চাহিয়া পূর্ব্বচরিত্রানুরূপ বাক্যালাপে তিনি কাহাকেও তৃপ্ত করিতে পারিতেন না। একদা একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া দেখিলেন, রূপ শূন্যদৃষ্টিতেই তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছিলেন, উহাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত করিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া রূপ যখন এই কথা শুনিলেন, তখন সেই বৈষ্ণবটিকে ডাকিয়া করজোড়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া রূপের সহিত তর্ক করিতে চাহিলে, কখনও তর্ক করিতে চাহিতেন না; সানুনয়ে বিনাযুদ্ধে তাঁহার নিক

পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া অব্যাহতি পাইতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লিখিত হইতেছিল, তখন বল্লভ ভট্ট নামক এক প্রচণ্ড প্রখ্যাত পণ্ডিত আসিয়া উহার একটি শ্লোকে ভুল প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন; রূপ কিন্তু কিছুমাত্র কথা কহিলেন না, ভট্টের কথা যেন মানিয়া লইলেন। কিন্তু জীব তখন যুবক, তিনি তাহা সহিতে পারিলেন না। ভট্ট চলিয়া যাইবার সময়ে শ্রীজীব উহার সহিত তর্ক করিয়া পরাজিত করিলেন। সে কথা রূপের কানে উঠিল, তিনি শুনিবামাত্র প্রিয়তম শিষ্যকে কিছুদিনের জন্য বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর জীবন বৃত্তে সে ঘটনা বিবৃত হইবে।

রূপ একদিকে যেমন ডোরকোপীন তিলকধারী দীনাতিদীন বৈষ্ণব, তৃণের মত সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু এবং নিজের মানের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পরের সম্মান বর্দ্ধনের জন্য সতত সযত্ন, তেমনি অপরদিকে তাঁহার দৈন্যের আদর্শ, ধর্ম্মের আদর্শ হইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্খলিত হইবার সম্ভাবনা হইলে তিনি তাহা সহ্য করিতেন না। সেই দীন মূর্ত্তির অন্তরালে তাঁহার ত্যাগের কঠোরতা, ভোগের নিস্পৃহতা এবং ভক্তির একাগ্রতা এমন জীবন্ত জ্বলন্ত ছিল যে, সকল গুণের সমাবেশে তাঁহার আদর্শ চরিত্রকে সর্ব্ব জাতীয় ভক্ত-সমাজে পূজার সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। "সাধন-দীপিকায়" ভক্তের উক্তি আছে:—

"রূপেতি নাম বদ ভো রসনে সদা ত্বং
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণা-স্বরূপং
রূপং মস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং॥ *

ইহার পর ১৪৭৬ শকের আষাঢ়া পূর্ণিমায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী দেহত্যাগ করিলেন। তখন রূপ ছুটিয়া গিয়া সকল গোস্বামী ও ভক্ত

* শ্রীরূপ-গোস্বামী ব্রজলীলার রূপ মঞ্জরী সখী ছিলেন বলিয়া কথিত হইতেন।

বৃন্দের সহিত জ্যেষ্ঠের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, চিতাভস্ম আনিয়া ৺মদন মোহনের মন্দির সন্নিকটে সমাহিত করিলেন, বৃন্দাবনের আবাল বৃদ্ধের ভক্তি-প্রাবল্যে এক বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন, নিজের কর্ম্মশক্তির শেষ পরিচয় দিলেন। অশ্রুসক্ত নেত্রে কর্ত্তব্য সমাহিত করিয়া, তিনি শোকাচ্ছন্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কুটীর-কোণে আশ্রয় লইলেন; স্থানান্তরে যাইতেন না, নিস্তব্ধ হইয়া ইষ্ট-জপেই দিনযামিনী যাপন করিতেন। ইহার কিছু দিন পরে একদিন শ্রীপাদ রূপ শ্রীগোবিন্দের পানে চাহিয়া চাহিয়া ইষ্টধ্যান করিতে করিতে চিরতরে নেত্র নিমীলিত করিলেন।* সনাতনের লোকান্তরের পর তিনি জীবন্মুক্ত যোগীর মত দেহ-পঞ্জর ত্যাগ করিয়া রূপান্তরের অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন তাহা ঘটিল ভক্তেরা সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল, বৃন্দাবন অন্ধকার হইয়া গেল। যতদিন ভক্তির ধর্ম্ম থাকিবে, বৈষ্ণব শাস্ত্র চলিবে, ত্যাগীর মূর্ত্তি পূজিত হইবে, ততদিন কেহ শ্রীরূপের রূপ ও অপরূপ চরিত্র বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

* ১৪৭৬ শকেই সনাতন ও রূপ উভয়ের তিরোভাব হয়, তবে সনাতনের কতদিন পরে রূপ অপ্রকট হন, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। অনুরাগ বল্লীতে দেখি, সনাতনের পরেই রঘুনাথ ভট্টের তিরোধান হয়। প্রেম-বিলাসেও এই ক্রম ঠিক আছে, রঘুনাথের পর রূপ অন্তর্হিত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৪৭৬ শকে বৃন্দাবনে যান, উহার পূর্ব্বেই সনাতনও রূপের লোকান্তর ঘটে। ("কমলা" পত্রিকায় অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধ, আষাঢ়, ১৩৩২, ২০৫ পৃঃ)। "প্রেম-বিলাসে" আছে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের পথে প্রয়াগে আসিয়া শুনিলেন, উহার ৪ মাস পূর্ব্বে সনাতন অপ্রকট হইয়াছেন। (৫ম বিলাস, ৩১ পৃঃ) লোকে বলিল, প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবন ৪ দিনের পথ। শ্রীনিবাস হাটিয়া মথুরায় আসিয়া তিনজন ব্রজবাসীর নিকট শুনিলেন,

"প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট।
তাহা রহি কতক দিন রঘুনাথ ভট্ট॥
শ্রীরূপ গোসাঞি এবে হইলা অপ্রকট।"

শ্রীচৈতন্যদেব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া রূপকে ভক্তি-দীক্ষা দিয়াছিলেন; গ্রজ সনাতনকে তিনি সাক্ষাৎ গুরু ভাবিয়া সর্ব্বদা শিক্ষালাভ করিতেন। হাপ্রভুর বাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। দাবনে তিনি ৮০টি লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করিয়াছিলেন; বৈষ্ণব ভক্তগণ ভাবে যিনি বৃন্দাবনে আসিতেন, সকলকেই তিনি আশ্রয় দিতেন, সকলের য়োশ্রয় প্রাপ্তির সহায় হইতেন; তিনি স্বকীয় অমানুষিক পাণ্ডিত্যের গাবর্ষণে জিজ্ঞাসু মাত্রের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন; শ্রীবিগ্রহ তিষ্ঠা করিয়া এবং ভক্তগণ কর্ত্তৃক ঐরূপ সেবাস্থাপনের সহায় হইয়া, ান প্রকৃত ভক্তি-সেবার পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন; অসংখ্য গ্রন্থরচনা ও কা ব্যাখ্যাদি দ্বারা রাধাকৃষ্ণ লীলার গূঢ়তত্ত্ব ও সারসম্পদ লোক-সমাজে তরিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন; যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের ভিত্তি ছিল না,

---

া হইলে সনাতনের ৪।৫ মাস পরে রূপের তিরোভাব হয়। কিন্তু প্রচলিত পঞ্জিকায় াঢ়ী পূর্ণিমা সনাতনের ও শ্রাবণী শুক্লা-দ্বাদশী তিথি রূপের তিরোভাব তিথি। ঐ তিথিতে বৃন্দাবনে রীতিমত বাৎসরিক উৎসব হয়। এই উৎসব অনুষ্ঠানের মূল তিথি তা হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহা হইলে সনাতনের দেহরক্ষার মাস মধ্যে রূপের অন্তর্ধান হয় এবং প্রেম-বিলাসের বর্ণনার সঙ্গে ইহার ঙ্গস্য থাকে। আবার ভক্তিরত্নাকরে (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৮ পৃঃ) দেখি, শ্রীনিবাস যখন বনে গিয়া পৌঁছিলেন সেদিন "বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি,,। সুতরাং উহার ৪ মাস সনাতনের অপ্রকট ধরিলে ৺মদন মোহন মন্দিরের আষাঢ়ী বা মুড়িয়া পূর্ণিমা র উৎসবের মূল ভিত্তি পাওয়া যায় না। যাঁহারা বৈষ্ণব-শাস্ত্রালোচনায় জীবন উৎসৃষ্ট তেছেন, এ সকল সমস্যার সমাধান তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে। "আনন্দ-র" পত্রিকায় ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদক পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় বিবিধ দ পত্রে বৈষ্ণব-ইতিহাস সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার কতক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহোদয় "কমলা"-পত্রিকায় দিয়াছেন, লির সদুত্তরের জন্য এখনও আমরা উৎকণ্ঠিত।

সকল গোস্বামীরা মিলিয়া শাস্ত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক উহাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নব মতের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। বলিতে ইচ্ছা হয়, শ্রীপাদ রূপ! তুমি কি না করিয়াছ; তোমার রূপ, তোমার লীলা কি কখনও ভক্ত-সমাজ অবলীলা ক্রমে ভুলিতে পারিবে?

"কো সব ত্যজি, ভজি বৃন্দাবন
কো সব গ্রন্থ বিচারত।
মিশ্রিত খীর, নীর বিমু হংসন,
কোন্ পৃথক্ করি পারত॥
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন,
কো জানত ব্রজরীত।
কো জানত, রাধা মাধব রতি,
কো জানত সবনীত॥
যাকো চরণ, প্রসাদ সকল জন,
গাই গাই সুখ পায়ত।
১৺ রতি বিমল শুনত জন মাধো,
হৃদে আনন্দ বাঢ়ায়ত॥"

-:•:-

শ্রীজীব গোস্বামী

"যঃ সাংখ্য-পঙ্কেন কুতর্ক-পাংশুনা
বিবর্ত্ত গর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্।
শুদ্ধং ব্যধাদ্বাক্সুধয়া মহেশ্বরং
কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী।

—:*:—

[১]

বাল্য চরিত্র ও শিক্ষালাভ।

। সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ। উঁহাকে তাঁহারা প্রাণের ভালবাসিতেন। বল্লভ ৺রঘুনাথ-বিগ্রহের উপাসক, সেই ধ্যানধারণায় তাঁহার দিবরাত্রির অনেক সময় যাইত, রামায়ণ-বণ তাঁহার নিত্য ক্রিয়া ছিল। গৌড়-রাজসরকারে তিনি টাঁক-অধ্যক্ষ ছিলেন; সে কার্য্য করিয়া তাঁহার যতটুকু অবসর জুটিত; গতরে রঘুনাথের সেবায় ব্যয়িত করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা থন কৃষ্ণভক্তিরসে নিমগ্ন হন, তখন তাঁহারা একান্ত স্নেহের পাত্র রঘুনাথসেবা ত্যাগ করিয়া তিন ভ্রাতায় একত্র কৃষ্ণসেবা লইয়া গাইতে উপদেশ দেন। সনাতনের সে আদেশ বল্লভের প্রাণে ল, তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার াধ্যে শেলের আঘাত করিতে লাগিল, অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে দিগকে বলিলেন:—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন!
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥" চৈ, চ.

সনাতন ও রূপ রোরুদ্যমান ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই আ দিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বল্লভের সেই অনুপম ভক্তির পরিচয় তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—অনুপম। এই অনুপমের এব শ্রীজীব। ভক্তিমান পিতার ঔরসে ভক্তচূড়ামণির জন্ম হইয় তেমন কুলপ্রদীপ পুত্র এ সংসারে বড় সুদুর্লভ।

রামকেলির বাটিতে শ্রীজীবের জন্ম হয়। ১৪৩৫ শকে যখন শ্রী নীলাচল হইতে শান্তিপুরের পথে রামকেলিতে আসেন, তখন শিশু তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন ৺নরহরি চক্রবর্ত্তী স্বীয় অপূর্ব্ব ভ ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, মহাপ্রভু রামকেলিতে আসিলে,

"শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল॥"

যাহারা স্বচক্ষে ঐ সময় মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন, সেই অতিবৃদ্ধ শুনিয়া নরহরি একথা লিখিয়া গিয়াছেন, উহা অবিশ্বাস করিবা নাই। ঐ সময়ে শ্রীজীব যদি অতি শিশুই থাকেন, তাঁহার বয়স দুই বৎসর ধরিতে পারি। তাহা হইলে ১৪৩৩ শক (১৫ শ্রীজীবের জন্মকাল নির্ণয় করা যায়।

ইহার তিন বৎসর পরে, রূপ সংসার ত্যাগ করেন। ত্যাগ যাইবার পূর্ব্বক্ষণে তিনি ও বল্লভ ধনরত্ন ও পরিজনবর্গ সহ নৌ ফতেয়াবাদের অন্তর্গত প্রেমভাগের বাটীতে যান। রূপ সেখানে বল্লভ পরিবারগণকে লইয়া বাক্‌লায় পিতৃনিবাসে গমন করেন, সঙ্গে ছিলেন; পরে উহাদিগকে তথায় রাখিয়া বল্লভ প্রেমভাগে আসিয়া অভিন্নহৃদয় অগ্রজের সহিত মিলিত হন। নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া, শীঘ্রই উভয় ভ্রাতা অনুসরণে ধাবিত হন। প্রয়াগে তাঁহাদের সহিত বৃন্দাবন হইতে

সাক্ষাৎ ঘটে (১৪৩৬ শক); ইহার পর মহাপ্রভু যখন কাশীর দ্দাবনে আসিতেছিলেন, রূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন গিয়া একমাস মাত্র গৌড়ের দিকে আসেন। সেখানে পৌছিয়া গঙ্গাতীরে বল্লভের প্তি হয়। সে সংবাদ যখন বাকলায় পৌছিল তখন শ্রীজীবের বয়স দর মাত্র। রূপ স্বয়ং বাকলায় যান নাই বটে, কিন্তু প্রাতার শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা তিনি গঙ্গাতীরে ও পরে সংবাদ দিয়া অবশিষ্ট কার্য্য শ্রীজীব কলায় সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীপাদ রূপ নীলাচলে ৮।১০ মাস কাল ছিলেন ও পরে বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান। কিছুদিন তনও নীলাচলে আসিয়া প্রভুসঙ্গ করতঃ বৃন্দাবনে ফিরিয়া গিয়া সহিত মিলিত হন। তখন হইতে তাঁহারা আর বৃন্দাবন ত্যাগ নাই। তৎপূর্ব্বেই পঞ্চমবর্ষের শিশু শ্রীজীব বাকলার বাটীতে বিদ্যারম্ভ করেন।

তা ও জ্যেষ্ঠতাতদিগের মত শ্রীজীবও সুন্দরমূর্ত্তি ছিলেন। দীর্ঘনয়ন, ও অপূর্ব্ব মুখশ্রী সুপুরুষের লক্ষণ বিজ্ঞাপিত করিত। সেই ভ বালক অতি অল্প বয়সেই অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় দেন। াদিগের প্রতিভার বিকাশ বাল্যকালেই হয়; যে মূলকের বৃদ্ধি হয়, ত্রই তাহার চিহ্ন দেখা যায়। শ্রীজীব পাঠ্যাবস্থায় প্রথমেই প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার লাভ করিলেন,—

"অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎকার।
ব্যাকারণ আদিশাস্ত্রে অতি অধিকার॥"

্যাপক সকাশে যখন তিনি কাব্যাদি শাস্ত্র পড়িতেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ সকলে মুগ্ধ হইতেন। বালক তাঁহার খেলারঘরে ভবিষ্যৎ জীবনের ন করে। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে (১ম, ৫১ পৃঃ), শ্রীজীবের রিত্র অতি অদ্ভুত ছিল। খেলার সময় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা তিনি

অন্য খেলা জানিতেন না। কৃষ্ণবলরামের মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পুষ্পচন্দনাদি দিয়া পূজা করিতেন, বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে মূর্ত্তি অনিমিষনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন, কনকপুত্তলীর মত ভূমিতে সিক্তনেত্রে প্রণাম করিতেন, এবং অতীব ভক্তিতে মিষ্টান্ন বালকগণকে লইয়া প্রসাদ খাইতেন।

সেইমূর্ত্তি দুইটি লইয়া শ্রীজীব নির্জ্জনে খেলা করিতেন, উহাদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, কোন কোন দিন সেই কৃষ্ণবলরাম মূর্ত্তিই স্বপ্নে দেখিতেন। একবারমাত্র দর্শন হইতে গৌর নিত্যানন্দ মূর্ত্তিও ছায়ার মত লাগিয়াছিল, কখনও কখনও স্বপ্নেও দেখিতেন; তেমন

"ভাসয়ে দীঘল দু'টি নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে॥"

স্বপ্ন ভাঙ্গিলে, প্রভুদ্বয়ের চিন্তা করিতেন। পড়িতেন শুনিতে তাহারই মাঝে সেই পিতৃহীন বালকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। মুখে শুনিতেন, তাঁহাদের বংশের কি উচ্চ পদ-গৌরব ছিল, তাঁহাদে কি ঐশ্বর্য্যের হাট বসিয়াছিল; সে সকল ঠাট চুরমার হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের সলিতার মত তিনি এখন একাকী এ পুরীর পুরুষ-প্রহরী আছেন। বিষয়ের কথা উপকথায় পর্য্যবসিত পিতা নাই, জ্যেষ্ঠতাতেরা কাঙ্গাল সাজিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছেন, যোগীর মূর্ত্তি দেখিতে পান না, শুধু ত্যাগের কথা লোকের মুখে বৃন্দাবন হইতে সহজে কোন খবর আসে না, শ্রীজীব শুধু মাঝে মাঝে ভিতর তাঁহাদের অকর্ষণ অনুভব করেন। অমনি সংসার তাঁহার অসার লাগিত, আত্মীয়স্বজনের প্রতি মমতা থাকিত না, কেমন উদাসভাব আসিয়া সেই কৈশোরকালে তাঁহাকে বিভোর করিয়া

ার যে স্বল্পাবশিষ্ট সম্পত্তি ছিল, সামান্য কর দিয়া উহার আয় হইতে
রবর্গের ভরণ পোষণ চলিয়া যাইবার বাধা ছিল না। পরিজনেরাও
ছিলেন, তাঁহারাও নিস্পৃহ নিষ্কিঞ্চন ভাবে কোন প্রকারে জীবন
নর্ব্বাহ করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। বালক শ্রীজীব বড় হইয়াও
দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না। সকলে তাঁহার উদাস ভাব দেখিয়া
ত, সন্দেহ করিত, শ্রীজীবও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দিগের মত সংসার
করিয়া যাইবেন। তিনি কাহারও কোন কথায় উত্তর দিতেন না
লে উহাদের কথাই ফলিয়াছিল।

প্রমবিলাসে বর্ণিত আছে, শ্রীজীব তাঁহার মাতার নিকট জ্যেষ্ঠতাত-
ত্যাগের কথা, দৈন্যের কথা, ডোরকৌপীন পরিয়া বৃন্দাবনের দ্বারে
ভক্ষা করিয়া জীবন ধারণের অপূর্ব্ব গল্প শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগেরই
করিতে ব্যস্ত হন এবং নিজে বাকলার বাটীতে থাকিতেই
বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণা ও ইষ্টসেবাপরায়ণা
তাহাতে বাধা দেন নাই। এই ভাবে শ্রীজীব আকৌমার ব্রহ্মচারী—
চরিয়া তাঁহার সেই অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যকে
ত্ত্বানুসন্ধানে ক্ষুরধার করিয়াছিল, তাঁহার পবিত্র জীবনকে ভক্তিময়
রিয়া তুলিয়াছিল। স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে তাঁহার কাব্যব্যাকরণ
প্রভৃতি শাস্ত্রশিক্ষা শেষ হইয়াছিল; কোন গ্রন্থে তাঁহার সেই
াগুরুগণের নাম পাই নাই। এখন তাঁহার বয়সও ১৯।২০ বৎসর
ল, * এবং বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র পড়িবার জন্য তাঁহার মানসিক

ষ্ণব গ্রন্থ হইতে শুদ্ধভাবে সময়ের নির্ঘণ্ট ঠিক করা যে অতীব দুরূহ কার্য্য,
ংবার বলিয়াছি। কেহই সূক্ষ্মভাবে পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া গ্রন্থ লিখেন
াদী বনমালী লাল গোস্বামীর নিকট যে 'সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভের
' সূচক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে ("বৃন্দাবন কথা, ৮৩ পৃঃ) তাহাতে শ্রীজীব

উৎকণ্ঠাও অত্যন্ত জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইবার প্রবল পি
লুক্কায়িত ছিল। নবদ্বীপ তখন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র; সকলেরই
নবদ্বীপের দিকে নিপতিত; কাজেই শ্রীজীব "অধ্যয়ন-ছলে নবদ্বী
কৈল" (ভ,র, ১ম), কারণ তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, যেমন
নবদ্বীপ হইতেই বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তিনিও সেখানে গেলে
কোন সুযোগ পাইবেন। তিনি বৈষ্ণব বেশে নৌকাযোগে কয়ে
আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ফতেয়াবাদের অন্তর্গত তাহাদের প্রেমভাগের বা
আসিলেন। সেখানে কিছুদিন বিলম্ব হইল। সঙ্গীদিগকে পূ
নৌকাসহ বিদায় দিয়াছিলেন। পরে একটিমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া পদ
চাকদহের পথে নবদ্বীপে আসিলেন। এই যে তিনি গৃহত্যাগ করি
আর কখনও স্বদেশে ফিরিয়া আসেন নাই।

শ্রীজীবের নবদ্বীপে পৌছিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীপাদ নিত্যা

গোস্বামীর জন্মসম্বৎ ১৫৮০ (১৪৪৫ শক বা ১৫২৩ খ্রী°) দেওয়া আছে।
ভুল, কারণ শ্রীজীবের পিতা বল্লভের যে ১৪৩৭ শকে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়, উহা
এবং উহাতে কোন সন্দেহ নাই, সুতরাং উহার পরে জীবের জন্ম হইতে পার
দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরত্নাকরের কথা বিশ্বাস করিলে, ১৪৩৫ শকে শ্রীচৈতন্যের
আগমন কালে শিশু শ্রীজীব তাঁহাকে দেখিয়া ছিলেন, সুতরাং তখন উহার বয়স
দুইবৎসর। তাহা হইলে শ্রীজীবের জন্মশক ১৪৩৩ ধরা যায়। সেবা প্রাকট্য পু
প্রায় দেখা যায়, গোস্বামীদিগের সংসারাশ্রমের তারিখগুলির মধ্যে ভুল
হইবারই কথা, কারণ উহা গোস্বামিগণের অন্তর্ধানের পরে সঙ্কলিত।
ঘটনার তারিখ নানাসূত্রে নির্দ্ধারিত, সুতরাং তাহা আমরা মানিয়া লইতে প
শ্রীজীব ২৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে যান, ইহা সত্য হইতে পারে। এই ২৪
অন্ততঃ ৪।৫ বৎসর তিনি কাশীবাসে শিক্ষার্থী ছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া
বিলম্ব করেন নাই। সুতরাং গৃহত্যাগের সময় তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর, জন্ম
শক, নবদ্বীপ আগমন ১৪৫২ শক, শিক্ষান্তে বৃন্দাবন গমন ১৪৫৭ শক ধরিতে পারি

খড়দহ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থিতি
...তছিলেন। যেন তিনি জীবকে কৃপা করিবার জন্যই তথায়
য়াছিলেন, জীবে কৃপা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত। নবাগত
...রী শ্রীবাস-গৃহে গিয়া প্রভুর চরণ-বন্দনা করিলেন; প্রভু উঠিয়া
...। সনাতন ও রূপের ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন
শেষে তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিয়া অশেষ আশীর্বদান করিলেন।
... জীবকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপের লীলাস্থান সমূহ দেখাইলেন।
...ব গৌরাঙ্গলীলায় মুগ্ধ হইয়া নীলাচলে যাইতে চাহিলেন, অথবা যদি
...নন্দের কৃপা পান, তবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। নিত্যানন্দ
...স্তাবে সম্মত না হইয়া—

"আজ্ঞা দিলা শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।

তোমার বংশে যে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥" চৈ, চ, অন্ত্য ৪

... প্রভু বলিলেন, শ্রীজীব, তোমার জ্যেষ্ঠতাতদিগকে শ্রীচৈতন্য
...নের অধিকার অর্পণ করিয়াছেন, সেই তোমার প্রকৃত কার্যাক্ষেত্র,
যত শীঘ্র সম্ভব বৃন্দাবনে গিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের সহায় হও। শ্রীজীব
এখনও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। যাঁহার নিকট ঐ
বৈষ্ণবানুমত ভাবে পাঠ করিতে পারেন, এমন কোন অধ্যাপক
নবদ্বীপে ছিলেন না। এজন্য শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে কাশীধামে গিয়া
...ত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট ঐ শাস্ত্র শিক্ষা করিবার উপদেশ
...। উহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। এই মধুসূদন বাচস্পতি
...প্রবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য। অদ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক
...ব শ্রীচৈতন্যের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া ভক্তিদীক্ষা লইবার
...দান্তাদি শাস্ত্র ভক্তিসিদ্ধান্তানুসারে নূতনভাবে ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন,
...ত তাঁহার নিকট সেই মতে বেদান্তচর্চ্চা করিয়া কাশীতে বিখ্যাত

পণ্ডিত হন। * ঐ ভাবে বেদান্ত অধ্যাপনা করিবার মত অন্ত কোন প
তখন কাশীতে ছিলেন না। প্রকাশানন্দ প্রভৃতি মতপরিবর্ত্তনের
সঙ্গে মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবন যাত্রা করেন ; সেখানেও তিনি আর
গ্রহণ করিতেন না, অগাধ পাণ্ডিত্য সাধনার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন।

প্রভুর উপদেশ মত শ্রীজীব অচিরে পদব্রজে কাশীধামে যান।
তাঁহার বয়স ২০ বৎসর ; তিনি কাশীতে প্রায় চারিবর্ষ থাকিয়া বাচ
নিকট ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। শ্রীজীবের বিদ্যাবল
বাচস্পতি মুগ্ধ হইলেন, এবং কাশীবাসী সকলে তাঁহার
করিতে লাগিলেন।

"কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্ব্বঠাই।
ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই॥" ভ, র, ১ম, ত

এই কাশীধামে থাকিতে থাকিতে শ্রীজীব নীলাচলে মহাপ্রভুর অপ
হওয়ার কথা শুনিয়া কাতর হইলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নীলাচলে
গৌরাঙ্গ সঙ্গ লাভের কল্পনা ছিল ; তাহা হইল না, তিনি শীঘ্র
সমাপন করিয়া ২৮ বৎসর বয়সে বৈষ্ণববেশে অবশেষে বৃন্দাবনে
হইলেন। (১৪৫৭ শক, ১৫৩৫ খ্রীঃ) †

* প্রত্যেক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি পৃথক্ পৃথক্ বেদান্তভাষ্য ছিল। চৈতন্য-প্র
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের তেমন কোন ভাষ্য এখনও প্রণীত হয় নাই। তবে
মুখে বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া বাসুদেব প্রভৃতি কেহ কেহ সিদ্ধান্ত স্থির
তদীয় শিষ্য মধুসূদন সেইভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন। বহুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধ
বিদ্যাভূষণ বেদান্তের "গোবিন্দ-ভাষ্য" প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয় মতের ভিত্তি সুদৃঢ়

† কবিরাজ গোস্বামী নিজের "চৈতন্যচরিতামৃতে" মহাপ্রভুর অপ্রকট
পরবর্ত্তী কোন ঘটনা বিবৃত করেন নাই। ঐ গ্রন্থে শ্রীজীবের নবদ্বীপ হইতে কাশী
কথা আছে, বৃন্দাবন গমনের উল্লেখ নাই। রূপসনাতনের সঙ্গে শ্রীজীবের ক
গ্রন্থের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ। ইহা হইতে অনুমান করা সহজ যে
মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবনে যান।

বৃন্দাবনে সেবাধর্ম্ম।

(২)

"আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ।
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহর প্রেমাখ্য ভক্তিশ্রিয়ে॥

ইহা "লঘুতোষণী"তে শ্রীজীবের নিজ উক্তি। তিনি বলিতেছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতেরা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অত্যধিক কৃপালাভ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। বাস্তবিকই উঁহারা তখন ব্রজমণ্ডলের একপ্রকার একচ্ছত্রী প্রভু, সকলে তাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্যের নিকট অবনতমস্তক, তাঁহাদের কঠোর সাধনায় বিস্মিত ও ভক্তিযুক্ত, ভক্তগণ তাঁহাদের পদাশ্রয় পাইয়া ধন্য। এমন সময়ে শ্রীজীব গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের পাদবন্দনা করিলেন। বহু-কাল পরে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ বংশের একমাত্র বংশধর, প্রাণাধিক কনিষ্ঠ সহোদরের একমাত্র কৃতী পুত্র, পরম বৈষ্ণব দিবাকান্তি শ্রীজীবকে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন, অন্যান্য গোস্বামী ও ভক্ত-গণের নিকট সহর্ষে তাঁহার পরিচয় করাইয়া না দিয়া স্থির হইতে পারিলেন না। শ্রীজীব চিরজীবনের মত বৃন্দাবনবাসী হইলেন।

এই সময় বৃন্দাবনের এক সুবর্ণযুগ। নীলাচলে শ্রীচৈতন্য অকস্মাৎ অপ্রকট হওয়ায় দেশময় বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে বটে, বিশেষতঃ বৃন্দাবনে ভক্তগণ হাহাকার করিতেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাবে একটা তীব্র প্রচেষ্টা জাগিয়া-ছিল, নবমতের প্রাধান্য এবং বৃন্দাবনে গৌড়ীয়দিগের প্রতিপত্তি কিস-রূপে থাকিবে, শাস্ত্রগঠন এবং সম্প্রদায় স্থাপন দ্বারা কিরূপে ভক্তি-র সুপ্রসার হইবে। তাই নীলাচলের লীলা শেষ হইলে প্রধান প্রধান মনীষী ভক্তগণ ছুটিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, মহাপ্রভুর আদেশ ও

উপদেশে বিগ্রহ গড়িয়া, মন্দির গড়িয়া, শাস্ত্র গড়িয়া নবমতের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছেন। পূর্ব্ব হইতে লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী তথায় ছিলেন; পরে রূপ সনাতন, প্রবোধানন্দ ও রঘুনাথ ভট্ট আসিয়া বাস করিতেছেন, ক্রমে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পূর্ব্বেও পরে গোপাল ভট্ট, কাশীশ্বর, রঘুনাথ দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভক্তগণ আসিয়াছেন। এইবার আসিলেন গোস্বামীদিগের সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীজীব। ইঁহারা সকলেই এ সময়ে জীবিত, কাহারও কালপ্রাপ্তি এখনও ঘটে নাই, সকলের অবস্থানে ও সকলের সাধন ভজনে বৃন্দাবন আজ সমৃদ্ধ, জাকজমকশালী। এমন সময়ে শ্রীজীব আসিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রধান গোস্বামীদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া সকলের স্নেহের পাত্র হইবারই কথা, তদুপরি তাঁহার দিব্যরূপ, চারু চরিত্র এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যখন সকলের পরিচয় হইল, তখন আদর, যত্ন ও শ্রদ্ধাতে তিনি সকল আশ্রমের স্নেহপুত্তল হইয়া গেলেন। গোস্বামীরা বৃন্দারণ্যের নানাস্থানে কুঞ্জে কুঞ্জে থাকেন; সকল কুঞ্জে শ্রীজীবের অবারিত গতি, সকল শাস্ত্র চর্চ্চায় তাঁহার অবাধ প্রবেশাধিকার, সকল উৎসবানুষ্ঠানে তিনি অগ্রদূত হইলেন। তাঁহার মধুর মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিলেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভার অপ্রতিভ হইয়া সকলে তাঁহাকে সম্ভ্রম করিতেন। আকুমার ব্রহ্মচারী যুবক শ্রীজীব আসিয়া সর্ব্বত্র একটু নবজীবনের চাঞ্চল্য তুলিলেন।

সনাতনের আদেশ ক্রমে রূপ তাঁহার দীক্ষাগুরু হইলেন; যথারীতি শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র দিলেন। তখন শ্রীজীব নিকট ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। শিক্ষার মূলপত্তন থাকিলে বৃদ্ধিতে বিলম্ব হয় না। শ্রীজীব সকল ভক্তের আদরের পাত্র যেহেতু যান সকলেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও সাধক, সকলেই তাঁহাকে শিক্ষা সরস উপদেশে ধন্য করেন; সুতরাং তিনি ভক্তিমার্গেও অগ্রসর

াগিলেন। ক্ষেত্রের গুণে মানুষ গড়ে, জীব ত সর্ব্বভাবে সুপাত্রই বটে। তনি নিজের কর্ত্তব্য কখনও ভুলিতেন না; জ্যেষ্ঠতাতেরা যেমন তাঁহার দেখিলে বাৎসল্যে বিভোর হইতেন, তিনিও তেমনই পিতৃতুল্য গুরুজনের সেবা করিতেন। যাঁহার নিকট যখন থাকেন, তাঁহাকেই একান্তভাবে সেবা করেন। তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করেন, পূজার আয়োজন করিয়া দেন, বিগ্রহ সেবার সাহায্য করেন, তাঁহার ভোজন হইলে প্রসাদান্ন খান, তিনি শয়ন করিলে পাদসম্বাহন করেন, ঘর্ম্ম হইলে জন করেন; ছায়ার মত নিকটে থাকিয়া জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের সেবা করেন। পুঁথিপত্র গুছাইয়া রাখেন, পুঁথিগুলি আতপতপ্ত করিয়া কীটমুখ হইতে ক্ষা করেন, নূতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন ও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রেন। প্রভুরা যখন শাস্ত্র লিখেন, তখন শ্রীজীব পার্শ্বে বসিয়া বাতাস ন ও মক্ষিকা সন্তাড়ন করেন; যখন তাঁহারা আলস্য পরবশ হইয়া খিতে লিখিতে শয়ন করিয়া পড়েন, তখন জীব তাঁহাদের মুখের কথা নিয়া পুঁথি লিখিয়া দেন, পুঁথি খুঁজিয়া আনিয়া আবশ্যক শ্লোক বাহির রিয়া পড়েন, সাধ্যমত আকর-গ্রন্থের সন্ধান দেন। এইভাবে খুটিনাটি কল কার্য্যের সহায়তা করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট জীব যেন বনের মত অনিবার্য্য অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। মন্ত্র গ্রহণের শ্রীজীব অধিকাংশ সময় রূপের নিকট থাকিতেন, প্রয়োজন হইবা মাত্র নাতনের পদপ্রান্তে যাইতেন। উভয়ের সেবার ভিতর তিনি যেন াপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী যখন 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করিতেছিলেন, খন শ্রীজীব নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শূন্যগর্ভ ভাণ্ডেই হয়, পূর্ণভাণ্ডে শব্দ থাকে না। জ্ঞান-ভাণ্ডার যখন পূর্ণ হয়, তখন তিষ্ঠার চেষ্টা থাকে না। শ্রীপাদরূপ প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠার মত

স্মরণ করিতেন। কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা আসিয়া, তাঁহার সহিত তর্ক-বিচার করিতে চাহিতেন, রূপ কোন তার্কিকের সহিত বিচার করিতেন না। তিনি সানন্দে দিগ্‌বিজয়ীকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া নিস্তার পাইতেন।* কিন্তু জীব এই সময়ে অল্পবয়স্ক যুবক, অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শাস্ত্রপারদর্শী; তাঁহার মনের ভাব ছিল, যাহারা শাস্ত্রার্থ প্রকৃতভাবে না বুঝিয়া, দম্ভদর্প করিয়া পরকে পরাজয়ের চেষ্টা করে, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা লোক সমাজে ব্যক্ত করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। যাহারা প্রকৃত পণ্ডিত নহে, তাহারা কেন ফাঁকি দিয়া পণ্ডিত সাজিবে? শ্রীজীব বৃন্দাবনে যাইবার অল্প দিন পরে রূপ নারায়ণ নামে (প্রে. বি. ১৩শ) এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসেন, শ্রীজীব তাহাকে বিচারে পরাজিত করিয়া শ্রীচৈতন্য-মতে দীক্ষা মন্ত্র লইতে বাধ্য করেন। এইরূপ তিনি আরও দুই একজন দিগ্বিজয়ীকে বিচারে পরাজিত করিয়া তাহাদের জয়পত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়া গল্প প্রচলিত আছে।

কিছুদিন পরে বল্লভ ভট্ট বা বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত বল্লভাচার্য্য বৃন্দাবনে আসিলেন। তিনি বয়সে প্রবীণ, বহুজনের গুরু এবং অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, সেইরূপ পাণ্ডিত্যের একটা অভিমানও তাঁহার ছিল। শ্রীজীব তাঁহাকে চিনিতেন না।

---

* গোস্বামীরা অনর্থক কোন আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও চাহিতেন না। গল্প আছে, এক সময়ে প্রসিদ্ধ ভক্তরমণী ভজনপরায়ণা মীরাবাই বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ গোস্বামীর সহিত দেখা করিতে চান। তখন তিনি স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, প্রকৃতি-সম্ভাষণ করাই গৌড়ীয় ভক্তেরা দোষাবহ মনে করিতেন। ঐ কথা শুনিয়া মীরা বলিয়া পাঠান, 'বৃন্দাবনে ত পুরুষ একমাত্র তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আর কেহ পুরুষ আছেন বলিয়া তিনি জানেন না।' এই কথায় মীরার হৃদয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া রূপ তাঁহার সহিত দেখা করেন।

য়া ভক্তিরসামৃতের পুঁথি লিখিতেছেন, যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র পার্শ্বে বসিয়া
ার পাঠাস করিতেছেন; এমন সময়ে বল্লভ ভট্ট আসিলে শ্রীরূপ
াকে যথোচিত সমাদর করাইয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে আলাপ
া। রূপ রসামৃতের কতকগুলি স্বরচিত শ্লোক তাঁহাকে পড়িয়া
ইলেন; উহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলি সম্বন্ধে বল্লভাচার্য্য কিছু অন্য
প্রকাশ করিলেন; রূপ তাহাতে কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া, উহা
করিতে দিয়া, যমুনা স্নানে উঠিয়া গেলেন।* বল্লভাচার্য্য সংশোধন
াতে উদ্যত হইলে, শ্রীজীবের সহিত তাঁহার তর্ক হইল। সে বিচারে
াচার্য্য জয়ী হইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার মনে মনে বড়
ভ হইল, তিনি চলিয়া যাইবার সময়ে পথে রূপ গোস্বামীকে দেখিতে
য়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"অল্প বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে।

তাহার পরিচয় হেতু আইলাম উল্লাসে॥" ভ, র, ৫ম, ২৭২ পৃঃ

য়া রূপ ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিচয় দিলেন। কিন্তু ভট্টের কথার ভাবে
ালেন, সেই অর্ব্বাচীন যুবক প্রবীণ পুরুষের প্রতি অপব্যবহার
রিয়াছে, অমনি কুটীরে আসিয়া,—

"শ্রীরূপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি।

অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিলে মূঢ়মতি॥

ক্রোধের উপর ক্রোধ না হইল তোমার।

তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর॥" (প্রেঃ বিঃ ২২৬ পৃঃ)

---

* এই বল্লভ ভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যের দুই বার সাক্ষাৎ হয়, একবার রূপের
ার প্রাক্‌কালে প্রয়াগে, আর একবার নীলাচলে। সেখানে গিয়া যখন বল্লভ ভট্ট
করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন, তখন

"প্রভু হাসি কহে" স্বামী না মানে যে জন।

বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥ চৈ, চ, অন্ত্য ৭

যেমন কথা, তেমনই কায। জীব অপরাধ বুঝিলেন, ক্রোধের উপ
ক্রোধ না হইলে, অর্থাৎ ক্রোধ ত্যাগ না করিলে বৈরাগ্য লাভ হয়
ভক্ত হওয়া যায় না, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহাকে শিক্ষা দিবার
কঠোর গুরুবাক্য তিনি মাথায় পাতিয়া লইলেন; গুরুর আদেশ অবিচা
পালনীয় বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রয় হইতে পূর্ব্বমুখে নি
হইয়া এক জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন; কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া, কো
পানাহারের চেষ্টা না করিয়া, দেহকে নিদারুণ ক্লেশ দিয়া তিনি ক
মাস তথায় ছিলেন। কিন্তু তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? ভাগ
তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে সব প্রসঙ্গ জাগিত, তাহারই সারভাগ তিনি
স্থানে বসিয়া সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। * সর্ব্বদাই খেদে তাহার
পূর্ণ, জীবন নৈরাশ্যময় বোধ হইতেছিল।

"দেহ হইতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে।
প্রভু পাদপদ্ম পাব এই চিন্তা চিতে॥" ভ, র, ৫ম

তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকে কখনও
মূল কিছু দিলে, কোন দিন আহার করেন, কভু বা নিরাহারে থাকে
কোন দিন কিছু গোধুম চূর্ণ লইয়া জলে মিশাইয়া ভক্ষণ করেন। শ্রীজী
মৃতপ্রায় হইলেন।

---

* এই গ্রন্থই বহুদিন পরে তৎপ্রণীত ভাগবত-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা "সর্ব্বসম্বাদিনী
নামক দুরূহগ্রন্থরূপে সঙ্কলিত হইয়াছিল। প্রেমবিলাসে আছে :—

"তথি সর্ব্ব সম্বাদিনী গ্রন্থ বিরচিলা।
গুরু রূপসনাতনের নাম না লিখিলা॥"

সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে গুরুর নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ যে বহু বর্ষ
পরে শ্রীজীবের পরিণত বয়সের ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে গ্রন্থ যখন সমাপ্ত হ
তাহার বহু বৎসর পূর্ব্বে বল্লভাচার্য্য দেহ ত্যাগ করেন

। সময়ে একদিন সনাতন গোস্বামী সেই পথে আসিতেছিলেন। পথ দিয়া যাইবার কালে গ্রামে বসিয়া গ্রামের লোকের শুভবার্ত্তা না ধাইতেন না। বৃন্দাবনের আবাল বৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে আপন জনের নি ও ভালবাসিত। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে জঙ্গলের মধ্যে ন্ন্যাসীর কথা বলিল। সনাতন তাঁহাকে দেখিতে গেলে পর্ণকুটীর-াসিয়া সজল নেত্রে শ্রীজীব তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বড় করুণা হইল, কিন্তু রূপের বিচারের মর্ম্ম না জানিয়া তিনি সহসা সঙ্গে করিয়া আনিতে সাহস করিলেন না। নিজে রূপের নিকট ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ সমাপ্তির কত দূর, জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল লিখন।
জীব রহিলেই শীঘ্র হইত শোধন॥
গোস্বামী কহেন জীব জীয়া মাত্র আছে।
দেখিনু তাহার দেহ বাতাসে হালিছে॥" ভ, র, ঐ

নর দুঃখাত্ত কথার ভঙ্গি এবং আদেশের ইঙ্গিত পাইবা মাত্র রূপ ত্রের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রাণপণে অত্যধিক শুশ্রূষা করিলেন, তখন শ্রীজীব ক্রমে সুস্থ পুনরায় পূর্ব্ববৎ গুরুসেবা আরম্ভ করিলেন। অগ্নিদহনে যেমন র মরিচা কাটিয়া যায়, এই দারুণ ক্লেশে জীবেরও যেটুকু বয়সোচিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল। ইহারই বৎসরাধিককাল পরে শকে (১৫৪১ খৃঃ) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সমাপ্ত হইল।

বৎসর (১৫৪২ খৃঃ) শ্রীরূপ গোস্বামী শিষ্যের দৃঢ়ভক্তি প্রত্যক্ষ তাঁহাকে পৃথক্ ভাবে সেবা করিবার জন্য একটি ঠাকুর দিলেন— 'রাধা দামোদর। "সাধন-দীপিকা" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে:—

রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ
জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই ক্ষুদ্র সুঠাম শিলামূর্ত্তিটী রূপ পূর্ব্ব হইতে সেবা করিয়া পরে স্বপ্নাদেশ ক্রমে উহা প্রিয় শিষ্যকে সমর্পণ করেন। ভক্তি করে আছে —

"স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা দামোদরে
স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিলা শ্রীজীবেরে॥"

৪র্থ, ১৩৮ পৃঃ

এখানে "স্বহস্তে নির্ম্মাণ" করার অর্থ ঠিকবুঝা যায় না। সম্ভ শ্রীরূপ স্বপ্নদৃষ্ট মত একটি মূর্ত্তি শিল্পীদ্বারা প্রস্তুত করাইয়া প্রথমতঃ নিজগৃহে রাখিয়া পূজা করিতেন, পরে উহার সেবাভার শ্রীজী উপর দিয়াছিলেন। শৃঙ্গার বটের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে শ্রীরূপ ও শ্রী কুটীরের সন্নিকটে ৺রাধা-দামোদরের মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং সেখা আছে। তবে মূল মূর্ত্তিটি আওরঙ্গজেবের অত্যাচার ভয়ে জয় নীত হন এবং সেখানেই আছেন। একটি প্রতিভূ বিগ্রহ পর কালে নির্ম্মিত হইয়া বৃন্দাবনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন, এখন মূর্ত্তিরই নিত্যসেবা চলিতেছে। এই পুরাতন মন্দিরটিতে কোন কার্য্য নাই, সাধারণ দালানের মত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৩৭ পৃঃ) অতিবৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী গোবর্দ্ধনের নিত্য পরিক্রমা করিতে অসমর্থ হইলে যে প্রস্তরখণ্ড হইয়া দৈবাদেশে উহারই চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করিতেন, সেই পাহাড়ী" আনিয়া শ্রীজীব স্বীয় ইষ্টমন্দিরে স্থাপিত করিয়া ছিলেন, এখনও এইস্থানে আছে। এই রাধাদামোদরের মন্দিরের উত্তর একখানি বাঙ্গালা গৃহে রূপ গোস্বামীর এবং দক্ষিণ প্রাঙ্গণে গৃহে, একপার্শ্বে শ্রীজীব গোস্বামীর ও অপর পার্শ্বে ভূগর্ভ গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি রহিয়াছে। এই সকল পুণ্যতীর্থ

প্রত্যহ সহস্র ভক্তের শিরঃ লুণ্ঠিত হয় এবং বৃন্দাবনের স্বর্ণযুগের পুণ্যস্মৃতি জাগাইয়া তুলে। শ্রীজীবের এই দেবালয় সংলগ্ন এক ঘর যে প্রাচীন রত্নভাণ্ডার স্বরূপ পুঁথিগুলি সংরক্ষিত ছিল, আর এখন নাই, উহার গতি কি হইয়াছে কেহই জানেন না, এরূপ পরিতাপের বিষয় আর নাই।

(৩)

ব্রজমণ্ডলের কর্ত্তা।

রাধা-দামোদরের সেবা-স্থাপনের পর ১২।১৩ বৎসর চলিয়া গেল। সময়ে সনাতন ও রূপ অত্যন্ত বৃদ্ধ ও স্থবির হইয়া পড়িলেও গুলি দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিলেন। সেই কার্য্যে তাঁহাদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। কাশীর অদ্বিতীয় প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর ভক্তরূপে প্রবোধানন্দ নাম বৃন্দাবনে আগমন করতঃ নন্দকূপে বাস করিতেছিলেন, তিনি লোকান্তরিত হইলেন। অবশেষে প্রথমে সনাতন ও পরে এবং রূপ গোস্বামীর কালপ্রাপ্তি ঘটিল। থাকিলেন এখন ব্যতীত লোকনাথ, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস (গোস্বামী) অতীব বৃদ্ধ, কঠোর সাধনার ফলে শুষ্ক শীর্ণ কাষ্ঠবৎ হইয়াছেন। রূপ সনাতনের অন্তর্ধানে ম্রিয়মাণ হইয়া শেষ যাত্রার অপেক্ষা ছিলেন। দাস গোস্বামীর কথা স্বতন্ত্র, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকট অন্ন ছাড়িয়া ফল-গব্যে জীবন রক্ষা করিতে ছিলেন। তৎপরে

"সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জলপান।

রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ।”

এমন কঠোর সাধনা কেহ কখন দেখে নাই। এই সব গো দিগের চলাফেরা, গ্রন্থলেখা, অন্যের সহিত আলাপ পরিচয় কর প্রকার বন্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ রচনা এখনও না হইলেও তিনিও বৃদ্ধ এবং কর্ম্মতৎপরতাবিহীন। শ্রীজীবই একমাত্র সমর্থ, পূর্ণবয়স্ক, অসাধারণ শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত ও সুতরাং তিনিই কার্য্যতঃ ব্রজমণ্ডলের কর্ত্তা হইয়া গুরুর আসন করিলেন। সে পদের তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র।

এই সময়ে তিনজন নূতন ভক্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যা হইতে আসিয়া সেই লোকান্তরিত গোস্বামীত্রয়ের কর্ম্ম-পথে দাঁড়াই ইঁহারা শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। গঙ্গা যমুনা সরস্ব একত্র মিশিয়া প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গম তীর্থের সৃষ্টি করিয়া নবদ্বীপেও তেমনি শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত একত্র নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মমতের সৃষ্টি করেন, নবদ্বীপ ভক্তিবাদের ত্রিবেণী ছিল। বৃন্দাবনে বসি মতের ভিত্তি গঠন করিয়াছিলেন মহাপুরুষ—তাঁহারা সনাতন, রূপ ও জীব নবদ্বীপের প্রভু অপ্রকট হওয়ার পর ভক্তিমতের গূঢ়মন্ত্র নিহিত ছিল এই কাছে। পরে সনাতন ও রূপের অবসানে গোপাল ভট্ট ও লো উহার বীজ রক্ষা করিতেছিলেন; শ্রীজীব তখনও গ্রন্থরচনা দ্বারা আবাদ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যা হইতে ভক্ত আসিলেন। উঁহারা যথাক্রমে গোপালভট্ট, লোকনাথ ও শ্রী শিষ্য হইলেন এবং কিছুকাল পরে পরম ভাগবত ও পণ্ডিত দেশে ফিরিলেন। ত্রিবেণী-সঙ্গম হইতে গঙ্গার ধারা যেমন

মুক্ত ত্রিবেণীতে পুনরায় ত্রিধা বিভক্ত ত্রিধারার সৃষ্টি করিয়াছে তাই অদ্বৈতের প্রবর্ত্তিত অপূর্ব্ব ভক্তিধারাও তেমনি কিছুকাল শাস্ত্রান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া পুনরায় বঙ্গে আসিয়া এই ভক্তের দ্বারা সর্ব্বত্র অব্যাহত প্রচার লাভ করিয়াছিল। শ্রীনিবাস, ও শ্যামানন্দকে প্রথম প্রবর্ত্তক প্রভুদিগের পরবর্ত্তী অবতার। মহাজনী পদে আছে,

"নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই
শ্রীচৈতন্য হইল শ্রীনিবাস ;
শ্রীঅদ্বৈত যারে কয়, শ্যামানন্দ তোঁহো কয় ;
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥"
"সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব।
সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তি-ভাব ॥"

যে তিনজন নূতন ভক্ত ক্রমে ক্রমে শ্রীধামে আসিয়া শ্রীজীবেরই লইলেন, অগ্রে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। কাটোয়ার গঙ্গাতীরে চাকন্দি গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। সন্ন্যাস দর্শন কালে তিনি অত্যন্ত প্রেমবিহ্বল হন, এজন্য নাম হয় চৈতন্যদাস। ইঁহার পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া, উভয়ে মহাপ্রভুর ভক্ত, উভয়ে তাঁহাকে দর্শন করিতে নীলাচলে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা অলৌকিক লাভ করিবেন। কিছুদিন পরে চাকন্দিতে আসিলে চৈতন্য-পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, (১৪৪০ শক) তাঁহারই নাম শ্রীনিবাস। চম্পকগৌর দেহকান্তি, সুদীর্ঘ-লোচন ও ভুবনমোহন মূর্ত্তি যিনি তিনিই মোহিত হইতেন। অল্প দিনে তাঁহার পিতৃবিয়োগ তিনি যাজিগ্রামে গিয়া মাতার সহিত বাস করেন; তথায় শ্রীখণ্ডের

নরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয় ও তাঁহার কৃপালাভ হয়। বাল্যশিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর, যখন তাঁহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর, তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া, গদাধর গোস্বামীর নিকট ভাগবত পড়িতে যান। পথে গিয়া শুনিলেন মহা অপ্রকট হইয়াছেন। নীলাচল অন্ধকার, ভক্তেরা ছিন্ন ভিন্ন, শোকে মৃতপ্রায় অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে গদা দেখা হইল, ভাগবত পড়িতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করা যায় না।

"শ্রীচৈতন্য প্রভু-গদাধর-নেত্রজলে।
মধ্যে মধ্যে বর্ণ লোপ পাঠ নাহি চলে॥"

গ্রন্থ আনিতে শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু গ্রন্থ ফিরিবার সময় পথে শুনিলেন, গদাধর অপ্রকট হইয়াছেন। আসিয়া নানাস্থানে ভক্ত-সমাজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে নব চলিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্ধান হ তখন তিনি নবদ্বীপে মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া, শান্তিপুরে সীতাদেবী এবং নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণীর চরণ দর্শন করিলেন। তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একবাক্যে বৃন্দাবন যাইতে বলি অবশেষে তিনি তাহাই করিলেন, সকল ভক্তগণের নিকট অনুমতি যাত্রা করতঃ রাজমহল, গড়ি, পাটনা, বারাণসী ও প্রয়াগের প মথুরায় পৌছিয়া শুনিলেন সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট ও রূপের তিরো হইয়াছে। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দাবনে পৌঁছি (১৪৬৭ শক বা ১৫৫৫ খৃঃ)।

কৈশোর বয়স হইতে এই অপূর্ব্বকান্তি ব্রাহ্মণতনয় ভক্তি সজল নেত্রে পাগলের মত ছুটিয়াছেন; এমন আশ্চর্য্যের বিষয়

ন, তাঁহার যাইবার পূর্ব্বেই সেখানে অন্ধকার হইয়াছে। নীলাচলে পুরে, খড়দহে ও সর্ব্বশেষে বৃন্দাবনে তিনি যাঁহাদের চরণ-দর্শন ার ব্যাকুল, সকলেই তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে সঙ্গোপন করিয়াছেন। াবাসকে ইষ্টদেবতা অশ্রুদিগ্ধ গড়িয়াছিলেন, নেত্রনীরে ভূমিসক্ত বার জন্য তিনি সকল বৈষ্ণবতীর্থে ঘুরিলেন এবং অবশেষে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রেমানন্দ করিলেন। শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে গোপাল ভট্টের নিকট পরিচিত লেন; তখন তিনি ভট্টের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ লেন।*

শ্রীনিবাসের আগমনের কিছুদিন পরে আসিলেন—উত্তর বঙ্গের াটি পরগণার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ রায়ের লক্ষাধিপের একমাত্র উত্তরাধিকারী—রাজকুমার নরোত্তম। কথা আমরা পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে বলিয়াছি (৪০-৪২ পৃঃ) সুদূর বঙ্গ হইতে পাগলের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া অস্থিচর্ম্মাবশেষ দেহে ন আসিয়া শ্রীজীবের আশ্রয় লইলেন, তিনি তাহাকে শুশ্রূষা বাঁচাইলেন এবং গোস্বামীদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। প্রভু লোকনাথ গোস্বামীর চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া কিরূপে সেবার বৈশিষ্ট্যে গুরুকে বাধ্য করিয়া তাঁহার একমাত্র শিষ্য হইয়া তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জানিনা কোন্ অজানিত নরোত্তমের সহিত শ্রীনিবাসের চির-সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল! কিন্তু কল ব্যাপারের যোগসূত্র শ্রীজীব। উভয়েই শ্রীজীবের নিকট ভক্তি-তে লাগিলেন।

---

* বর্ত্তী যুগের "ভক্তি-রত্নাকর," "প্রেম-বিলাস," "অনুরাগ-বল্লী" প্রভৃতি ভক্ত-বিষয়ক মহাজন গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ শ্রীনিবাসের জীবন চরিত লইয়াই ব্যস্ত

এমন সময়ে আর এক ভক্ত আসিলেন—তাঁহার নাম হইয়া শ্যামানন্দ। উড়িষ্যার অন্তর্গত ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামে কৃষ্ণ নামে এক সদ্‌গোপ জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তি বাস করিতেন। দণ্ডেশ্বর গ্রামে তাহার পূর্ব্বনিবাস ছিল, তথায় তৎপত্নী দুরিকার তাহার যে পুত্র হয়, উহার নাম ছিল কৃষ্ণদাস। বড় দুঃখে উহার বাল্য অতিবাহিত হয়, এজন্য ইহাকে সকলে "দুঃখী" কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিত। অল্পবয়সেই এই দুঃখী বড় ভক্ত ও সংসার-বি হন। পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া ইনি অম্বিকাগ্রামের পাটবাড়ী আসিয়া হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হইলেন। সেখানে কিছুদিন শি লাভ করতঃ কৃষ্ণদাস নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে অবশে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের আগমনের কিছুদিন পরে, বৃন্দাবনে আসি রাধাকুণ্ডতীরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপালাভ করেন। তিনি তাঁহাকে লোক সঙ্গে দিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়া দে শ্রীজীব তাঁহার ভক্ত হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয় শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষা দিলেন, এবং ভক্তিশাস্ত্র পড়াইয়া পণ্ডি করিয়া তুলিলেন আর নাম রাখিলেন—শ্যামানন্দ। প্রথম দর্শনা শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য হইল, এবং ভাবুক, তিনটি ভক্ত-হৃদয় বিগলিত হইয়া এক সঙ্গে মিলিয়া গেল।

"শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিন।
যে অদ্ভুত প্রীতি তা কহিতে কেবা জানে।।" ভঃ রঃ

বৈষ্ণবগ্রন্থে নির্ণীত হইয়াছে ইহারা তিনজনেই কৃষ্ণলীলার রাধার ত্রয়।* দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীবের নিজের শিষ্য। শ্রীনিবাস ও নরো

* বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ সকলেই কৃষ্ণলীলার সখী ছিলেন। এই সখী পরিচয় এই—সনাতন (লবঙ্গ মঞ্জরী), রূপ (রূপ মঞ্জরী) জীব (বিলাস ম

:গুর শিষ্য হইলে কি হয়, শ্রীজীব সকলকেই পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া
ছুষ করিয়া তুলিতেন। এই লোকোত্তর-চরিত্র ভক্তেরা তাঁহার হস্তে
ড়াপুত্তলতুল্য ছিলেন। শ্রীপাদ লোকনাথের কঠোর প্রতিজ্ঞা
ঙ্গিয়া নরোত্তম যেদিন তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইলেন,
দিনেরও উদ্যোগ আয়োজন সকলই শ্রীজীবের দ্বারা হইয়াছিল।
জীব যেন ব্রজভুক্তির রাজা, রাজার মত তিনি যাহা করেন, তাহাই
। তাঁহারই মুখের কথায় দুঃখী কৃষ্ণদাস হইলেন শ্যামানন্দ গোস্বামী,
নিবাস পাইলেন "আচার্য্য" উপাধি এবং নরোত্তম "শ্রীঠাকুর"
শেষ বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত ও পূজার্হ হইলেন; এবং
স্থ নরোত্তম এবং সদ্‌গোপ শ্যামানন্দ কালে বঙ্গ ও উড়িষ্যার
।। স্থানে বহু ব্রাহ্মণ-শিষ্যের গুরু হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলের সকল
ত্বের আদিগুরু শ্রীজীব।

সমস্ত বৃন্দাবনটিই ছিল যেন শ্রীজীবের নিজের বাড়ী; সে বাড়ীর
ম ও গৌরবের জন্য তিনি সকল চেষ্টাই করিতেন। কোন পণ্ডিত
প্রাধান্য স্থাপনের জন্য দিগ্বিজয়ে আসিলে, শ্রীজীব তাঁহার সহিত
বিচার করিয়া শ্রীধামের খ্যাতি রক্ষা করিতেন; কেহ ধর্ম্ম
াসু বা শিক্ষার্থী হইয়া আসিলে, তিনি তাহাকে বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ
ইয়া কৃতার্থ করিতেন; কোন ভক্ত আসিয়া ব্রজবাসী হইতে
লে, তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতেন, গোস্বামাদিগের সঙ্গসেবা করিবার
াগ করিয়া দিতেন; তাঁহাকে যিনি সকাতরে গুরুরূপে চাহিতেন,
। তাহাকে দীক্ষা দিয়া আত্মসাৎ করিতেন অর্থাৎ তাহার সকল

ল ভট্ট (গুণ মঞ্জরী), রঘুনাথ ভট্ট (রাগ মঞ্জরী), রঘুনাথ দাস (রস
), লোকনাথ (মঞ্জুলালী মঞ্জরী), শ্রীনিবাস (মণি মঞ্জরী), নরোত্তম (চম্পক
) এবং শ্যামানন্দ (কনক মঞ্জরী)।

পাপের বোঝা মাথায় বহিতেন। জ্ঞান-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল রূপে বৃন্দ
তখন বৈষ্ণব-সমাজের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইয়াছিল; শ্রীজীব ভাবিতে
সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কোন বিদ্যার্থী আসিলে, তাহার অভীষ্টসিদ্ধি ক
তাঁহার নিজ কর্ত্তব্যের অন্তর্গত সুতরাং যতক্ষণ সুব্যবস্থা না হ
ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না; সকল শাস্ত্রে তি
সুপণ্ডিত, যাহা যিনি পড়িতে চাহিতেন বা অন্যত্র পড়িতে পারিতে
না, তাহা শ্রীজীব পড়াইতেন। বৃন্দাবনে পূর্ব্বে তাল পত্র, ভূর্জ
এবং এমন কি বটপত্র প্রভৃতিতেই গ্রন্থ লেখা হইত, সনাতন
রূপের গ্রন্থ সমূহ অধিকাংশ তালপত্রেই প্রথম লিখিত হয়; শ্রীজীব
তখনকার মোগল রাজধানী আগ্রানগরী হইতে কাগজ আনিয়া তাহা
পুঁথি লেখার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন।

শ্রীজীব ছিলেন বৃন্দাবনের মুখপাত্র। কেহ কোন সংবাদ জানাইতে
বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলে, দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তাঁহাকে
পত্র লিখিতেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্যে কোথায়ও কোন নূতন
বা নিবন্ধ রচিত হইলে, তাহার প্রচার বা সংস্কারের জন্য বৃন্দাব
শ্রীজীবের নিকটই প্রেরিত হইত। কেহ তীর্থ-দর্শনে বা অন্য
শ্রীধামে আসিলে, তিনি সর্ব্ব প্রথমে জীবের সঙ্গে দেখা করিত
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। আকবর শাহ এই সময়ে দিল্লী-আগ্রা
মোগল বাদশাহ; তিনি রাজ্য জয় করিয়া সমগ্র ভারতের একাধি
হইবার কল্পনায় প্রথমতঃ রাজপুতনায় অবতীর্ণ হন, নানা বং
ও জাতিকে বিজিত করিয়া শিকরীতে অবশেষে এক নূতন রাজধা
স্থাপন করেন। তখন বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের খ্যাতি সকলের
দেশময় বিস্তৃত। একদা (১৫৭৩ খৃঃ) আকবর সদলবলে বৃন্দাব
আসিয়া গোস্বামীরা কেমন অদ্ভুত জীব, তাহাই দেখিবার জন্য সং

লেন। সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং নিজের অপরূপ মূর্ত্তি, অদ্ভুত দৈন্য বেশ, অলৌকিক তেজস্বী প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার প্রভায় গুণগ্রাহী বাদশাহকে বিমুগ্ধ করিলেন। সাধু গোসাঞিদিগের ফকীরের বেশ দেখিয়া, বাদশাহ বৃন্দাবনের নাম রাখিয়া গেলেন—ফকীরাবাদ। প্রবাদ আছে, বাদশাহের স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার চক্ষুবন্ধন করিয়া তাঁহাকে নিধুবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; সেখানে তিনি নাকি এক দৈবশক্তিতে বুঝিতে পারেন, বৃন্দাবন কিরূপ পুণ্য ধাম।* ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে যে সব হিন্দু রাজন্য ছিলেন, তাঁহারা বৃন্দাবনে মন্দির নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবা মাত্র বাদশাহ স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিলেন। পাঠান আমলে সুলতানের বিনা আদেশে হিন্দুরা কোন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না, সে আদেশও সহজে পাওয়া যাইত না। আকবরের সমদর্শিতায় অচিরে হিন্দু ও মোগল উভয় জাতীয় বিমিশ্র স্থাপত্যে বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া ছিল।†

* Growse, Mathura, p. 123. "Akbar was taken blindfold into the sacred enclosure of the Nidhban, where a vision was revealed to him so marvellous that he was constrained to admit that he had been permitted to stand upon holy ground." V. A. Smith, Akbar, p. 445.

† বাদশাহের এই আদেশে মদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথ ও যুগলকিশোর চারিটি বিগ্রহের মন্দিরগুলি ক্রমে ক্রমে নির্ম্মিত হয়। সম্ভবতঃ গুণানন্দের এই আদেশের প্রথম ফল (১১৩-১৪ পৃঃ)। ১৫৮০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে যশোহর বংশের সঙ্গে আকবরের শত্রুতা হয় নাই। বিকানীরের রাজা রায় সিংহ গোপীনাথের মন্দির গঠন করেন। অম্বরাধিপতি মানসিংহ (১৫৯০ খৃঃ) গোবিন্দজীর মন্দির এবং চৌহান বংশীয় রাজা নোনকরণ (১৬২৭ খৃঃ) যুগল কিশোরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি মন্দির যে শ্রীজীব গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাদশাহের বৃন্দাবন আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি বৃন্দাবন-দিগের জন্য কি করিতে পারেন, তাহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে ভক্ত গোস্বামীরা কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। তাঁহারা ফকীর হইতে পারেন, কিন্তু ভিখারী ছিলেন না। বারংবার জিজ্ঞাসিত হইয়া শেষে তাঁহারা চাহিলেন, রাজার সুদৃষ্টি, যাহাতে তাঁহারা শান্তিতে নিরুপদ্রবে বৃন্দাবনে থাকিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন হিন্দু নৃপতিরা এইভাবে তপোবন রক্ষা করিতেন। ভক্তেরা জানাইলেন, কত লোক মৃগয়া করিতে আসিয়া নির্দ্দয়ভাবে বৃন্দাবনে পশুপক্ষী মারে, উহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না; বৃন্দাবনের বৃক্ষরাজি ভক্তদিগের প্রাণস্বরূপ, তাহা কেহ কর্ত্তন করিয়া ভগ্ন করে, উহা তাঁহারা দেখিতে পারিতেন না। বাদশাহ যদি দয়া করিয়া ইহার কোন প্রতিবিধান করিয়া দেন, শ্রীভগবান তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। আকবর তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; ব্রজমণ্ডলে জীব হত্যা নিবারণের জন্য ফর্ম্মাণ বা আদেশ-পত্র দিয়া গেলেন, উহাতে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত ছেদনের নিষেধ ছিল।* আকবরের আদেশ এখন পর্য্যন্তও চলিতেছে, বিরোধী হইয়াছিলেন শুধু আওরঙ্গজেব। শুনা যায়, গোস্বামীদিগের রূপে আকবর এমন মোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি বৃন্দাবনের সেই ফকীরদিগের চিত্র তৈয়ারী করিবার জন্য দিল্লী হইতে চিত্রকর পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় ভক্তেরা কেহই চিত্র দিতে সম্মত হন নাই, শ্রীজীবের দৈন্যজড়িত প্রত্যুত্তরে বাদশাহ রুষ্ট হইতেও পারেন নাই। আকবর যে এক সময়ে মালা তিলকধারী বৈষ্ণবের মত সাজিতেন, তাহার মূল কারণ এই বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের সংসর্গ।

---

* ১০১৪ হিজরীতে এই ফর্ম্মাণ দেওয়া হয়। Hindu Review (1913) 339-40. পুলিন বাবুর "বৃন্দাবন-কথা," ২২ পৃষ্ঠা।

এই সময়ে বৃন্দাবনে যেমন বহু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাদি লিখিত হইতেছিল, বঙ্গদেশেও তেমনি অম্বিকা-কাল্‌নার দাস পণ্ডিত প্রভৃতি কেহ কেহ নিম্বকাষ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি য়া পূজারম্ভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ তাঁহার জীবন-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দদাস ও প দামোদরের কড়চা বৈষ্ণব সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। পদাবলী নার প্রবর্ত্তক, মহাপ্রভুর মর্ম্মী ভক্ত নরহরি সরকার ঠাকুর গৌরলীলার না দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিয়াছিলেন,

"গৌর লীলা দরশনে, ইচ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ॥"

৪০ খৃঃ অব্দে নরহরির অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে, তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-লেন, তাহা 'বহু বিলম্ব' না হউক, ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে ফলিয়াছিল। দ্ধোক্ত কড়চা ও পদকর্ত্তাদিগের ভজনপদ দেখিয়া বহু অনুসন্ধানে বৃন্দাবন যে "চৈতন্য-মঙ্গল" প্রণয়ন করেন, তাহাই চরিত গ্রন্থগুলির আদি এবং বিকৃত একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। হরি ধ্যানে যাহার কথা ভাবিয়াছিলেন, তিনি এই বৃন্দাবন দাস;*

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর বয়স যখন ৪বৎসর মাত্র (১৫০৮ খৃঃ) শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। এইজন্য তিনি "চৈতন্যের অবশেষ

তাঁহার গ্রন্থ রচনা হইবা মাত্র, সম্ভবতঃ খণ্ডে খণ্ডে উহার প্রতি বৃন্দাবনে প্রেরিত হইতেছিল। ভাগবতের সহিত ঐক্য রাখিয়া গ্রন্থ রচিত বলিয়া শ্রীজীব-প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ ইহার নাম রা "চৈতন্য-ভাগবত।"

"ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্য মঙ্গল।
দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভকত সকল॥
চৈতন্য-ভাগবত নাম দিল তার।
যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার॥"

প্রে. বি.

কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে "ভাগবত" নাম নাই, "চৈতন্য-ম নামই আছে। এই একই সময়ে (১৫৭৫ খৃঃ) লোচনদাস-র

পাত্র নারায়ণী" বলিয়া পরিচিত। কিছুদিন পরে কুমারহট্টবাসী বৈকুণ্ঠ দাসের সা তাহার বিবাহ হয় এই বিবাহের সন্তান বৃন্দাবন দাস। তিনি যখন গর্ভস্থ, ত তাঁহার পিতার কালপ্রাপ্তি হয় চৈতন্য দেবের অপ্রকটের পর বৃন্দাবনের জ (১৫৩৫ খৃঃ) তিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার দুঃখ প্রকাশ গিয়াছেন। "প্রেমবিলাসে" আছে, তিনি ১৫৭৩ খৃঃ চৈতন্যভাগবত রচনা করেন:—

"চোদ্দশত পচানব্বই শকাব্দের যখন
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন।"

সম্প্রতি বর্দ্ধমান-কাটিগ্রামে মুন্সীবাবুদিগের গৃহে চৈতন্য-ভাগবতের যে পুঁথি গিয়াছে, তাহার শেষাংশে আছে—

"চৌদ্দশত সাতানব্বই শকের গণন।
নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হৈল সমাপন॥"

"কমলা" পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৩২, ১০৬ পৃঃ

বৈষ্ণবশাস্ত্রপারদর্শী প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরি তত্ত্বনিধি ইহা (১৪৯৭ শক = ১৫৭৫ খৃঃ) গ্রন্থের রচনাকাল নিরূপণ করিয়াছেন।

তন্য-মঙ্গল" লিখিত হয়; * উহা বৈষ্ণব-সমাজে কবিত্ব পূর্ণ বলিয়া
ৃত হইলেও "ভাগবতের" মত সেরূপ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত
নাই। শুনা যায়, উভয় গ্রন্থ "মঙ্গল"-নামক বলিয়া বিরোধ
হুত হয়; তখন বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী দেবী স্বয়ং উহার
ংসা করিয়া দেন; সম্ভবতঃ তিনি ব্রজবাসী গোস্বামীদিগের
শুনিয়া নিজ পুত্রের গ্রন্থকে "ভাগবত" আখ্যা দিতে বলেন, সেই
ই উহা চলিতেছে। পরে উঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া লোচন দাসও
গ্রন্থে চৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়া বৃন্দাবন দাসের বন্দনা করিয়াছেন।
লোচনের গ্রন্থ শীঘ্র শীঘ্র ব্রজ-মণ্ডলের লোচন-পথবর্ত্তী হইয়াছিল
না সন্দেহ, কিন্তু যে কারণেই হউক, বৃন্দাবনের গ্রন্থ রচিত হওয়া
বৃন্দাবনে গিয়াছিল। '৺গোবিন্দ-মণ্ডপে নিত্য বিকালে শ্রীমদ্ভাগবত
হইত; কিন্তু এই গ্রন্থ গেলে, কিছুদিন ইহাই পঠিত হইয়া ভক্তের
হরি আকর্ষণ করিতেছিল। গ্রন্থ সমাপ্ত হইবা মাত্র সকলে আক্ষেপ
তে লাগিলেন, যে এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা প্রকৃত ভাবে নাই,
াচলের যে লীলায় তাঁহার অবতারের গূঢ়নাট্ট প্রকটিত হইয়াছিল,
। বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করেন নাই। তখন বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ সকলে
য়া একবাক্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বিশেষ ভাবে শ্রীচৈতন্য
তের এই শেষ লীলা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন। তখন কৃষ্ণ-
পক্ককেশ বৃদ্ধ; † তিনি ৺গোবিন্দজীর মাল্য প্রসাদ এবং শ্রীজীব

ান-কোগ্রামবাসী কমলাকর দাসের ঔরসে সদানন্দা দেবীর গর্ভে লোচনের
। (১৫২৩ খৃঃ) পূর্ণনাম ত্রিলোচনদাস, ইনি বৈদ্য জাতীয়।

বর্দ্ধমান-ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্য বংশে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ভগীরথ কবিরাজের
। এবং সুনন্দা দেবীর গর্ভে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয় (১৫১৭ খৃঃ)। তিনি ৬ বৎসর বয়সে
হীন হওয়ার পর, নানা দুঃখ কষ্টে শিক্ষালাভ ও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া

গোপালভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ, যাদবাচার্য্য প্রভৃতি সকল গোস্বামি-দিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের বিপুল পরিশ্রমে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, বঙ্গীয় বৈষ্ণব মতের গ্রন্থচূড়ামণি এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। ১৫০৩ শকে (১৫৮১ খৃঃ) এই বিরাট গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। *

অকৃতদার সন্ন্যাসী ভক্তরূপে বৃন্দাবনে যান ও রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপালাভ করেন। তিনিও মহাপ্রভুকে দেখেন নাই।

* এই গ্রন্থের কয়েকখানি প্রাচীন প্রতিলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে এই শ্লোক আছে:—

"শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তরে
সূর্য্যোহহ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

সিন্ধু=৭, অগ্নি=৩, বাণ=৫, ইন্দু=১; সুতরাং ইহাতে ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ অব্দ হয়। কিন্তু এই শ্লোক যে বিশুদ্ধ নহে, তাহা সহজে বুঝা যায়। ইহাতে মাসের নাম নাই, পক্ষ তিথি আছে; "সূর্য্যো" আছে, উহা হইতে সূর্য্যবারে বুঝিয়া লইতে হয়। বিশেষতঃ এই তারিখের সঙ্গে অন্য ঘটনাবলীর সময়ের সামঞ্জস্য থাকে না। খেতুরীর উৎসবের তারিখ ১৫০৪ শক, তাহা পরে ঘটিয়াছিল। এই গ্রন্থ সমাপ্তির অনেক পরে শ্রীজীব ও গোপাল ভট্টের তিরোভাব হয়; কিন্তু তাহা ১৫৩৭ শকের বহুপূর্ব্বে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু কিরূপে খেতুরীর উৎসবাগত বৈষ্ণবদিগের উত্তরীয়ে ১৫০৪ শক করিয়া দিয়া, তাঁহার গ্রন্থের অন্যত্র চরিতামৃতের রচনাকাল ১৫৩৭ শক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ২য় সং, ৩৩৪, ৩৫০ পৃ।

কিন্তু বিশুদ্ধ শ্লোকটি "প্রেমবিলাসে" গ্রন্থ মধ্যে (২৪শ, ৩০১ পৃঃ) দেওয়া এবং কবিরাজ গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থের যে প্রতিলিপি বিষ্ণুপুরে রাজা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া তথাকার রাজবাটীতে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতেও এই শ্লোক আছে বলিয়া অচ্যুত বাবুর "গোপাল-ভট্ট চরিতে" দেখিতে পাই;—

"শাকেহগ্নি বিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহহ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ রচিত হইলে পঠিত ও আলোচিত হইতে লাগিল; সিদ্ধান্তের একত্র সমাবেশে এবং পাণ্ডিত্যে এ গ্রন্থ অতুলনীয়। গৌড়দেশে উহার প্রচার করা দরকার। মহাপ্রভুর আদেশে প ও সনাতন এবং উহার পন্থানুসরণ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী যে সব রসশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচারিত তে না পারিলে মহাপ্রভুর আদেশের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। জীবের চিন্তা হইল, কিন্তু সে চিন্তা অধিক সময় করিতে হইল না, শ্রীনিবাস তখন বৃন্দাবনে প্রধান অভিনেতা। তিনি যেরূপ ভক্ত, ত এবং কার্য্যক্ষম ও প্রতিপত্তিশালী, তাহাতে শ্রীজীব বুঝিলেন, গুলি লইয়া গিয়া বঙ্গদেশে তাহার প্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার যুক্ত পাত্র শ্রীনিবাস। তৎক্ষণাৎ তিনি একথা গোপালভট্ট গোস্বামীকে লেন, এবং ব্যবস্থা করিলেন। শুধু তাহাই নহে, সকল ভক্তগণকে ীব নিভৃত ব লিয়া রাখিলেন, শ্রীনিবাস যখন এই প্রচার কার্য্যের পাত্র, তখন সুযোগ মত সকলেই যেন এক বাক্যে শ্রীনিবাসকে য়া বলেন, তিনি এই দ্বিতীয় যুগে বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর স্থান অধিকার বেন। শ্রীজীবের এই সাধু প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইয়া রহিলেন। এসময়ে শ্রীনিবাস তাঁহার নূতন সুহৃদ্ নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে

১৫০৩ শাকে (১৫৮১ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিযুক্ত রবিবারে নে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। জ্যোতিষমতে গণনাদ্বারা এই শ্লোক বিশুদ্ধ বলিয়া ন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই তারিখই আমরা ধরিতে পারি, অন্য ঘটনার সঙ্গে কোন অসামঞ্জস্য হয় না।

নন্দন কৃত "কর্ণানন্দ" ১৬০৭ খৃঃ অব্দে রচিত হয়। উহাতে প্রেমবিলাসের আছে। প্রেম-বিলাসের রচনাকাল ১৫২২ শক বা ১৬০০ খৃঃ। এই প্রেম- যখন চরিতামৃতের কথা আছে, তখন সে গ্রন্থ ১৬০০ খৃঃ অব্দে পূর্ব্বে রচিত, ত সন্দেহ নাই।

লইবা বৃন্দাবনের পূর্ব্বলীলার রসাস্বাদ করিতেছিলেন ; কথনও গো
কথনও সখীসেবা, ভোজনবিলাস প্রভৃতি অভিনয় করিবা ভক্তবৃন্দ
পাগল করিয়া তুলিতে ছিলেন ; কথনও যমুনাতটে, কোনদিন গোবর্দ্ধ
বা রাধাকুণ্ডতীরে, কথনও বা নন্দগ্রাম, জাবট বা বর্ষাণে, তাঁহা
যে ক্রীড়াকৌতুকে বিহ্বল থাকিতেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না
এমন সময়ে একদিন অপরাহ্নে ৺গোবিন্দমন্দিরে যখন সকল ভক্ত
ভাগবত-কথা শুনিবার জন্য সমবেত, তখন সকল গোস্বামীর নির্ব্বাচন
বাণী শ্রীনিবাসের উপর পড়িল, সকলে তাঁহাদের তিনজনকে ডাক
অনুরোধ করিলেন, তাঁহারা শীঘ্র গৌড়দেশে গিয়া, গ্রন্থ ও ধর্ম্ম
করুন। অমনি শ্রীগোবিন্দের কণ্ঠের পুষ্পমালা অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া
পূজারী উহা প্রসাদ বলিয়া আনিয়া অশ্রুনেত্রে সর্ব্বসমক্ষে শ্রীনিবাসের কণ্ঠে
পরাইয়া দিলেন। ইহার উপর আর কি কথা আছে? শ্রীনিবাস
কাঁদিয়া আকুল, বৃন্দাবন ত্যাগ করাও কষ্ট, অথচ গুরুজনের আদে
পরমগুরু মহাপ্রভুর ইচ্ছা, সকলেই মনে পড়িল ; অবশেষে তিনি
হইলেন। স্থিরীকৃত হইল, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সঙ্গে যাইবেন
তাঁহাদের গুরুদেবেরাও অনুমতি দিলেন। শ্রীজীবের সুব্যবস্থিত যত্ন
কার্য্যে পরিণত হইবার মত হইল।

কল্পনা স্থির হইল বটে, কিন্তু আবশ্যক আয়োজন করিবেন কে
সে বিষয়ে কাহারও কোন দ্বিমত ছিল না। শ্রীজীব যে আয়োজন
কর্ত্তা, তাহা সকলে জানিতেন এবং তিনিই এপর্য্যন্ত সকল ভক্তের
নিকট প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটি গুছাইয়া তুলিয়াছেন।
কলকাটি তাঁহার হাতে, বাহিরেও তিনিই ব্যবস্থাপক।
ব্যয়সাধ্য এবং লোকজনও চাই। শ্রীজীব মথুরা ও আগ্রা হইতে
কয়েকজন ধনী মহাজনকে ডাকাইলেন ; উহারা তাঁহার অনুরক্ত

ার আদেশ পালন করিবার জন্য সতত ইচ্ছুক, কিন্তু শ্রীজীব কোন
াগ দিতেন না। কারণ তিনি নিস্পৃহ, নিজের জন্য কিছুই
না করেন না। এইবার সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের কর্ত্তব্য—সাধারণের
্য। সুতরাং উহাদের সাহায্য চাহিতে, তাহাদিগকে কৃতার্থ করিতে
করিলেন না। তাহাদের সাহায্যে রাজধানী হইতে রাজপত্র
া হইল, উহাতে বৃন্দাবন হইতে যাজপুর পর্য্যন্ত ঝাড়িখণ্ডের পথে
বার রাজাদেশ লেখা ছিল। তিনজন মহাজন সমস্ত ব্যয়ভার
ন্দে বহন করিতে সম্মত হইলেন। স্থির হইল, একখানি গরুর
ীতে গ্রন্থগুলি যাইবে, অন্যখানিতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ
বেন।" দশজন অস্ত্রধারী হিন্দু তাহাদের সঙ্গে প্রহরী স্বরূপ
বে। গাড়োয়ান দুইজন ধরিয়া সর্ব্বসমেত লোক সংখ্যা হইল
জন, তাহাদের পথের সমস্ত ব্যয়ের টাকা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সঙ্গে দিবার
া হইল।

গ্রন্থ অনেকগুলি; সনাতন, রূপ ও জীবের গ্রন্থ-সমূহ; কবিরাজ
ামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যভক্তগণের গ্রন্থরাজি—সব
পৃথক্ বান্ধিয়া গ্রন্থভার চারিটি হইল; একটি কাষ্ঠের সম্পুট বা
ক প্রস্তুত করাইয়া শ্রীজীব তন্মধ্যে সযত্নে গ্রন্থ ভারগুলি সাজাইয়া
য়া সর্ব্বজন সমক্ষে কুলুপ দিলেন এবং জলবৃষ্টির ভয়ে সিন্দুকটি
করিয়া মোমজামা দিয়া সমাবৃত করিলেন। *

যাইবার শুভদিন স্থির হইয়াছিল—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপঞ্চমী
তে। সে দিন প্রাতঃকালে ৪টি বলদসহ দুইখানি গাড়ী ও
জন আসিয়া পৌঁছিল। অনেক লোকে ধরিয়া সিন্দুকটি একখানি
র উপর উঠাইয়া ঠিক মত বাঁধিয়া রাখিলেন এবং গাড়ীখানি

* ভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠ, ৪৮৬-৭ পৃঃ, প্রেম-বিলাস, ১৩শ, ৯০-৯১ পৃঃ।

শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের সম্মুখে আনা হইল। তৎপূর্ব্বেই গোস্বামী প্রভু এবং বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব ভক্তেরা সকলে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ ভূগর্ভ, রাঘবপণ্ডিত, যাদবাচার্য্য, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, মধুপণ্ডিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হরিদাস, পুণ্ডরীকাক্ষ প্রভৃতি সকলেই আসিলেন, সর্ব্বত্র সাঁড়া পড়িয়াছিল, বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়া ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন। শ্রীগোবিন্দের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা হইল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে শেষে গাড়ী চালাইবার আদেশ হইল; সজলনেত্রে ভক্তগণ সকলে পশ্চাতে পশ্চাতে অনেক দূর চলিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বহু বৎসর বৃন্দাবনে থাকিয়া চরিত্রগুণে এমন ভাবে সকলের প্রাণের ধন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার কালে কেহই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

গাড়ী বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরার দিকে চলিল। পথের পাশে নরনারী সহস্র স্ত্রীপুরুষ সমবেত হইয়া শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল। শ্রীজীবের উৎসাহের অবধি নাই; তিনি, রাঘবপণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি কয়েকজনে মথুরা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকথা-রসে অতিবাহিত করিলেন; প্রভাতে মথুরা ছাড়িয়াও কতক দূর পর্য্যন্ত গিয়া সকলে পরস্পর বিদায় লইলেন। ভক্তের অশ্রুপাতে রাজপথের ধূলি সিক্ত হইল, সে দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। আমাদের এই কঠোরতার যুগে তাহা ধারণা করা সহজ নহে। কিরূপে ভক্তিপ্রস্রবণ তুল্য অনর্গল হয়, তাহা সেই যুগের ভক্তেরা দেখাইয়া গিয়াছেন। শুভচিন্তা ও উদ্বেগ লইয়া একটা প্রধান কর্ত্তব্য সাধিত হইতে চলিল বলিয়া আত্মপ্রসাদ লইয়া, শ্রীজীব অন্য ভক্ত বৃন্দাবনে ফিরিলেন।

গ্রন্থ-সঙ্কলন।

[১]

গোস্বামিগণের মধ্যে সকলেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তবুও কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, উঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ জীব পাণ্ডিত্যে সকলের বড়। একে তিনি আবাল্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, ক্ষ বুদ্ধিশালী ও অত্যন্ত মেধাবী; তাহাতে শৈশব হইতে বিদ্যালাভের নৈষ্ঠিকী প্রবৃত্তির সহিত সকল সুযোগও জুটিয়াছিল। জ্যেষ্ঠতাত গেব ভক্তি ও ত্যাগের মহিমা তাঁহাকে সংসার হইতে শাস্ত্রের দিকে লইয়াছিল। স্বগৃহে ও কাশীতে উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট উমত শিক্ষালাভের পর, তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া গোস্বামীবৃন্দের লকেই শিক্ষাগুরুরূপে পাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত সনাতনের উতা, ও দীক্ষাগুরু রূপের কবিত্ব তিন পৈতৃক সম্পত্তির মত লাভ রন। ভক্তি-শাস্ত্র শুধু অধ্যয়ন করার সুযোগ নহে, জেষ্ঠতাতদিগের রচনাকালে নানা ভাবে সাহায্য করিতে গিয়া শাস্ত্রের নাড়ী-নক্ষত্র মলকবৎ তাঁহার করায়ত্ত হইয়া গিয়াছিল; বৈজ্ঞানিক কর্মশালার মত র ক্ষেত্রে উহাদের ক্ষিপ্র প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত স্থাপনা তাঁহার স্বভাব হইয়াছিল। এজন্য নূতন গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা অন্যকৃত গ্রন্থের ভাষ্য টীকাটিপ্পনী রচনায় তাঁহার অধিকতর প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। তীয় মনস্বী ভক্তগণের নিত্য সংসর্গে থাকায় স্বভাবতঃই তাঁহার নর পরিধি বহুবিস্তার লাভ করিয়াছিল। রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ র শয্যাসনের চতুঃপার্শ্বে স্তূপীকৃত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা উন্মুক্ত য়া, কখনও পাঠ বা সন্ধানে রজন্য, কখনও অধ্যাপন বা গ্রন্থরচনার তাঁহার সাংসারিক তৈজস পত্রের মত হইয়া গিয়াছিল, আর

বৃন্দাবনের মত পুণ্যধামে বাস করিয়া, সাধকের মত পূতচরিত্রে বিচিত্র শাস্ত্র-চর্চ্চায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন—৬০ বৎসর কাল, জীবনের ঐকান্তিক সাধনায় তাঁহার প্রণীত, সঙ্কলিত বা ব্যাখ্য গ্রন্থরাজির সংখ্যা অনেক হইয়াছিল। উহার সকল পরিচয় এখন আমরা জানি না; প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে যাহার নামের সন্ধান পাছি হয়তঃ চক্ষুতে তাহা দেখিবার সুযোগ হয় নাই; অনেক গ্রন্থ এখন মুদ্রিত হয় নাই, বা কখনও কোথায়ও হইয়া থাকিলে এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যাহা বা পাওয়া যায়, তাহার তত্ত্বোদ্ধার করা, গ্রন্থের সন্ধান করা বহু পণ্ডিতেরই গণ্ডীর বাহিরে, আমাদের মত লোকের ত কথাই নাই। তবুও যাঁহার সমস্ত জীবনটাই গ্রন্থ-সঙ্কলনে ব্যাপৃত, তাঁহার জীবন-কথা বলিতে গিয়া তাঁহার গ্রন্থরাশির কোনরূপ একটা পরিচয় না দিলে চলে না। সম্ভবমত সংক্ষেপে উহারই চেষ্টা করিতেছি।

"শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত"—ইহাই বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবের নিজকৃত এই গ্রন্থ-তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতিষ্বতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা॥
তৎসূত্র মালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী॥
রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধব মহোৎসবঃ।
সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থ সূচকঃ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ॥
তথা চাগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রী-বিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ॥

লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যা করপদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী
সন্দর্ভাঃ সপ্তবিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ॥
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাস্য এব চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যসপ্তমঃ স্মৃতঃ॥
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ং।
হস্তামলকবদ্‌যেষু সদ্ভিরাদৌঃ প্রকাশিতম্॥ ইত্যাদয়ঃ।

এই তালিকার তাৎপর্য্য হইতে শ্রীজীবের গ্রন্থাবলীকে এইভাবে শ্রেণিবিভক্ত করিতে পারি।

ব্যাকরণ গ্রন্থ।

(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) সূত্র-মালিকা, (৩) ধাতুসংগ্রহ।

সংগ্রহ ও স্তব-গ্রন্থ।

(৪) কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা, (৫) গোপালবিরুদাবলী, (৬) শ্রীমাধব-মহোৎসব, (৭) শ্রীসঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ, (৮) ভাবার্থচম্পূ, (৯) রসামৃত-শেষ, (১০) পদ্ম-পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণ পদ চিহ্ন, এবং (১১) শ্রীরাধিকার কর-পদ্ম-চিহ্ন।

লীলা গ্রন্থ।

(১২) শ্রীগোপালচম্পূ (পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ)

টীকা গ্রন্থ

(১৩) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, ১৪। গোপাল তাপনী উপনিষদের টীকা, (১৫) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ("দুর্গমসঙ্গমনী") টীকা, (১৬) উজ্জ্বল

নীলমণির (লোচন-রোচনী) টীকা, (১৭) যোগসারস্তবের ; এবং (১৮) অগ্নিপুরাণোক্ত শ্রীগায়ত্রীবিবৃতি বা ভাষ্য।*

সন্দর্ভ বা বিচার গ্রন্থ

(১৯—২৪) তত্ত্ব সন্দর্ভ, ভগবৎ সন্দর্ভ, পরমাত্ম সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ স ভক্তি সন্দর্ভ ও প্রীতি সন্দর্ভ নামক ষট্ সন্দর্ভ এবং (২৫) "ক্রম সং নামক সমগ্র ভাগবতের টীকা।

ইহা ব্যতীত শ্রীজীবের আরও অনেক গ্রন্থ ছিল, তালিকার "ইত্যাদয়ঃ" কথায় উহা বুঝা যায়। এই তালিকার বহির্ভূত একখ সার গ্রন্থের নাম—"সর্ব্বসম্বাদিনী"। তবে উহাকে পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়া প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা বা প্রপূর্ত্তি বলিলেই চ এইজন্য বোধ হয় তালিকায় উহার নাম নাই। সন্দর্ভগুলি প্রণয় পর গ্রন্থকার উহার প্রথম চারিখানির মধ্যে যে যে স্থলে শাস্ত্রপ্র ও সিদ্ধান্ত সমূহ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, বা অন্যের তর্কবিচারের উত্তরে যে সব শাস্ত্রপ্রমাণ নূতন ভাবে উদ্ধৃত ক নিজ মত দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন, তাহাই এই সর্ব্বসম্বাদিনী নামক বিচার গ্রন্থকে সমলঙ্কৃত করিয়াছে। †

---

* শ্রীজীবকৃত "ক্রমসন্দর্ভ" নামক সমগ্রভাগবতের টীকা এই শ্রেণীতে উল্লেখ উচিত। কিন্তু উহা সন্দর্ভের অন্তর্গত বলিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

† সম্প্রতি "সাহিত্য-পরিষদ" হইতে এই সর্ব্বসম্বাদিনীর এক সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সম্পাদন কালে বৈষ্ণব সাহিত্যের পণ্ডিত অশেষ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় বিবৃতি রচনায়, পাঠোদ্ধারে ও অনুবাদে এবং আকর-গ্রন্থসমূহের প্রকৃত সন্ধান করিতে গিয়া যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিপুল পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সাধুতা ও গবেষণার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আধুনিক যুগে একান্ত দুর্লভ।

এই তালিকায় শ্রীজীবের "লঘুতোষণীর"ও উল্লেখ নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের কেবল মাত্র দশম স্কন্ধ বা শ্রীকৃষ্ণখণ্ডের "বৈষ্ণব-তোষণী" নামক অপূর্ব্ব বিস্তৃত টীকা করেন। তার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১২১ পৃঃ)। সনাতনের নিজ আদেশে শ্রীজীব ঐ টীকার সংক্ষেপ করিয়া আরও সরল ভাষায়, বহুবৎসর র (১৫০০ শকে) যে টীকা সমাপ্ত করেন, তাহাই লঘুতোষণী নামে রচিত, কারণ উহা হইতে বিশেষ করিবার জন্য সনাতনের টীকার ম রাখা হইয়াছিল, "বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণী।" লঘুতোষণীকে শ্রীজীব জ গ্রন্থ-তালিকায় স্থান দেন নাই, অথচ এই গ্রন্থেই সনাতনের বংশরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উহা হইতেই জানিতে পারি, ইঁহারা কত বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ, নতুবা পাষণ্ডীরা তাঁহাদিগকে বর্ণান্তরীয় বা ম্লেচ্ছ য় উড়াইয়া দিত।

তালিকাভুক্ত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে শ্রীজীব কৃত "হরিনামামৃত ব্যাকরণ" খানি বৃহৎ অদ্ভুত গ্রন্থ। গয়াধামে বৈষ্ণব-দীক্ষার পর নবদ্বীপে রয়া গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভাবে কিছুদিন ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ াইয়াছিলেন, ব্যাকরণের সূত্রব্যাখ্যাকালে যে ভাবে সঙ্গে সঙ্গে শলে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া ছিলেন, শ্রীজীব কল্পনাবলে সেই ভাবে নুশাসন সংগ্রহকালে হরিনামামৃত প্রচার করিয়াছেন। সূত্রমালিকা াতু সংগ্রহ—এই ব্যাকরণেরই অঙ্গীভূত।

সংগ্রহ ও স্তবগ্রন্থগুলি অধিকাংশই প্রকাশিত হয় নাই। টীকা গুলি মূলগ্রন্থের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীরূপকৃত রসামৃত- ও উজ্জ্বল নীলমণির টীকার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। া মূলবিষয়কে নবালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। লীলাগ্রন্থমধ্যে াল চম্পূ শ্রীজীবের শেষজীবনের বিরাট গ্রন্থ। গদ্যপদাময় কাব্য-

জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত করান। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণের গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই সকল সন্দর্ভ রচনা করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার বিচারফল সমূহ কতক ক্রমানুসারে বর্ণিত হইয়াছিল, কতক বিপর্য্যস্ত ভাবে ছিল; কতক মত অন্য দ্বারা খণ্ডিত হইতেছিল। এজন্য শ্রীজীব সেগুলি পুনরায় পর্য্যালোচনা করতঃ শাস্ত্রানুশাসন মত স্থাপন করিয়া বিষয়াদির যথাযথ সন্নিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে লখিয়াছিলেন। দৈন্য-মণ্ডিত গ্রন্থকার নিজকে জীবক বা ক্ষুদ্রজীব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এখানে জীব শব্দের দুই অর্থই হয়।

সন্দর্ভগুলি প্রধানতঃ ছয়টী:—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি। এইজন্য ইহাদিগকে ষট্ সন্দর্ভ বলে। ই সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীজীব পরে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের যে "ক্রমসন্দর্ভ" বিখ্যাত টীকা রচনা করেন, তাহা লইয়া "সন্দর্ভাঃ" সপ্তবিখ্যাতাঃ। সপ্তসন্দর্ভই শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বব্যাখ্যা স্বরূপ, এজন্য ইহাদিগকে একত্রে "ভাগবতসন্দর্ভ" বলে। শাস্ত্রমতে সন্দর্ভ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এই:* যাহাতে গূঢ় অর্থের প্রকাশ হয়, উক্তির সারবত্তা থাকে ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়, যাহাতে নানা অর্থের সমাবেশ ও জ্ঞানের বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই সন্দর্ভ বলে।

এইরূপ কোন সন্দর্ভ রচনাকালে গ্রন্থকারগণ শ্রোতৃবর্গের রুচি উৎপাদনের জন্য গ্রন্থের অনুবন্ধ নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে চারিটি প্রসঙ্গ থাকে: বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। সপ্তসন্দর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই

* "গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥"
শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এই পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করেন।

র সহিত গ্রন্থের বাচ্য বাচকতা সম্বন্ধ,—অর্থাৎ তিনিই বাচ্য বা বর্ণনীয় এবং গ্রন্থ তাঁহারই বাচক বা মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন রণই গ্রন্থের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য এবং প্রেমই প্রয়োজন বা শেষ পদার্থ। এই প্রসঙ্গগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীজীবের সন্দর্ভগুলি ীত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই সন্দর্ভগুলির মুখ্য প্রতিপাদ্য গুলি কি কি।

বেদার্থ নির্ণায়ক ইতিহাস পুরাণাদি লইয়াই পরমার্থ বিচার করা উচিত। ক পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উহাই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ না গ্রন্থকার ব্রহ্মসূত্রের পৃথক্ ভাষ্যরচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া ভাগবতেরই ভাষ্যস্বরূপ সপ্তসন্দর্ভ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে তত্ত্বসন্দর্ভে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া পরে প্রাচীন আচার্য্যগণের বহুমতের ন পূর্ব্বক জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে। ঈশ্বর মায়ার জীব মায়া দ্বারা মোহিত; পরমেশ্বরের সাধন-ভক্তি বা ভজনই মায়ার নিবারক এবং তিনিই পরম প্রেমের পাত্র। এই পরমেশ্বরই ন শ্রীকৃষ্ণ—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।" তত্ত্বসন্দর্ভে সামান্যাকারে ই তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।*

ীয় বা ভগবৎ-সন্দর্ভে ব্রহ্ম ও ভগবানের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সঙ্গে ভগবানের আবির্ভাব হইতে পারে কিনা, বৈকুণ্ঠ কাহাকে বলে, শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব ও পূর্ণত্ব কিরূপ,—এই সকল বিষয় আলোচিত । ৩য় বা পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীভগবানের লীলার প্রয়োজনীয়তা ত হইয়াছে। ৪র্থ বা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই

* তত্ত্ব-সন্দর্ভে বলদেব বিদ্যাভূষণ ও অদ্বৈতবংশীয় রাধামোহন গোস্বামি টীকা আছে। এই দুইটি টীকা ও শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর অনুবাদ গ্রন্থের একটি সুন্দর শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে।

স্তরে স্তরে ভক্তি যখন প্রেমে পৌছায়, তখন অন্তরে বাহিরে ভগবদনুভব হয়, ইহারই নাম সাক্ষাৎকার। সেই ভগবদনুভবময় প্রেম আনন্দ-স্বরূপ, সে আনন্দ লাভ হইলে।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥"*

অর্থাৎ তখন সকল অহঙ্কার ধ্বংস হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং জন্মজন্মান্তরের সকল কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন "এই সকল কারণে পণ্ডিতবর্গ পরমানন্দে ভগবান বাসুদেবে চিত্তপ্রসন্নকারিণী ভক্তি সতত অর্পণ করিয়া থাকেন।" †

সন্দর্ভগুলিতে যে সব তত্ত্বের বিচার করিয়া শ্রীজীব নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই আলোকপাতে তিনি সমগ্র দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি নব সুন্দর টীকা প্রণয়ন করেন, উহারই নাম "ক্রমসন্দর্ভ" এবং উহা ষট্সন্দর্ভের শেষ ফল। সুতরাং শুধু তাঁহার গ্রন্থরাশি কেন, তাঁহার পিতৃব্যদ্বয় এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কোথাও কোন মতের অনৈক্য নাই। মতবাদগুলি লইয়া যে সকল তর্ক বা পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, তাহার বিচার করিয়া, প্রচলিত সাধারণের অজ্ঞাত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সাম্প্রদায়িক ভাষ্যাদি হইতে স্বমতের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের উক্তির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমন্বয় এবং রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সব সন্দর্ভের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণোপাসক ব্যতীত কাহাকেও ঐ রহস্যপূর্ণ

---

* ভাগবত, ১ম স্ক, ২য়, ২১ শ্লোক। মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য়-৮১।

† অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ভাঃ ১, ২, ২২।

গ্রন্থ দেখিতে নিষেধ করিয়া শপথ অর্পণ করিয়াছেন।* এবং ষট্‌সন্দর্ভে প্রত্যেক খণ্ডের, ক্রম সন্দর্ভের প্রত্যেক স্কন্দের শেষে, তিনি ভক্তিভারাবনত চিত্তে শ্রীরূপসনাতনের উপদেশ বাণীর জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। † শ্রীজীব রূপ-সনাতনের ভারতী গর্ভে নিজ শক্তি নিমগ্ন রাখিলেও ভারতে তাহারই ভারতী তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে

(৫)

জীবনের অপরাহ্ণ।

শ্রীজীব গোস্বামী মথুরা হইতে শ্রীনিবাস প্রভৃতিকে গ্রন্থ-সম্পুট সহ বিদায় দিয়া বৃন্দাবনে ফিরিলেন। কিছুদিন ধরিয়া গোস্বামীদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে গ্রন্থ-প্রচারের কথাই একমাত্র আলোচনার বিষয় হইত। এদিকে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বিদায়ের পর চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে রাজপথ বাহিয়া চলিলেন। দশজন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারা

* "যঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ॥" তত্ত্ব. ৬৩।

† সাধারণতঃ শ্রীজীবের ভাষা দার্শনিকের ভাষার মত কঠোর হইলেও ঐ সমাপ্তিবাক্যে ভাব ও মাধুর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে—"ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব-চরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-সভাজন-ভাজন শ্রীরূপ সনাতনানুশাসন ভারতীগর্ভে" ইত্যাদি, অর্থাৎ কলিযুগপাবনকারী নিজ ভজন প্রচারই যাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুগত ভক্ত এবং বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার একান্ত সৎকারের পাত্র শ্রীযুক্ত রূপসনাতনের উপদেশ বাণীর মধ্যে......... সমাপ্ত হইল।

াড়ী চলিতে লাগিল, ভক্তেরা বৃন্দাবনের স্মৃতি ও কৃষ্ণকথা লইয়া
ানন্দে চলিতে লাগিলেন। সম্পুটের গর্ভে ধনরত্ন বা যাহাই থাকুক,
কহ তাহার খোঁজ লইল না; রাজাদেশ-পত্র তাহার পথ উন্মুক্ত
াখিল। ক্রমে তাঁহারা আগ্রা হইয়া ইটোয়ায় পৌঁছিলেন এবং সেখান
ইতে রাজপথ ছাড়িয়া ঝাড়িখণ্ডের বনপথে প্রবেশ করিলেন। এই
থই তাঁহাদের প্রিয় পথ, কারণ এই বনপথ দিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দা-
নে গমনাগমন করিয়াছিলেন। এই পথ দিয়া বহুলোক পুরীতে
গন্নাথ দর্শনে যাইতেছিল, তাঁহারা সেই যাত্রীদিগের সঙ্গ ধরিলেন।

"নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া।
সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া"

ভঃ রঃ ৫৮৮ পৃঃ

। পথের বা কি শোভা! সে পক্ষিকলরবে মুখরিত, বৃক্ষছায়া
মণ্ডিত নির্ঝর নিষেক-নিষেবিত মৃগময়ূর-বিচিত্রিত বিচিত্র আরণ্য
। ভক্তগণ কৃষ্ণরসে ভরপূর হইয়া প্রেমানন্দে চলিলেন। গাড়ীতে
দ্যাদি ছিল, সঙ্গে লোক ছিল, পান ভোজনের কোথাও কোন অসুবিধা
ইল না। এইভাবে তাঁহারা পঞ্চকোটে আসিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্যের
মায় উপনীত হইলেন।

তখনও বিষ্ণুপুর স্বাধীন রাজ্য। ইহার অপর নাম মল্লভূমি, রাজারা
। নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পর পর ৪৭
। মল্লরাজের পর এক্ষণে হাম্বীর মল্ল বিষ্ণুপুরের অধীশ্বর এবং মোগল
মলের ভূঞা নৃপতি। তাঁহার পরিখা বেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল,
ক্ষিত সৈন্য ছিল, দল মাদলের * মত বড় বড় কামান ছিল, প্রজারা

* এই কামান এখনও বিষ্ণুপুরে অক্ষত শরীরে আছে। উহার নাম দলমর্দ্দন,
রণ ভাষায় দলমাদল। দৈর্ঘ ১২½ ফুট, মুখবিবর ১১½ ইঞ্চি

বশীভূত ছিল, দেশে বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। মোগল সৈন্য তখনও তাঁহার রাজ্যসীমায় আনাগোনা আরম্ভ করে নাই। রাজার সৈন্যেরা বসিয়া থাকিত, কর্ম্মের অভাবে দস্যুতা করিত। রাজা শুধু দস্যুদের প্রশ্রয় দেওয়া নহে, কোন কোন সময়ে লুণ্ঠনের অংশভাগী হইতে সংশয় বোধ করিতেন না। শ্রীনিবাস গ্রন্থ রাশি লইয়া এই মল্লরাজের রাজ্যমধ্যে পড়িলেন। পঞ্চকোট বামে রাখিয়া তাঁহারা রঘুনাথপুরে আসিলেন, উহার নিকট মালিয়াড়া গ্রামে এক ভৌমিকের বাড়ীতে রাত্রি বাস করিলেন। রাজার কানে সংবাদ গেল। রাজগণকেরা পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই সময়ে এক ধন যান তাঁহার রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমা দিয়া চলিয়া যাইবে। শুনিলেন, গাড়ীর উপরে সিন্ধুকে সোনামাণিক অনেক আছে, সঙ্গে মাত্র সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন লোক। রাজা কহিলেন এই সিন্ধুক লুটিতে হইবে কিন্তু দেখিও যেন নরহত্যা না হয়।

দুইশত লোক লইয়া করহ গমন”
প্রাণে নাহি মারিবা আনিবে সব ধন॥

প্রে, বি, ১৩শ

পরদিন সন্ধ্যাকালে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সাজিয়া আসিল; ভক্তেরা গোপালপুর গ্রামে আসিয়া দুই প্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত কৃষ্ণ কথা কহিয়া ক্লান্ত দেহে নিদ্রিত হইলেন। এমন সময়ে দস্যুরা আসি গাড়ী লুটিয়া লইয়া গেল, লোক মারিল না। রাজবাটীতে লইয়া দুর্ব্বৃত্ত সিন্ধুক ভাঙ্গিলে দেখা গেল, ধনরত্ন নাই, ভারে ভারে পুঁথি সাজান আছে। রাজা বিস্মিত হইলেন, রহস্য বুঝিলেন না। জিজ্ঞাসায় জানিলেন কোন লোক হত্যা করে নাই।

এদিকে শ্রীনিবাস ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় কাঁদিয়া আকুল হইলেন

স্বদেশবাসীর জন্য কিরূপ ভাবে কাঁদিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জীব গোস্বামী গ্রন্থচুরির সংবাদে ব্যথিত হইলেন, কিন্তু মথিত হইলেন না। গ্রন্থচুরি করিয়া দস্যুদিগের কি লাভ, তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর। এ ব্যাপারের মধ্যে কিছু রহস্য আছে, তাহা তিনি বুঝিলেন এবং ভাবিলেন শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছাই পুর্ণ হউক।

এদিকে শ্রীনিবাস দুই একদিন মধ্যে অনেক বলিয়া কহিয়া শোকাকুল নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, জীব-উদ্ধার ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের প্রধান ভার গোস্বামীরা প্রধানতঃ তাঁহাদের উপর দিয়াছেন। * সে কর্ত্তব্যের তাহারা অবহেলা করিতে পারেন না। গ্রন্থ প্রচারের ভার ছিল তাঁহার নিজের উপর, সে জন্য তিনি দায়ী, সুতরাং নিজে থাকিয়া লুণ্ঠিত গ্রন্থ রাশির অনুসন্ধান করিবেন, কৃতকার্য্য না হইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। যাঁহাদের কান্না দেখিলে পাষাণ গলে; কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ গৌড়ে খেতরির দিকে চলিয়া গেলেন। শ্রীনিবাস পাগলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চুরির সন্ধান লইতে লাগিলেন। তিনি কৃষ্ণবল্লভ নামে এক বিপ্রের নিকট শুনিলেন বীর হাম্বীর এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক; রাজবাটীতে

"দিবায় পুরাণ পাঠ, রাতে চুরি ডাকাতি।
পুত্র সম পালে প্রজা, দেশের না করে ক্ষতি ॥"

প্রে, বি,

নিত্য পুরাণ পাঠ হয়, এই সংবাদই শ্রীনিবাসকে পন্থা দেখাইল। তিনি

দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন প্রাণত্যাগ ঘটে নাই। তিনি স্বপ্নাদেশে গ্রন্থ প্রাপ্তি আশায় বাঁচিয়া রহিলেন এবং পরে গ্রন্থ রাজির উদ্ধারের সুসংবাদ শুনিয়া আনন্দে অপ্রকট হন। তৎপুর্ব্বেই দাস গোস্বামী অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

* শিশির কুমারের শ্রীনরোত্তম চরিত, ৪৫ পৃঃ

দেউলী গ্রামে উক্ত কৃষ্ণবল্লভের গৃহে থাকিয়া বিকালে উহার সঙ্গে রাজবাটীতে যাইয়া পুরাণ পাঠ শুনিতে লাগিলেন। তখন ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করা চলিতেছিল; কিন্তু পাঠও হয় না, ব্যাখ্যাও কুব্যাখ্যা চলিতেছিল। দ্বিতীয়দিন শ্রীনিবাস একটু প্রতিবাদ না করিয়া পারিলেন না। তখন সকলে তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সুযোগ আসিল, তিনি আসনে বসিয়া স্বীয় অসামান্য পাণ্ডিত্যের বিকাশে এবং আত্যন্তিকী ভক্তির আবেশে যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিলেন, তেমন সেদেশে কেহ কখনও শুনে নাই। সভাস্থল নয়নজলে ভাসিল, পাষাণ ও যেন গলিয়া বাহির হইল। রাজা বীর হাম্বীর নিজেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার সহিত সেই দিব্যমূর্ত্তি পাঠকের কথোপকথন হইল; গ্রন্থচুরির বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার একটি রহস্য মিটিল, তিনি শ্রীনিবাসকে লইয়া গিয়া লুণ্ঠিত গ্রন্থগুলি সিন্দুক খুলিয়া দেখাইলেন এবং প্রত্যর্পণ করিলেন। অগ্রে কৃষ্ণবল্লভ ও পুরাণ-পাঠক এবং পরে রাজা স্বয়ং শ্রীনিবাসের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

রাজা শুধু দীক্ষিত হওয়া নহে, এইদিন হইতে তিনি বঙ্গদেশে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান হেতু হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা স্বতন্ত্র; তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায়ের মধ্যে মনুষ্য-বুদ্ধি প্রবেশ করে না। গোস্বামীরা গ্রন্থ প্রচারের ভার এক কৌপীনধারী নিঃসম্বল বৈষ্ণবের উপর দিয়াছিলেন। রাজানুগ্রহ ব্যতীত উহা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তাই গ্রন্থ চুরি হইল, উহারই ফলে একজন স্বাধীন রাজা ও তাঁহার রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দ ক্রমে সকলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য ঠাকুর রাজাচার্য্যরূপে সমগ্র দেশবাসীর নয়ন পথে পড়িয়া ভক্তিভাজন হইলেন; লোকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল, দেশে ভক্তির বন্যা বহিল। বিষ্ণুপুর এই ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র হইল; একদিন এমন হইয়াছিল

যে, বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রজারা দিনান্তে একবার নামকীর্ত্তন না করিয়া অর্থাৎ "রাজার বেগার" না দিয়া রাজ্যে বাস করিতে পারিত না।* রাজবাটীর অসংখ্য কারুখচিত মন্দিরে ত কৃষ্ণসেবা বা চৈতন্য-পূজা হইতই, রাজ্যের ঘরে ঘরে কত শত মন্দির উঠিয়াছিল, বিগ্রহ-সেবা হইত, বৈষ্ণব গ্রন্থের চর্চ্চা হইত; লোকে কত গ্রন্থ কত স্থানে লইয়া গেলেও, এখনও চরিতামৃতাদি ভক্তি-গ্রন্থের প্রাচীন পুঁথি বিষ্ণুপুরের মত অন্যত্র পাওয়া যায় না। দস্যুরা গ্রন্থ চুরি না করিলে বুঝি ইহার কিছুই হইত না।

গ্রন্থগুলি পাইবা মাত্র শ্রীনিবাস দীর্ঘ পত্র লিখিয়া উদ্ধারের বিবরণ শ্রীজীব গোস্বামীকে দিলেন। যে গাড়ীসমেত গ্রন্থ চুরি হইয়াছিল, রাজা সেই গাড়ী পূরিয়া নানাবিধ উপাদেয় ফলমূলমিষ্টাদি নিজ লোক দ্বারা শ্রীনিবাসের পত্রসহ বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে সংবাদ দেওয়া হইল। সংবাদ যেদিন বৃন্দাবনে পৌঁছিল সেদিন শ্রীজীবের আনন্দ দেখে কে? তিনি আনন্দোৎফুল্ল ভাবে কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া সকল ভক্তকে সংবাদ দিতে লাগিলেন, আর গাড়ী হইতে দ্রব্যসম্ভার লইয়া মন্দিরে মন্দিরে ভোগের জন্য পাঠাইলেন। বৃদ্ধ গোস্বামীরা আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন; কিন্তু শ্রীজীবের আনন্দের তুলনা নাই। গ্রন্থ চুরি হওয়ায় তাঁহার মনে যে সমস্যা জাগিয়াছিল, তাহার সমাধান হইয়া গেল।

এদিকে শ্রীনিবাস রাজার প্রার্থনা মত একদিন রাজোপচারে গ্রন্থ

* রাজা হাম্বীর মল্লের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা গোপাল সিংহের সময়ে প্রজাদিগকে এইরূপ "রাজার বেগার" দিতে হইত। এই গোপাল সিংহ অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর বৃত্তি-দান করিয়াছিলেন, ঐরূপ ব্রহ্মোত্তর বা "গোপাল সিংহী" যুক্ত দানপত্র না পাইলে বিষ্ণুপুরে কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেন না। "History of Bishnupur Raj", P. 55.

ন্ত্রর পূজা করিলেন। দীক্ষার পর তিনি রাজার নাম রাখিয়াছিলেন রিচরণ দাস", শ্রীজীব তাঁহার ভক্তির পরিচয় পাইয়া নাম রাখিলেন তন্ত দাস। পুরাণ-পাঠকের নূতন নাম হইল ব্যাসাচার্য্য, এখনও ষ্ণুপুরে তাঁহার বাড়ীর চিহ্ন আছে। এই ব্যাসাচার্য্য স্বহস্তে যে শ্রীচৈতন্য রিতামৃতের নকল করেন, তাহা রাজভাণ্ডারের অমূল্য সম্পত্তি হইয়াছিল।* ন্তু রাজ-বাটীর সকল সম্পত্তির ধ্বংসের সঙ্গে এ সম্পত্তিও অন্তর্হিত য়াছে। আজ্ বিষ্ণুপুরের শ্মশান-মূর্ত্তি দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা য় না।

ইহার পর শ্রীনিবাস জাজিগ্রামে মাতার নিকট গেলেন। রাজগুরু ওয়া তাঁহার আর অর্থ কড়ির অভাব থাকিল না। পর বৎসর বঙ্গ, ৎকল, উড়িষ্যার সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ নরোত্তমের নিমন্ত্রণ পাইয়া তরীতে এক বিরাট উৎসবে যোগদান করিলেন। সে উৎসবের প্রধান চার্য্য শ্রীনিবাস; নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী তথায় উপস্থিত ছিলেন; ড়িষ্যা হইতে বহু শিষ্যসহ শ্যামানন্দ আসিয়াছিলেন; নরোত্তমের অত্যন্ত ন্তরঙ্গ ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ এবং তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ ন এই উৎসবের প্রাণ। এই সময় ঠাকুর নরোত্তম খেতরীতে ৬টি গ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন, উহার একটী শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ। এই উৎসব নেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। ঠাকুর মহাশয়ের মর্ম্মভেদী কীর্ত্তনে দেশে এক নবজীবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৫০৪ শকাব্দের ফাল্গুন সে এই খেতরী উৎসবের মত বৈষ্ণব-উৎসব আর কোথায়ও অনুষ্ঠিত য়াছে কিনা সন্দেহ। ঠাকুর নরোত্তমের মতন "কীর্ত্তন-লম্পট" কঠোর বোধ হয় আর নাই। সমস্ত উত্তর বঙ্গ, এমন কি মণিপুর পর্য্যন্ত

* এখন বিষ্ণুপুরে সে পুঁথি নাই, শুনিয়াছি ব্যাসাচার্য্যের বংশধরদের হস্তে অন্যত্র আছে। উহাতে গ্রন্থের বিশুদ্ধ তারিখ আছে।

বহুস্থান, ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যশাখায় পরিপূর্ণ। শত শত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ নরোত্তমের নিকট দীক্ষা লইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই ভা শ্যামানন্দ উড়িষ্যা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ জীবকে উদ্ধার করেন। তাঁ বিশিষ্ট বারজন শিষ্য হইতে প্রধান বারটি শাখা হয়। ঐ শিষ্যগণের সর্ব্বপ্রধান রয়নী নগরের রাজপুত্র রসিকমুরারি বা ঠাকুর গোঁসা রসিকানন্দ। সুবর্ণরেখা তীরবর্ত্তী গোপীবল্লভপুর উড়িষ্যার শ্যামান সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র হইল। শ্যামানন্দ জাতিতে সদ্‌গোপ হইলে হয়, ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বজাতি তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীনিবাস জাজিগ্রামে আসিয়া বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইলেন; বহু বৎস পরে বিষ্ণুপুরেও রাজার অনুরোধে অন্য একটি বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুর জাজিগ্রাম উভয়স্থানে তাঁহার বাড়ী ছিল। উভয় কেন্দ্র হইতে ভক্তি ছড়াইয়া তিনি সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন, একমাত্র নরোত্তম আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সমগ্র বঙ্গে তখন রাজার রাজপাট লইয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগলের সহিত বি সংঘর্ষ চলিতেছিল, কিন্তু তাহারই মধ্যে সমাজরূপ দুর্ভেদ্য কবচের ভক্তি-মন্দাকিনীর ক্ষীণধারা বহিয়াছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামান একদিন তিন জনে একসঙ্গে বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছিলেন, তিন গৌড় হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে প্রচারের ত্রিধারা বহা শ্রীচৈতন্য দেবের নিজ দেশকে ভক্তিসিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। জীবনে কুলায়, সে ত্রিধারার কাহিনী আর একদিন বলিব। এখানে দে প্রত্যঙ্গের মত এই তিন ভক্তের পরিচয় না দিলে, শ্রীজীবের পরিচয় হয় না, তজ্জন্য অতি সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

বৃন্দাবনে শ্রীজীব ছিলেন প্রচার কার্য্যের কেন্দ্র স্বরূপ, এই তিন তাঁহার অনুগত প্রচারক। এজন্য ইঁহাদের সহিত শ্রীজীবের যখন

পত্রের আদান প্রদান চলিত। ভক্তদের কোন সন্দেহ হইলে শ্রীজীবকে জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন নূতন উৎসব বা অনুষ্ঠান হইলে তাহার বিবরণ শ্রীজীবকে পাঠাইতেন, কোন ভক্ত কোন নূতন গ্রন্থ বা গীত রচনা করিলে তাহা শ্রীজীবকে উপহার দেওয়া হইত। তাঁহাকে না শুনাইলে, না জানাইলে, তাঁহার অনুকূল অভিমত না পাইলে, কাহারও কোন কার্য্য বা প্রচেষ্টা সার্থক বা তৃপ্তিপ্রদ হইত না। শ্রীজীবের সহিত বঙ্গীয় ভক্তগণের যে পত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহার কয়েকখানি পত্র "প্রেম-বিলাস" ও "ভক্তি-রত্নাকরে" উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা হইতে অনেক সংবাদের আভাস পাওয়া যায়। যে সব গ্রন্থ শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রথমবার বঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাই সব গ্রন্থ নহে, উহার পরেও ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রন্থ প্রেরিত হয়। কিছুকাল পরে বিষ্ণুপুরের ব্যাসাচার্য্যের পুত্র শ্যামাদাস আচার্য্য যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বৈষ্ণব-তোষণী টীকা, রসামৃতসিন্ধুর "দুর্গম-সঙ্গমনী" টীকা, এবং গোপাল চম্পূর উত্তর ভাগ শোধন ও বিচার করিয়া পাঠান হয়। হরিনামামৃত ব্যাকরণখানি শ্রীনিবাস লইয়া আসেন, উহা তখনও শোধিত হয় নাই। শ্রীজীব পত্রে লিখিলেন, যদি ঐ গ্রন্থ পড়ান হয়, তবে যেন ভাষ্যবৃত্তি দেখিয়া ভ্রমাদি সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। নরোত্তম ও রামচন্দ্র কবিরাজ নিত্যস্মরণ-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, রসামৃতসিন্ধুতে নিজ টীকার ব্যাখ্যাস্থান দেখাইয়া দিয়া, শ্রীজীব সংক্ষেপে উহার মীমাংসা করিয়া দিলেন এবং শ্রীনিবাসের নিকট উপদেশ লইতে বলিলেন। নরোত্তম এক নূতন কীর্ত্তন সুর আবিষ্কার করিয়া নিজে ও ভক্তদিগের দ্বারা ঐ সুরের বহু গান রচনা করিলেন। ইহাকেই 'গরাণ হাটি" বা গড়ের হাটের কীর্ত্তন বলে। [illegible]ণ গরাণহাটি পরগণায় নরোত্তমের ভজনস্থলী খেতরী অবস্থিত। [illegible]ত্তমের পদও কীর্ত্তন, গোবিন্দদাসের মধুময় পদাবলী প্রভৃতি

শ্রোত্রাভিরাম রচনা সকল শ্রীজীবকে উপহার দেওয়া হইত। শ্রীনিবা
আরও দুইবার এবং শ্যামানন্দ আর একবার সশিষ্যে বৃন্দাবন আসিলে
কিন্তু নরোত্তম আসিলেন না, তাঁহার আসিবার কথা ছিল না। এইভাবে
শ্রীজীব সুদূর বঙ্গ ও উড়িষ্যার সহিত তাহার গুরুত্বের সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিয়
জীবনের অপরাহ্ণে চৈতন্যদেবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনে একটি একটি করিয়া দীপ নির্ব্বাণ হইতেছিল
সনাতন, রূপ ও ভট্ট-রঘুনাথ পূর্ব্বে গিয়াছেন; সম্ভবতঃ তাহার কিছু
পূর্ব্বে বা পরে প্রবোধানন্দ অন্তর্হিত হন। শ্রীনিবাস প্রথম বার বৃন্দাবন
হইতে নিক্রান্ত হওয়ার পর ক্রমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভূগর্ভ গোস্বামী,
রঘুনাথ দাস ও পরে লোকনাথ এবং সর্ব্বশেষে (১৫১০ শকে) গোপাল ভট্ট
গোস্বামী দেহরক্ষা করিলেন। সে সব শোকের কর্ত্তা ক্রমে ক্রমে বঙ্গীয় ভক্ত
বৃন্দকে মর্ম্মাহত করিতেছিল। এখন থাকিলেন মাত্র শ্রীজীব। তাঁহার
তত্ত্বাবধানে সঙ্গোপিত গোস্বামিগণের অন্ত্যেষ্টি উৎসব ও সমাধির সুব্যবস্থা
হইল; তাঁহার প্রসন্নতার উৎসাহে রাজা মানসিংহ ৺গোবিন্দ দেবের
বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, উহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই
মন্দির ও অন্যান্য মন্দির শ্রীজীবের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে বিনির্ম্মিত হইয়া
গেল। শাস্ত্র-গ্রন্থ সঙ্কলনে ও প্রচারে, নবধর্ম্ম মতের বিপুল বিস্তারে এবং
দেব-বিগ্রহের নিমিত্ত সুদৃঢ় মন্দির রচনায় এই তিনভাবে বৈষ্ণব মতের
ভিত্তিমূল সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া সাধননিষ্ঠ কনিষ্ঠ গোস্বামী শ্রীজীব
একদিন ইষ্টধ্যান করিতে করিতে অন্তর্ধান করিলেন। * তাঁহার

---

* আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি শ্রীজীব, ১৪৩৩ শক (১৫১১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ ক
২৪ বৎসর বয়সে ১৪৫৭ শকে (১৫৩৫ খৃঃ) বৃন্দাবনে আসেন, তথায় ৬০|৬১
জীবিত থাকিয়া আঃ ১৫১৫ শকে (১৫৯৩ খৃঃ) অপ্রকট হন। প্রতি বৎসর
মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিন জীব গোস্বামীর তিরোধান মহোৎসব হয়।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর সমাধি

২৫৯ পৃঃ
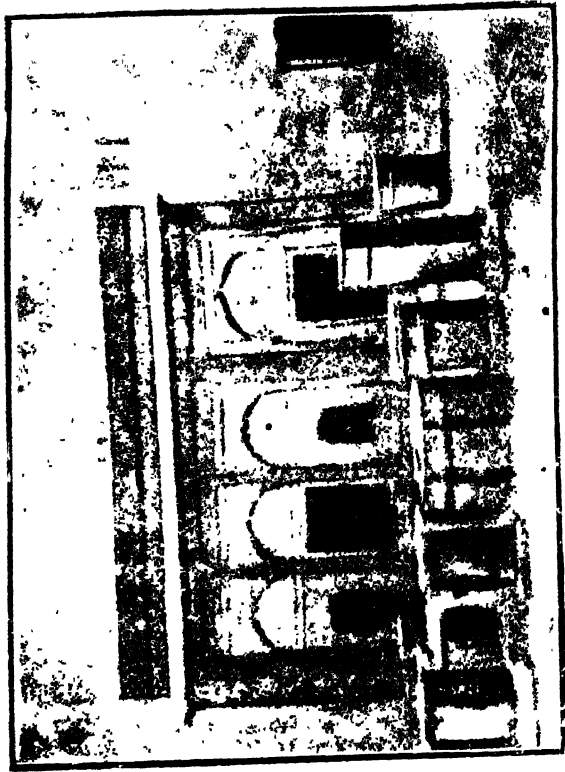
দেবতা ৺রাধা-দামোদরজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি গৃহে একপার্শ্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধির ব্যবস্থা তিনি নিজেই গ্না রাখিয়াছিলেন। উহারই পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে ক্তগণ শ্রীজীবের ত্যক্তদেহ মহাসমারোহে সমাহিত করিয়াছিলেন। ধগ্রন্থ তুল্য তিনি যাহার পূজা করিতেন তাঁহার সংগৃহীত, সঞ্চিত সেই ছ-সম্ভারও তাঁহার ইষ্ট-মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! কালের ঠোর বিধানে সম্পত্তিঘটিত নানা বিসম্বাদে অপরাপর অস্থাবর সম্পত্তির ত সে অমূল্য গ্রন্থরাজিরও বিলোপ ঘটিয়াছে। শ্রীজীব অন্তর্হিত লেন—রহিল তাঁহার অনন্ত উদ্যমের, অনন্ত ত্যাগের, অনন্ত সাধনার নন্ত কীর্ত্তি। কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি। যতদিন বৈষ্ণব ধর্ম্ম থাকিবে, দিন ভারতের ভক্তিগ্রন্থ বিশ্ব-বিদ্বৎ-সমাজে সমাদৃত হইবে, যতদিন ক্তগণ নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের অমৃতময় রসাস্বাদনে সমুৎসুক কিবেন, ততদিন শ্রীজীব চিরজীবী রহিবেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী

"সনাতনং প্রেম-পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপ-সখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভক্তামভীষ্টদম্॥"

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী

[১]

দাক্ষিণাত্যে

দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হিন্দুদিগের একটি অতীব পবিত্র স্থান। এই ক্ষেত্রের মধ্যদিয়া, যাঁহার নাম করিয়া জলশুদ্ধি করিতে হয় সেই সপ্ততীর্থ নদীর অন্যতম—কাবেরী প্রবাহিত। কাবেরী নদীর মধ্যবর্ত্তী একটি দ্বীপের উপর শ্রীরঙ্গম্ বা শ্রীরঙ্গ-পত্তন নগরী অবস্থিত। সেখানে একটি বিরাট মন্দির আছে; মন্দিরের মধ্যে মহাবিষ্ণুর যে বিজয়-মূর্ত্তি পূজিত হন, তাঁহার নাম শ্রীরঙ্গনাথজী এবং তাঁহার নামেতেই নগর ও প্রদেশের নাম হইয়াছে। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের মত বড় মন্দির ভারতবর্ষে আর নাই; দাক্ষিণাত্যের আরও অনেক মন্দির শিল্প-কল্পনায় ইহা অপেক্ষা বড় বটে, কিন্তু আকারে এবং বিগ্রহ-সেবার বিরাট আয়োজনে ইহা ভারতবর্ষের সকল মন্দিরকে পরাজিত করিয়াছে। এইস্থানে শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের প্রধান কেন্দ্র। শ্রীভাষ্য-প্রণেতা রামানুজ স্বামী এই স্থান কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্য শ্রীরঙ্গধাম সকল বৈষ্ণবের, সকল ভক্তের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরঙ্গমের অনতিদূরে কাবেরী তীরে বেলগুণ্ডী (বেলগুণ্ডী) গ্রামে শ্রীসম্প্রদায়-ভুক্ত এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিতেন। উঁহারা তিন ভ্রাতা,—জ্যেষ্ঠ বেঙ্কট ভট্ট, মধ্যম ত্রিমল্ল ভট্ট এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা

যখন অল্প বয়সে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া কাশীতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নাম হয় প্রকাশানন্দ। তাঁহার পূর্ব্ব নাম আমরা জানি না। "ভক্তমাল" গ্রন্থে আছে,—

"প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগ মার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদ স্তু পণ্ডিত যে শাঙ্করিক ভাষ্য মতে
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশে যাতে॥"

কাশীতে তিনি সকল দণ্ডী সন্ন্যাসীর গুরুতুল্য ছিলেন, তাঁহার মত পণ্ডিত কেহ ছিল না। অসংখ্য ছাত্র এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে বসিয়া অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিতেন। প্রকাশানন্দ ভক্তিপথ মানিতেন না, ভগবান হইতে আপনাকে অভিন্ন বলিয়া জানিতেন। সুতরাং আচারে প্রকারে তত্ত্ববিচারে তিনি শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। পুরীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং কাশীতে এই প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তিবাদের মহাপরাক্রান্ত শত্রু ছিলেন; এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ঘটনাচক্রে তাঁহাদের উভয়ের দর্পচূর্ণ করিয়া উভয়কেই আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা লওয়ার পর প্রকাশানন্দেরই নাম হইল প্রবোধানন্দ—তখন তিনি কাশীর পাণ্ডিত্যের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে ভক্তির নিলয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

প্রকাশানন্দ যৌবনে সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার কুলগত বৈষ্ণবাচারে অশ্রদ্ধা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সংসার-ভুক্ত সকলে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের নিত্য সেবা হইত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেঙ্কট-ভট্ট নিজে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব এবং পরম ভক্ত ছিলেন। ১৪২২ শকে (১৫০০ খৃঃ) এই বেঙ্কট-ভট্টের

ঔরসে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়, তিনিই গোপাল ভট্ট—বৃন্দাবনের প্রধান ছয় গোস্বামীর অন্যতম, এখানে তাঁহারই কথা বলিব।

শৈশব কালেই গোপাল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় দিতেন। তখন তাঁহার খুল্লতাত প্রকাশানন্দ গৃহত্যাগ করেন নাই, কিন্তু দেশের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি এই বালক গোপালের প্রতি অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হইয়া তাহাকে শিক্ষাদান করিতেন * জন্য ভবিষ্যতে গোপাল ভট্ট তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হরিভক্তিবিলাসের" মঙ্গলাচরণে আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন † খুল্লতাত ভাবিতেন তিনি যেমন নিজে জ্ঞানমার্গ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রটিকেও সেই পথে আনিবেন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে লোকে পথের ব্যবস্থা করিয়া আসে, অন্যের অপেক্ষা রাখে না। প্রকাশানন্দ যখন গৃহ ত্যাগ করেন, তখন গোপাল নিতান্ত বালক। কিন্তু শৈশব হইতেই তিনি ভক্তি-পথের পথিক ছিলেন; গৃহ-দেবতার মন্দির দ্বারে তাঁহার আনন্দোৎফুল্ল ছল ছল নেত্র দেখিয়া পিতামাতা তাহা আনন্দে অনুমান করিতে পারিতেন। যথাকালে গর্ভাষ্টমে গোপালের উপনয়ন হইল, উহার অব্যবহিত পরে তিনি পিতার সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। তখনও গৌরাঙ্গ সেখানে আসেন নাই। গোপাল জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া একান্ত ভক্তিবিহ্বল হইয়াছিলেন।

* "বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম
গোপাল ভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমাণ॥
অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে।
পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে॥"

অনুরাগবল্লী, ১ম, ৭ পৃঃ।

† "ভক্তিবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য
গোপাল ভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥"

"যৈছে নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনে,।
তৈছে স্ফূর্ত্তি ব্যাকরণ আদি অধ্যয়নে ॥"

ভ- র- ১ম।

এইভাবে বাল্যকাল হইতে গোপালের দেবভক্তি ও শিক্ষানুরাগ ল
করিয়া, পিতা মাতার সেবায় তাহার অপূর্ব্ব প্রীতি দেখিয়া সকলে
হইতেন এবং এইরূপ সুরূপ ও সুচরিত্র যোগ্য পুত্র লাভের জন্য
বেঙ্কট ভট্টের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেন। এমন সময়ে গোপালের জীব
প্রকৃত শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের পর ১৪৩১ শকের
মাসে নীলাচলে আসেন। ফাল্গুন মাসে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বা
সার্ব্বভৌম তাঁহার নিকট ভক্তিতত্ত্ব বিচারে পরাজিত হইয়া বৈষ্ণব-দী
গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসের প্রথমে* (১৪৩২ শক, ১৫১০
তিনি দুইজন মাত্র সঙ্গী লইয়া দাক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হ
পথে গোদাবরী তীরে উড়িষ্যার রাজমন্ত্রী বিদ্যানগরের রাজা বৈ
চূড়ামণি রামানন্দ রায় তাঁহার অন্তরঙ্গ মর্ম্মী ভক্তরূপে
হইলেন। পরে তিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে আষাঢ় মাসে শ্রীরঙ্গ
উপনীত হইলেন। সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীটি হরিনামে নাচিয়া ও কী
করিয়া দেশজয় করিতেছিলেন; যখন যেখানে যাইতেন, তাহার পূর্ব্ব

---

* যে দুইজন ভক্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তাহার একজন গোবিন্দ ক
তিনি কিছু ভ্রমণ বৃত্তান্ত কড়চায় লিখিয়া রাখেন। সেই "গোবিন্দ দাসের ক
আছে, মহাপ্রভু (১৪৩২ শকের) ৭ই বৈশাখ দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিয়া (১৪৩৩
৩রা মাঘ নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। (৪৭ ও ২১৯ পৃঃ) যাত্রার তারিখ
চৈতন্য-চরিতামৃতের "বৈশাখ প্রথমে" উল্লেখের অমিল নাই। সুতরাং কড়চার
তারিখে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না।

সে সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইত। তিনি শ্রীরঙ্গধামে পৌছিয়া কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথজী দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভাবাবেশ হইল। সেই অরুণ-বসন-পর চম্পক-বরণ সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য কত লোকই মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। উঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন—বেঙ্কট ভট্ট; তিনি পরম সমাদরে সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার পদধৌত করিয়া সেই পাদোদক পরিবারসুদ্ধ সকলে পান করিলেন।

"শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
নিজঘরে লঞা কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল বংশেতে করিল ভক্ষণ॥" চৈ· চ· মধ্য, ৯ম।

চৈতন্য প্রভু সেই গৃহে কয়েকদিন অবস্থিতি করিলেন। এমন সময় বর্ষাও প্রবল হইল এবং চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল। ভট্ট ভ্রাতারা তাহাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন চাতুর্ম্মাস্য কাল তাহাদের কুটীরেই অতিবাহন করেন। মহাপ্রভু সে আগ্রহাতিশয্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রে বহু ব্রাহ্মণের বাস; প্রভু বেঙ্কটের গৃহে থাকিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে এক একদিন করিয়া তাঁহাকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিতে করিতে চারিমাস পূর্ণ হইয়া গেল। কত ব্রাহ্মণ প্রভুকে ভিক্ষা দিবার দিন না পাইয়া বড় মনঃকষ্ট পাইলেন। এই চারিমাস প্রভু ভট্টগৃহে রহিলেন:—

"ভট্টশ্রীতে প্রভু চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা রহে।
রাত্রিদিন ভট্টসহ কৃষ্ণ কথা কহে॥" প্রে· বি· ১৮শ।

দিনের পর দিন কত কথাই হইত। হাসিয়া নাচিয়া ভ্রমণ, সকলকে লইয়া কাবেরী স্নান, তাহাতে কত রঙ্গরস, কি সুখেই ভক্তদের দিনগুলি যাইতেছিল। সেই হাস্য পরিহাসে কত রহস্যই উদ্ভিন্ন হইত! একবার প্রভুর সঙ্গ যে লাভ করে, তাঁহার কটাক্ষে যে পড়ে, সে তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ না করিয়া পারে না।

ভট্ট নিজ গৃহে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করিতেন; প্রভু তাঁহার ভক্তি নিষ্ঠা দেখিয়া তুষ্ট হইতেন। লক্ষ্মী কেন কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভে ইচ্ছুক, উহাতে কোন দোষ-স্পর্শ হয় কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরে অনেক হাস্য-পরিহাস হইত। নারায়ণ ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও রসোৎকর্ষের নিমিত্ত কৃষ্ণেরই প্রাধান্য,—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ইহাই প্রভু বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপে ভট্ট-গৌরাঙ্গে অদ্ভুত প্রীতিবন্ধন হইয়া গেল।

"নিরন্তর তার সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥"

চৈ· চৈ·

এত অন্তরঙ্গ হইলেন যে পিতা, সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন—তাহার বালক পুত্র, গোপাল। যেমন পিতা, তেমনই পুত্র। প্রভু যখন বেঙ্কটের গৃহে আসিলেন, তখন গোপালের বয়স ১০ বৎসর পার হইয়াছে মাত্র। আসিবা মাত্র এই দিব্যকান্তি বালক গিয়া তাঁহার চরণে লুটাইলেন। তাঁহার পানে কত চাহিয়া থাকিলেন, তাহার তৃষিত নয়নের যেন সাধ মিটিতেছিল না। পিতা মাতার সঙ্গে প্রভুর পাদোদক পান করিলেন। প্রভু তাহার সোনার বরণ, লাবণ্য মাখা মুখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিভার উন্মেষালোকে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিতে দেখিতে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকিলেন, পরে যেন কোন চিরপরিচিত স্নেহ-পুত্তলের ন্যায় তাহাকে কোলে লইয়া প্রেমাশ্রুসিক্ত করিয়া

করিতে লাগিলেন। বালক সে স্পর্শ, সে শক্তি-সঞ্চার সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি থাকিলে এই ভাবেই ভগবান স্বয়ং আসিয়া ভক্তের দ্বারে দেখা দিয়া থাকেন। গোপালের শুচি-শুদ্ধ শুভ্র জীবনে বাল্য হইতে কোন সংসার-কালিমার দাগ না পড়ে, সেই জন্যই বুঝি গৌরাঙ্গের এই রহস্যময় অভিযান এবং রঙ্গ-ক্ষেত্রে চাতুর্মাস্য যাপনের এই প্রহেলিকা!

বালক সেইদিন হইতে গৌরের পোষা পাখী হইয়া গেলেন। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, কটাক্ষ মাত্র আজ্ঞা পালন করিয়া, আজ্ঞার অপেক্ষায় মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, গোপাল যখন যাহা সাধ্য ও প্রয়োজনীয়, সেই ভাবে প্রভু সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

নিজ গৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া॥

ভ. র. ১ম।

ইহার ফল যাহা হয়, তাহাই হইল। ক্ষণিক সাধুসঙ্গ ভবার্ণব-তরণে নৌকাস্বরূপ হয়, আর শ্রীচৈতন্যের এই দীর্ঘ সঙ্গ বাল্যাবস্থায়ই গোপালের মনে ভক্তি আনিয়া দিল। গৌরাঙ্গের প্রতি তাহার এই অত্যধিক প্রীতি দেখিয়া গোপালের পিতা তাহাকে মহাপ্রভুর চরণে সঁপিয়া দিলেন। গোপালও তাঁহার সঙ্গে আনন্দে দিবারাত্রি যাপন করিতেছিলেন। প্রভুর মুখে নদীয়ার ভক্তগণের কথা শুনিয়া একদিন গোপালের বড় সাধ হইল, কেন নদীয়ার কাছে তাহার বাড়ী হইল না? তাহা হইলে ত ভাল [illegible] তিনি নদীয়ার লীলা দেখিতে পারিতেন! কিন্তু তাহার [illegible] সম্পূর্ণ অপূর্ণ রহিল না, একদিন গোপাল স্বপ্নচ্ছলে নদীয়ার [illegible] দেখিয়া চমকিত হইলেন। তখন প্রভু তাহাকে অনেক বুঝাইয়া [illegible] নানা উপদেশ দিলেন এবং প্রাণপণে পিতা মাতা ও পিতৃব্যদিগের

সেবা করিতে বলিলেন। অবশেষে পিতা মাতার কালপ্রাপ্তি হইলে তিনি যেন বৃন্দাবনে যান, তথায় বহু ভক্তের সহিত তাহার সম্মিলন হইবে। এই আশ্বাস দিয়া তিনি বালক ভক্তটিকে গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষাদান করিলেন।

মহাপ্রভুর একটি বিশেষত্ব এই, তিনি কখনও কোন গৃহস্থ ভক্তকে পিতা মাতার জীবদ্দশায় সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। লোকনাথ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট ইহাদের সকলকে তিনি পিতৃমাতৃ কৃত্য শেষ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছিলেন ইহার মধ্যে কেবল রঘুনাথ দাস কিরূপে অত্যধিক নির্বেদ ভক্তি বশে আত্মহারা হইয়া প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে পারে নাই, সে কথা পরে বলিব। আর সকলেই আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্য অতীত হইলে, বেঙ্কট ভট্টের আতিথ্য ত্যাগ করিয়া বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন :—

"গোপাল ভট্ট নাম এই তোমার কুমার।
মোর অতি কৃপা হয়, ইহার উপর॥
পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিহা নাহি দিবে ইহা কহিল তোমারে॥" প্রে, বি,

বিদায় কালে গোষ্ঠীসহ ভট্ট কাঁদিয়া আকুল হইলেন ; * আরও কিছু থাকিয়া তাহার গৃহ পবিত্র করিবার জন্ত কত কাতর প্রার্থনা জানাইলে

---

* ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও অনুরাগবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থে দেখি মহাপ্রভু যখন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থিতি করিতে দিলেন, তখন তাঁহারা গৃহে তাঁহার সেবা করেন এবং বিদায় কালে—

"ত্রিমল্ল বেঙ্কট-প্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভুবিনা রহিব কেমনে॥ অ০ ব০ ১ম।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; প্রভুর অনেক কর্ত্তব্য, তিনি কিছুতেই থাকিলেন না। সকলকে একে একে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। বেঙ্কটের গৃহে চারি মাস ধরিয়া যে উৎসবানন্দ চলিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল, আর সকলের মনে এক নিদারুণ শোকের ছায়া পড়িল।

ইহার পর গোপাল আর বিংশাধিক বর্ষ কাল গৃহাশ্রমে ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি নানা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেন এবং প্রভুর উপদেশ মত মন্ত্রজপ ও সাধন ভজন করিয়া সাধনপথেও অনেক অগ্রসর হইলেন। প্রকাশানন্দ কাশীতে বসিয়া সে সব সংবাদ শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্নেহের শিষ্য গোপালকে গৌরাঙ্গ যে ভাবে চরমের প্রেমপথে টানিয়া লইয়া ছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভুর প্রতি তাহার বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর কাল দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের পর যখন ১৪৩৩ শকের মাঘ মাসে নীলাচলে ফিরিলেন, তখন প্রভু তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ঐ বিদ্বেষ বশে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-জীবনের দোষোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য যে সব শ্লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার উত্তর দিতে হইয়াছিল।

গোপাল ভাগবত পড়িয়া ভক্ত হইলেন এবং পথের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। তিনি

[illegible] বুঝাতে হয় প্রবোধানন্দও তখন গৃহে ছিলেন এবং প্রভুর প্রতি একান্ত ভক্তি-[illegible]। কিন্তু এ সংবাদ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ইহার ৩।৪ বৎসর পরে [illegible]তে এই প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ও শাস্ত্র-বিচার হয়, তখন [illegible]শানন্দ ভক্তিপথের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ ও [illegible] অন্য ভাব প্রদর্শন করেন নাই। সুতরাং নিজগৃহে প্রভুর সহিত তাঁহার [illegible] নাই, উহার পূর্ব্বেই তিনি কাশী-প্রবাসী হইয়াছিলেন, ইহাই সত্য কথা।

পিতৃমাতৃ-বিয়োগ পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া পুত্রের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে
কেবল প্রভুর আদেশে তাহার বিবাহ হইল না। এই দীর্ঘ-কাল গোপা
কি ভাবে জ্ঞানার্জ্জন ও ইষ্ট ভজন করিতেন, তাহার জীবনে কত
ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই আমাদের জানিবার উপায় নাই।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করিবার জন্য গোস্বা
গণের চরণে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কেবল লোকনাথ ও গোপা
ভট্ট এই দুইজনে তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন গ্রন্থ মধ্যে
উঁহাদের প্রসঙ্গে কিছু না লিখেন। তিনি সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে
পারেন নাই, এজন্য চরিতামৃতে গোপালের কথা নাই। সমসাময়িক
অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থেও গোপালের কথা বিশেষ কিছু নাই।

---

(২)

বৃন্দাবনে।

মহাপ্রভুর আগমনের প্রায় বিশ বৎসর পরে বেঙ্কটভট্ট ও তাঁহা
সহধর্ম্মিণীর কাল হইল। গোপাল যথারীতি তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহি
ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। যে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য প্রভুর আদেশে
তাহার চিত্ত চিরলালায়িত ছিল, সেই চিরসুন্দর শ্রীধামে যাইবার নি
একান্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ...

---

* গোপাল যে "অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ" এবং সে দেশে তাঁহা
বিদ্বান কেহ ছিলেন না। ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থে ইহা বহুস্থানে লিখিত আছে।

মহাপ্রভু অপ্রকট হন নাই; নীলাচলে গিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া যাইবার জন্ম প্রাণ কাঁদিল বটে, "কিন্তু সেখানে যাইতে আজ্ঞা নাই, তাই যাইতে পারিলেন না। আবদ্ধ গোবৎস ছাড়িয়া দিলে যেমন মাতার নিকট দৌড় মারে, গোপাল সেইরূপ বৃন্দাবনের পথে ছুটিলেন।" * এ হইল ১৪৫৩ শকের (১৫৩১ খৃঃ) কথা; ইহার বহুপূর্ব্বে তাহার পূর্ব্ব গুরু ও পিতৃব্য মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষান্তে প্রবোধানন্দ নামধারণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে গিয়া নন্দকূপে বাস করিতেছিলেন (১৪৩৭ শক)। তখন তাঁহার আর মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ বা নিজশিষ্য গোপালের প্রতি বিরক্তি ছিল না। গোপালের প্রতি প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া, তিনি গোপালকে মনে ম[illegible] আকর্ষণ করিতে ছিলেন। কিন্তু গোপাল পিতৃমাতৃ-সেবার জন্ম বাহি[illegible] হইতে পারিতেছিলেন না। যখন সময় আসিল, তখন গোপাল পাগলের মত ছুটিয়া ছুটিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শ্রীধামে উপনীত হইলে[illegible]।

প্রবোধান[illegible] যখন আসেন, তখনও বৃন্দাবন জঙ্গলময়। আমরা পূর্ব্বে বলি[illegible]ছি, ১৪৩১ শকে সর্ব্ব প্রথমে লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী [illegible]ন্দাবনে গি[illegible]য়া তীর্থোদ্ধার করিতে থাকেন; পরে সুবুদ্ধি রায় ও প্রবোধানন্দ [illegible]গেলেন এবং ক্রমে রূপ, সনাতন ও অন্যান্য ভক্তেরা আসিয়া বৃন্দাবন [illegible]গাইয়া তুলিলেন। গোপাল যখন ব্রজধামে পৌছিয়া খুঁজিয়া, খুঁজিয়া [illegible]য় গু[illegible] প্রবোধানন্দের কুটীরে পৌছিলেন, তখন রূপসনাতন শ্রীধামে [illegible]সর্ব্ব[illegible]। যাইবা মাত্র প্রবোধানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্রকে উঁহাদের নিকট [illegible]ছা[illegible] দিলেন। উঁহারা গোপালের বার্ত্তা মহাপ্রভুর মুখে বহুবার [illegible]নিয়া[illegible]ছিলেন; আজ্ তাঁহার মধুর মূর্ত্তি ও ভক্তির লক্ষণ দেখিয়া উভয়ে

* ম[illegible] শিশির কুমার ঘোষ প্রণীত "প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট" ৬৯ পৃঃ।

মোহিত হইয়া সেই যুবককে স্নেহের কোলে আশ্রয় দিলেন। গোপা
বাস্তবিকই "কাঙ্গা করাঙ্গিয়া" নিষ্কিঞ্চন ভক্ত, তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া
তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। তাঁহাকে পাইয়া দুই ভ্রাতা আনন্দে উৎ
হইয়া, গোপালের আগমন বার্ত্তা নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট প্রে
করিলেন। পত্র পাইয়া তাঁহার আর আনন্দ ধরে না, সে আনন্দ-ধা
নীলাচলে সকল ভক্তের মধ্যে সংক্রামিত হইল। মহাপ্রভু নিজ হ
রূপসনাতনকে প্রত্যুত্তর দিলেন এবং লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহারা
গোপাল ভট্টকে নিজ ভ্রাতার তুল্য জানেন। আর গোপালকে তাঁ
আশীর্ব্বাদ স্বরূপ নিজের বসিবার আসন * ও ডোর কৌপিন বহি
দিয়া পাঠাইলেন। পত্র সহ সে কৃপা-নিদর্শন যখন পৌছিল, ত
বৃন্দাবনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্থির করিলেন, গোপাল প্রভুর
স্নেহের পাত্র এবং ভক্ত হিসাবে অতি সুপাত্র। বৃন্দাবনে ক আনন্দোৎ
চলিল। গোপাল যখন শুনিলেন, তাঁহার ইষ্টদেব তা র কথা স্ম
করিয়া স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছেন এবং যাহা তিনি এ পর্য্যন্ত কাহারও
করেন নাই, নিজের কৃপার সামগ্রী তাহার জন্য পাঠাইয়াছেন, তখন তি
উৎকট আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছান্তে তি
প্রভুর আসনে বসিতে চাহিলেন না, আসনকে বারংবার প্র
করিতে লাগিলেন। ভক্তেরা যখন বুঝাইলেন, প্রভু যখন তাঁহার
নিজের বেশ ও নিজের আসন পাঠাইয়াছেন তখন তিনি গোপাল
বৃন্দাবনে নিজের উত্তরাধিকারী বা নিজ সম্প্রদায়ের কর্ত্তা স্ব
করিয়াছেন। তখন গোপাল প্রভুর আসনে বসিলেন, আ
কৌপীন গলায় বাঁধিয়া বড় গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন।

* এই আসন খানি একখানি কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠের ক্ষুদ্র পিঁড়া, ইহা
৺রাধারমণের মন্দিরে ভক্তিতে পূজিত হইতেছে।

মহাপ্রভুর যেমন আজ্ঞা, তাহাই হইল; সনাতন ও রূপ নবাগত পালকে আপনাদের অনুজ ভ্রাতার মত স্নেহাকর্ষণে আবদ্ধ করিলেন; তিন জনের মধ্যে এমন সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হইল যে, তিন জনের দেহ ভিন্ন ছিল, অন্তভাবে তিন জন এক হইয়া গেলেন। রূপসনাতন য়ে যে শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলনে ব্যাপৃত ছিলেন, গোপাল ভট্ট সেই কার্য্যে াদের সহযোগী হইলেন। একত্র বসিয়া আলোচনা না করিয়া, একমত হইয়া উঁহারা কেহ কোন সিদ্ধান্ত গ্রন্থমধ্যে স্থান দেন নাই। সুতরাং গুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষাবৈচিত্র্যের আবরণে ারিত হইলেও, মূলতঃ উঁহাদের সার মতের জন্য সকলেই সমভাবে া।

গোপালের আগমনের কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল, মহাপ্রভু নীলাচলে াকট হইয়াছেন। নীলাচল ত অন্ধকার হইয়াছিলই, পরন্তু বৃন্দাবনে শোকের উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল। নীলাচলের প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া ; ভক্তেরা অনেকে বৃন্দাবনে আসিলেন, কেহ কেহ শীঘ্র শীঘ্র তনুত্যাগ য়া অন্তর্হিত হইলেন, দুইচারিজন অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন। মহা- র প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পিতৃহারা হইলেও ভ্রাতৃহারা হইল না। ভক্তগণ বৃন্দাবনে বসিয়া একযোগে এই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব স্থির ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর লোকে ভাবিল, তিনি যখন গোপাল ভট্টের আসন পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বাস্তবিকই গুরুর গদিতে উপযুক্ত পাত্র। মহাপ্রভু কখনও অনুপযুক্তের উপর বিশ্বাস ন নাই। সকলে যেমন ভাবিলেন, কার্য্যতঃ তাহাই করিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে, তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে নিকট প্রেরণ করা হইত। গোপাল অনেকের শরণাপন্নের

কাণ্ডারী হইলেন, সে কথা পরে বলিতেছি। অগ্রে তাহার পাণ্ডিত্যে কথা বলিব।

শ্রীপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীসনাতন বৈষ্ণব-স্মৃতি সংগ্রহ করিতেছিলেন গোপাল আসিবা মাত্র তাঁহাকে প্রধানতঃ সেই কার্য্যে ব্রতী করিলে মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পর গোপালকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ ম করিয়া সনাতন তাঁহারই নামে বিখ্যাত বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ "হরিভক্তিবিলা প্রকাশ করিলেন * এবং নিজে সুবিশদ টীকা রচনা করিয়া গ্র প্রামাণিকতা সুদৃঢ় ও সুবোধ্য করিয়া দিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়া (১২৩ পৃঃ)। এই বিরাট গ্রন্থে প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্ম্মানুশাসন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স পুরাণের সারমত সন্ধান করিয়া ভগবদ্ভক্তির আলোচনা এবং ভক্তো বৈষ্ণবাচারের বিধি-নিষেধ এমনভাবে কোথাও সঙ্কলিত হয় নাই। † পুস্তকে ক্রমান্বয়ে গুরুশিষ্য-লক্ষণ ও মন্ত্রমাহাত্ম্য, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের দিনকৃত্য, পূজা প্রণালী ও বিগ্রহ সেবা, অর্চ্চনা ও জপের মহিমা, বৈষ্ণবাপরাধ ও প্রেমভক্তি-লক্ষণ, একাদশী প্রভৃতি ব্র মাসচর্য্যা, শ্রীমূর্ত্তির গঠন ও সংস্কার, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ

* গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তি বিলাস বর্ণন॥

ভ, র, ১ম, ১৪ পৃঃ

† "সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান।
সর্ব্বপুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান॥
ভগবান ভক্তি ভক্ত-যোগ্য সদাচার।
এসব তত্ত্বের যাহা দেখাইল পার॥"

অনুরাগ বল্লী, ১ম, ৯ পৃঃ

বতীয় কৃত্য সম্বন্ধে মন্ত্রাদি ও বিধি-ব্যবস্থা এই গ্রন্থের বিংশতি বিলাসে অধ্যায়ে অতি সুন্দর, সরল ও সুবিন্যস্তভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই হই আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণের আচারানুষ্ঠান বিষয়ে একমাত্র পরি-লক। ইহা প্রধানতঃ সজ্জন ও ধনবান গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য াপনের জন্য লিখিত; ইহাতে সর্ব্বত্যাগী উদাসীন মহাত্মগণ সম্বন্ধে কিছুই িত হয় নাই, কারণ তাঁহারা যথাযথ শাস্ত্র বা গুরুমুখ হইতেই কর্ত্তব্য ন্ধে উপদেশ লইবেন। সকলের পক্ষেই একথা মনে রাখা উচিত যে, াচারই ভক্তির একমাত্র প্রধানতম ধন, তাহাই রক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী ই গ্রন্থে আছে। তবে যাহারা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে কান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভক্তাধীন ভগবান সর্ব্ব প হইতে মুক্ত করেন, তাঁহাদিগকে কোন আচার-নিয়মের বশীভূত ইতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার সময় দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন, উহার একখানি ব্রহ্ম-সংহিতা খানি বিল্বমঙ্গল-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নানাতীর্থে দেবমন্দিরে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ এই কৃষ্ণকর্ণামৃত" পুঁথি পাঠ করেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

চৈ, চ, মধ্য ৯ম।

...াল ভট্ট গোস্বামী এই কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণবল্লভা নাম্নী ...লম্বন করেন, কারণ তিনি জানিতেন এই গ্রন্থের মূলতত্ত্ব

ব্যাখ্যায় এবং ইহার মাহাত্ম্য-প্রচারে তাঁহার ইষ্টদেবেরই তুষ্টি সাধিত হইবে। *

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যের অবতারবাদ প্রতিপন্ন করিবার মানসে গোপাল ভট্টই প্রথম কতকগুলি দার্শনিক সন্দর্ভ রচনা করিতেছিলেন, উহা অবশেষে সম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রচারিত করিবার জন্য বয়ঃকনিষ্ঠ এবং মহাপণ্ডিত শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাই শ্রীজীবের প্রসিদ্ধ ষট্‌সন্দর্ভের মূল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

গোপাল ভট্ট বিরচিত অন্য কোন বিশেষ গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যা না। তবে তাঁহার রচিত দুইচারিটি পদ বা গান আছে, উহা প্রাচী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। বাঙ্গালী মহাপ্রভুর নিকট [illegible] লইয়া, বাঙ্গা রূপসনাতনের অনুভক্ত হইয়া গোপাল ভট্টও বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন শিশির কুমার সুন্দর কথা বলিয়াছেন "যেমন কন্যার [illegible]বাহ হইলে, স্বামীর গোত্র পায়, সেইরূপ প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট প্রভুর ভ হওয়ায় বাঙ্গালী হইয়া গেলেন।" † বাঙ্গালী ভাবাপন্ন গোপালের বাঙ্গা কবিতায় বিদ্যাপতি প্রভৃতি পদকর্ত্তার সঙ্গীত-মাধুরীর ঝঙ্কার আ[illegible] গোপালকৃত গ্রন্থাদির সংখ্যা অধিক না হইলেও তিনি যে রূপসনাত[illegible] শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সহযোগী এবং শ্রীজীবের গ্রন্থনিচয়ের উপদেষ্টা ছি[illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই।

গোপাল ভট্ট উত্তর দেশে তীর্থ ভ্রমণ কালে গণ্ডকী নদীগর্ভে এ[illegible]

---

* "কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যেতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাং।
গোপালো ভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জরঃ॥"
টীকার মঙ্গলাচরণ॥
নির্জ্জর—দেবতা। দ্রাবিড়াবনি-নির্জ্জর অর্থাৎ দ্রাবিড় ভূমিদেব বা দ্রাবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ।

† "প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট," ৭৮-৭৯ পৃঃ।

শালগ্রাম শিলা পাইয়াছিলেন, উহা আনিয়া তিনি নিত্যপূজা করিতেন। রূপসনাতন কর্ত্তৃক ৺গোবিন্দজী ও মদনগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহের সেবা স্থাপনের পর, গোপাল ভট্টেরও পৃথক্ ভাবে সেইরূপ একটি শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিবার অভিলাষ হয়। রূপ গোস্বামী অগ্রজের মত তাঁহার সকল সাধ পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ সাধও তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই। প্রবাদ আছে, একদা এক ধনী ভক্ত বৃন্দাবনে আসিয়া প্রধান প্রধান সকল বিগ্রহের প্রত্যেকের জন্ত নানাবিধ বস্ত্র ও রত্নালঙ্কার দিয়া যান। গোপালের বড় ইচ্ছা হয়, তাঁহার শালগ্রাম ঠাকুরটি হস্তপদ বিশিষ্ট হইলে তিনি তাহাকে উক্ত বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন, পরদিন দেখা গেল রাত্রিমধ্যে তাঁহার শালগ্রাম একটি শ্রীবিগ্রহে পরিণত হইয়াছেন। তখন তাঁহার আনন্দ আর ধরে না; তিনি উহাকে মনের সাধে সাজাইলেন এবং নাম রাখিলেন "শ্রীরাধারমণ," কারণ এই বিগ্রহটি ক্ষুদ্র হইলেও উহাতে নাকি রাসলীলার মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল।

কিন্তু "অনুরাগ-বল্লী" গ্রন্থে এই রাধারমণ বিগ্রহের উৎপত্তির অন্য প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন গোপালের—

"নিজারস্ত সেবা করিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল।
বুঝি গোসাঞি গৌড় হইতে বস্তু আনাইল॥
এক কারিগর মাত্র উপলক্ষ করি।
মনের আকুতি মনে বিচার আচরি॥
গোপাল ভট্ট গোসাঞির জানি অভিলাষ।
স্বহস্তে শ্রীরূপ গোসাঞি করিল প্রকাশ॥"
সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল।
শ্রীরাধারমণ নাম প্রকট করিল॥"

(অমৃতবাজার প্রেস সংস্করণ, ১৪ পৃঃ)

অর্থাৎ গোপাল ভট্টের স্বতন্ত্র সেবা-স্থাপনে অভিলাষ হইয়াছে জা
রূপ গোসাঞি গৌড় হইতে বস্তু (উপযুক্ত প্রস্তর) এবং এক কা
আনিয়া, তাহাকে উপযুক্ত উপদেশাদি দিয়া নিজের মনঃ-কল্পিত f
রচনা করিয়া গোপালকে সমর্পণ করিলেন, এবং পরে তিনি এ
মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া পরবর্ত্তী বৈশাখী পূর্ণিমাতে রাধারমণের অভি
সম্পন্ন করিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর ঐ তিথিতে রাধারমণের সিংহ
যাত্রা বা অভিষেক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাধারমণের উৎপত্তি স
প্রবাদগত গল্পে অনাস্থা করিবার কোন কারণ দেখিনা। এবং প্রবাদ
রাধারমণের প্রতি ভক্তের প্রাণ চিরাকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তাহা স্বী
করি। কিন্তু অপর পক্ষে ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে, এব
বৃন্দাবনবাসী ভক্তকর্ত্তৃক লিখিত "অনুরাগবল্লীর" বিশেষ তথ্য পূর্ণ ব
অবিশ্বাস করিবার কি কারণ আছে, বুঝিয়া পাই না। *

* শ্রীনিবাসের শিষ্যানুশিষ্য মনোহর দাস প্রণীত "অনুরাগ বল্লীর" সমাপ্তি স
এই শ্লোকে আছে :—

"বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্রে সিতেঽমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যান্তু পূর্ণানুরাগবল্লিকা ॥"

বসু=৮, চন্দ্র=১, কলা=১৬ অর্থাৎ ১৬১৮ শকে বা ১৬৯৬ খৃঃ। অনুরাগ
পত্তগুলি ভক্তিরত্নাকরে একটু বিকৃত ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,—

"নিজসেবা করিতেই উৎকণ্ঠা বাঢ়িল।
বুঝি গোসাঞির দ্বারে প্রভুর ইচ্ছা হৈল ॥
একদিন রূপমাত্র উপলক্ষ্য করি।
মনের আকুতি মনে বিচার আচরি ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট-গোসাঞি জানি অভিলাষ।
স্বয়ং রূপ শ্রীগোপালে করিলা প্রকাশ ॥"

াওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাহার অত্যাচার ভয়ে যখন ৺গোবিন্দজী ও প্রধান প্রধান বিগ্রহ জয়পুরে নীত হন, তখন রাধারমণ স্থানান্তরিত হন নাই; সেবকগণ কিছুকাল গুপ্তভাবে ঠাকুরের পূজা করিতেন। এই বিগ্রহটি খুব ক্ষুদ্র, ইহার সঙ্গে কোন র্ত্তি নাই। শুধু বিগ্রহটির বামভাগে ক্ষুদ্র সিংহাসনের উপর ুকুট স্থাপন করতঃ শ্রীরাধার সেবা করা হয়। রূপ গোস্বামীর । মন্দির এখন নাই; পরে কয়েকবার সে মন্দির নবগঠিত কৃত হইয়াছে। আধুনিক মন্দিরটি আকারে ক্ষুদ্র এবং সাধারণ নর মত হইলেও উহা সযত্ন সংরক্ষিত এবং অত্যধিক শিল্প-সমন্বিত। তন মন্দিরটি [illegible]ক্ষ্ণৌ-নিবাসী সাহ কুন্দন নামক একধনী বণিক ও ভ্রাতার অ[illegible] নির্ম্মিত হয়।*

হাপ্রভুর অ[illegible]কট হওয়ার পর যাঁহারা বৃন্দাবনে আসিলেন তন্মধ্যে । দাস [illegible]প্রধান। রঘুনাথ ভট্ট পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, শ্রীজীব হেত প[illegible] আসিলেন। গোস্বামীদিগের মধ্যে রূপসনাতন খুব বৃদ্ধ, ার [illegible] করিবার বয়স, অবসর বা প্রবৃত্তি ছিল না; তাঁহারা র [illegible]ইবার দিন গণনা করিতে করিতে শাস্ত্র-সাধনায় ব্যস্ত । [illegible]ঘুনাথ দাস কায়স্থ-সন্তান, লোকে তাঁহাকে গুরুরূপে পাইলে ইতে[illegible] বটে, কিন্তু তিনি দৈন্যের খনি এবং ভজন সাধনে সম্পূর্ণ [illegible] বিশেষতঃ তিনি নিজে যে কাহাকেও শিষ্য করিবার

[illegible]ন সম্পূর্ণ অর্থবোধই হয় না। ইহাতে গৌড় হইতে "বস্তু" আনান হইল এবং [illegible]নেক "কারিগর" দ্বারা মূর্ত্তি গঠিত হইল, এইটুকু সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হই-[illegible]তঃ প্রবাদগত বর্ণনা অসন্দিগ্ধ রাখাই উদ্দেশ্য। পত্রিকাপ্রেসের সংস্করণে [illegible]কোন পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া ভূমিকা-লেখক বাবু মৃণালকান্তি [illegible] কোন তর্ক তুলেন নাই।

* [illegible]াবন-কথা," ৯১পৃঃ

অধিকারী, এমন মনে করিতেন না। লোকনাথ কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে একবার মাত্র ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপর তিন জনের মধ্যে শ্রীজীব সকলের বয়ঃ কনিষ্ঠ ; সুতরাং রূপসনাতনের ব্যবস্থায় শিষ্যগ্রহণ করিবার প্রধান ভার ভট্টযুগলের উপরই নিপতিত হইল। ভবিষ্যতে তাঁহাদের মধ্যেও কোন বিরোধ উপস্থিত না হয়, এজন্য রূপসনাতন উভয়ের কার্য্যক্ষেত্রও পৃথক্ করিয়াদিলেন।

"গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র।
গৌড়িয়া আসিলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র॥
এ নিয়ম করিয়াছে দুই মহাশয়।
পরমার্থ ব্যবহারে যেন বিরোধ না হয়॥"

অ. [illegible]. ২য়, ১৪পৃঃ

এজন্য পশ্চিম দেশীয় ভক্তগণ দলে দলে আসিয়া গোপাল ভট্টের শিষ্য হইতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যশাখা বহুবিস্তৃত হইল। [illegible] চৈতন্যদেবের প্রতিনিধি স্বরূপ বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের গুরু হইলে[illegible] সেই শিষ্যগণের মধ্যে পঞ্চজন বিখ্যাত :—

"শ্রীনিবাসাচার্য্য, হরিবংশ ব্রজবাসী।
গোপীনাথ পূজারি হয় বড় গুণরাশি॥
আর দুই শিষ্য ভট্টের বড় প্রেমরাশি।
শম্ভুরাম, মকরন্দ গুজরাটবাসী॥"

প্রেমবিল[illegible]

শেষোক্ত দুইজন সম্বন্ধে আমরা নামের অধিক কিছুই [illegible] তবে অপর তিন জন বিশেষ বিখ্যাত, তন্মধ্যে গোপী[illegible] সর্ব্বপ্রধান। ইনি একজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। গোপাল

উত্তরাখণ্ডে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী দেববন হইতে ইহাকে শিষ্য করিয়া সঙ্গে আনেন; পরে বহুকাল পর্য্যন্ত এই পার্ষদ ভক্তের অনাবিল ভক্তি ও জ্ঞানোন্নতি দেখিয়া ভট্টগোস্বামী অন্তিমকালে ইঁহারই উপর শ্রীরাধারমণের সেবাভার দিয়া যান। গোপীনাথ চিরকুমার, তাঁহার সন্তানাদি ছিল না, তিনি মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দামোদরের উপর পূজার ভরার্পণ করেন। তদবধি এই বংশীয়েরা স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের পূজা করিয়া আসিতেছেন, কখনও কোন বৃত্তিভুক্ ব্রাহ্মণদ্বারা পূজা বা ভোগরন্ধন করান না। দামোদরের বংশে বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে মধুসূদন সার্ব্বভৌমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি রাধারমণ-প্রা[illegible] নামে হিন্দীতে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে গোপাল ভট্টের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখ বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য—হরিবংশ মিশ্র। * ইনি ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ ও প্রধান পণ্ডিত এবং ভট্ট গোস্বামীর অনুরক্ত সেবক ছিলেন। গোপাল ভট্ট যখন হরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রচার করেন, তাহার দ্বাদশ বিলাসে একাদশী ব্রতমাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। একাদশী দিনে বা হরিবাসরে বৈষ্ণবের পক্ষে কিছু ভক্ষণ করা বহু [illegible] বিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত আছে। হরিবংশের কি দুর্ব্বুদ্ধি, তিনি [illegible] একাদশীদিনে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে গুরুর নিকট [illegible]; গুরু উহা দেখিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে হরিবংশ [illegible] করিলেন, তিনি শ্রীরাধার প্রসাদী তাম্বূল ভক্ষণ করিতেছেন।

* [illegible]নি হিত হরিবংশ নামে পরিচিত। ইনি "রাধাসুধানিধি" একখানি সংস্কৃত [illegible]

গোস্বামীদিগের মধ্যে কথা উঠিল; হরিবংশ একজন বিশিষ্ট ভক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরূপ বলিলেন, ভক্ত হইলেও তাহার পক্ষে প্রচারিত বৈষ্ণব আচার লঙ্ঘন করা ভাল হয় নাই। অন্যদ্বারা নিয়মরক্ষা করাইতে হইলে, নিজেরা সে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। হরিবংশ তাহা শুনিলেন না, সুতরাং অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া গোপাল ভট্ট তাহাকে বর্জ্জন করিলেন। তখন হরিবংশ গোপালের গুরু ও পিতৃব্য প্রবোধানন্দের শরণাপন্ন হইলেন। প্রবোধানন্দ বৃন্দাবনে আসা অবধি নিজের ভজন সাধন লইয়া নিভৃতে নন্দকূপে বাস করিতেন, কোন ভক্ত-সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতেন না, বা বৈষ্ণবাচারের অপেক্ষা রাখিতেন না। হরিবংশ তাঁহারই আশ্রমে থাকিয়া কালক্রমে নিজের এক নূতন মতের সৃষ্টি করেন; সে মতে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ উহার পতি বা বল্লভ বলিয়া রাধাবল্লভ নামে পরিচিত। এজন্য এই নূতন মতাবলম্বীদের নাম হইল "রাধাবল্লভী" সম্প্রদায়। উহারা বৃন্দাবনে রাধাবল্লভজীর সেবা স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের ভক্তেরা একণে গৌরাঙ্গদেবকে মানেন না, বিলাস-কলার মধ্যে সখীভাবে শ্রীরাধার সেবা করেন। পশ্চিম উত্তর ভারতে এই মতের বহুশিষ্য বিদ্যমান।

তৃতীয় শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য। রূপ সনাতনের অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার তুল্য এই বঙ্গদেশীয় অতুল্য ভক্ত বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপাল ভট্টের শরণাপন্ন হন। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ ক্রমে ভট্টগোস্বামী তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। শ্রীনিবাস বিংশাধিক বর্ষকাল বৃন্দাবনে থাকিয়া, সমস্ত শাস্ত্রমন্থন ও তীর্থ দর্শন করিয়া সমস্ত ব্রজভূমি অশ্রুসিক্ত এবং ভক্তগণকে স্নেহসিক্ত করিয়া, পরমভক্ত ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যবস্থায় কিরূপে [illegible] বৈষ্ণবগ্রন্থরাশি ও ভক্তিধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পূ

বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিবাস দেশে ফিরিয়া পরপর দুইটি পত্নীগ্রহণ ও বংশরক্ষা করেন। ইহা গোপাল ভট্টের অত্যন্ত অনভিমত ছিল। এজন্য তিনি অন্যের নিকট যখন সে সংবাদ শুনিলেন, তখন "স্খলৎপাদ" "স্খলৎপাদ" অর্থাৎ শ্রীনিবাসের পদস্খলন হইল বলিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। * শুনিয়া শ্রীনিবাসেরও অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল।

"আজ্ঞা নাহি প্রভুর করিল হেন কার্য্য।
কহিতে প্রভুর আজ্ঞা অভাগ্যেতে ধার্য্য॥"

প্রে॰ বি॰ ১৬শ।

স্তুতঃ আকুমার [illegible]ষ্ঠিক ব্রহ্মব্রতী এই ভট্ট গোস্বামী কখনও তাঁহার শিষ্য-গণের সদাচার বা ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া সহ্য করেন নাই। হিত রিবংশ বা আচার্য্য শ্রীনিবাস অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। ভক্ত হইলে কি র, কেহই সে [illegible] কঠোর সন্ন্যাসীর নিকট প্রশ্রয় পান নাই। বৃন্দাবনে গাস্বামী পদ[illegible]তে আরোহণ করা যে কি অসাধ্য সাধনসাপেক্ষ ছিল, তাহা াহারও বুঝিতে বাকী থাকে নাই।

শ্রীনি[illegible]াসের চলিয়া যাইবার পর যখন বৃন্দাবনে গ্রন্থচুরির সংবাদ [illegible]াসিল, তখন যাঁহারা অতীব বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে [illegible]াপাল ভট্ট অন্যতম। কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্ধানে, তিনিও অত্যন্ত শাকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। আবার গ্রন্থোদ্ধারের সংবাদ আসিলে, সেই [illegible]ববার্তামাত্র সেই অশীতিপর বৃদ্ধের বদনে সংযত হাসির রেখা দেখা [illegible]য়াছি[illegible]। তখন তিনি জরাতুর দেহে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সময় শুধু [illegible]নে এবং "রাসরমণ-শ্রেষ্ঠ" রাধারমণের ধ্যানধারণায় অতিবাহিত [illegible]রিতে[illegible]। ক্রমেই দিবাবসান হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে

* প্রেমবিলাস, ১৬শ, ১৩১ পৃঃ

শেষের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। কোন শব্দ নাই, ক্লেশ নাই, চিন্তা নাই উদ্বেগ নাই,—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ঠিক একশত বর্ষ পরে, ৮৫ বৎসর বয়সে, ১৫০৭ শকের আষাঢ়ী শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে, সেই মহাত্মা মহাপুরুষ মহানন্দে নেত্রনিমীলিত করিলেন। বৃন্দাবন তমসাচ্ছন্ন হই গেল, সে পুণ্যভূমির নামের সঙ্গে যে জ্ঞান প্রতিভার গুরুগাম্ভীর্য্য ছি তাহা ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল! যুগে যুগে যখন ধর্ম্মের মহাপ্রক হয়, তখন আকাশস্থ জ্যোতিষ্কের মত মহাসাধকগণের বিকাশ হইয়া থাকে সূর্য্যগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ্কের ক্ষণিক বিলোপ হইতে পারে, কি যাঁহারা মানবের জ্ঞান-রাজ্যের উপর একবার আলোকপাত করিয়া যা তাঁহাদের বিলয় হয় না।

গোপাল ভট্ট যখন স্থূলদেহ ত্যাগ করিলেন, তখন শ্রীজীব-প্র ভক্তবৃন্দ যথারীতি তাঁহার শবদেহের অন্ত্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, ৺রাধারম মন্দিরের পশ্চাতে তাঁহার সমাধিস্থাপন করিলেন এবং শিষ্যবর্গের সাহায্যে মহাসমারোহে সেই স্বর্গগত মহাত্মার উদ্দেশ্যে বিরাট মহো করিলেন। এখনও প্রতিবৎসর আষাঢ় মাসে শ্রীগোপাল ভট্টের তিরো তিথিতে রাধারমণের মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। এই ম গৌড়ীয়ভক্তগণের একটি প্রধান ও পবিত্র আশ্রয়স্থল। এমন অ বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন, যাহারা শ্রীচৈতন্যকে মানেন না, কিন্তু গো ভট্টকে মানেন। বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রের শাশ্বত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গোপাল চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন।

——:*:

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

"শ্রীমান্ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহান।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যাঁর গৌরাঙ্গ পরাণ॥
পণ্ডিত সুশান্ত মহা গম্ভীর স্বভাব।
শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব॥

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী।

—:•:—

আনন্দ-কাননে

শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করিয়া নিজ ধর্ম্মমত সংরক্ষণ ও প্রচার জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পাত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে সমর্পিত কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপযুক্ত করিয়া করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ ভারত হইতে গোপাল ভট্ট, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লোকনাথ ও পরে রঘুনাথ ভট্ট, উত্তর বঙ্গ হইতে রূপ ও সনাতন এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে রঘুনাথ দাসকে আহ্বান করিয়া, শিক্ষাদীক্ষাদানে সমর্থ করিয়া, ক্রমে ক্রমে সময় মত বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সকলের কথাই আমরা বলিয়াছি, কেবল দুই রঘুনাথের কথা বাকী আছে। ইহারা ভট্ট-গোস্বামী ও দাস-গোস্বামী নামে খ্যাত। অগ্রে ভট্ট গোস্বামীর কথা বলিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করতঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও বিশিষ্ট অধ্যাপক হইয়া, নবদ্বীপে নিজের টোল পাঠী খুলিয়া যখন নিমাই বিদ্যাসাগর নামে প্রখ্যাত হন, তখন তিনি একবার পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পথে তালখড়ি গ্রাম হইতে লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া পদ্মাপারে নানা স্থানে বিচরণ করেন। এই সময়ে তিনি একদা পদ্মাতীরবর্ত্তী রামপুর গ্রামে উপনীত হন। ঐ স্থানে তপন মিশ্র নামে একজন ভাগ্যবান "সারগ্রাহী" ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বপ্নে

দেখিলেন, যেন একজন কেহ দেবমূর্ত্তিতে, উদিত হইয়া তাঁহাকে কহিতেছেন,—

"নিমাই পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো নর নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁহার জগৎ কারণ॥"

চৈ. ভা. আদি ১২শ

স্বপ্ন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, নিমাই পণ্ডিত শ্রীভগবানের অবতার, তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিলে ভবার্ণব পার হইবার ভয় থাকিবে না। সেই আশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি নিমাই এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও নিজের একান্ত বাসনা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। নিমাই নিজের অবতারত্বের উক্তি কখনও সমর্থন করিতেন না। তিনি শুনিবা মাত্র প্রথমেই স্বপ্নবৃত্তান্ত অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিলেন, এবং মিশ্রকে কলির যুগধর্ম্ম যে হরিনাম-কীর্ত্তন, তৎসম্বন্ধে নানা শাস্ত্রোপদেশ দিলেন। তপন মিশ্র যখন তাঁহার সহিত নবদ্বীপে যাইবার ব্যগ্রতা জানাইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে নবদ্বীপে না যাইয়া কাশীধামে যাইবার উপদেশ দিলেন, সেখানে তাঁহার সহিত যখন মিশ্রের দেখা হইবে, তখন তিনি সাধ্য সাধনের উপদেশ পাইবেন।

"গৌর কহে এই কথা রাখহ গোপনে।
এবে কাশীধামে তুহু করহ প্রয়াণে॥
আমাসহ তহি কালে সাক্ষাৎ হইবে।
তব মন অভিলাষ অবশ্য পূরিবে॥"

:অদ্বৈত-প্রকাশ

এই উপদেশ-বলে তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। সেখানে দুই বৎসর পরে ১৪২৭ শকে ধার্ম্মিক-প্রবর তপন মিশ্রের এক অপরূপ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।

আমরা এই অপূর্ব্ব বালকের বাল্য-জীবনের বিশেষ কোন সংবাদ রাখি না। তবে যে পিতামাতা মুক্তিকামী হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতঃ অবিমুক্ত কাশীধামে আসিয়া ভগবৎ-সাধনায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহাদের অপরূপ মানসিক প্রকৃতির প্রতিকৃতি-স্বরূপ যে স্বরূপ ত্যাগী মহাপুরুষের জন্ম হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। রঘুনাথ ভাবী জীবনে পিতৃবংশ আলোকিত করিবার জন্য রূপে মায়ের কোল আলো করিয়া, গুণে ও জ্ঞানে বাল্য-শিক্ষকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, ৮।৯ বৎসরের বালক হইলেন।

এই সময়ে অকস্মাৎ একদিন কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে তপন মিশ্র সোনার বরণ গৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন, গৌরাঙ্গকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। আর মহাপ্রভুর পূর্ব্ব কথা কিরূপে ফলিল দেখিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সাধনতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু যে দুইমাস কাশীতে ছিলেন, তিনি প্রিয়ভক্ত বৈদ্য-বংশীয় চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেন, কিন্তু প্রত্যহ ভিক্ষানির্ব্বাহ করিতেন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তপন মিশ্রের গৃহে। তপন-পুত্র বালক রঘুনাথ তখন প্রাণপণে নিজগৃহে শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতেন; তাঁহার পাতের প্রসাদ খাইতেন, তাহার উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিতেন, প্রভু শয়ন করিলে তাঁহার পাদসম্বাহন করিতেন। এই ঠাকুরটির [illegible]র্য্যা-কুশলতা বুঝাই কঠিন; তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে

চতুষ্পাঠের ছলে গোপাল ভট্টকে কিরূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, সে কথা বলিয়াছি। এখন কাশীতে আসিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসী-দিগকে ভক্তিবাদী করিবার কালে দুইমাস কাল থাকিয়া বালক রঘুনাথকে আত্মসাৎ করিলেন। যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র যেমন চলে, এই ঠাকুরটির হাতে তাঁহার ভাবী শিষ্যগণও সেইরূপ ক্রীড়নকের মত ছুটিয়া আসিতেছিলেন।

প্রভু কাশী হইতে নীলাচলে গেলেন। বালক রঘুনাথ তাঁহাকে ভুলিতে পারিলেন না, তাঁহার সঙ্গলাভের পর কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। কাশীতে উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট তাঁহার শিক্ষা চলিতে লাগিল। ক্রমে বালক যুবক হইলেন, এবং তাঁহার পিতামাতা বার্দ্ধক্য-দশায় উপনীত হইলেন। গাভী তৃণ খায়, কিন্তু মন থাকে বৎসের দিকে, রঘুনাথেরও তাহাই হইল; তিনি শাস্ত্র পড়িতেন, পণ্ডিত হইলেন, কিন্তু নীলাচলের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট ছিল। অবশেষে যুবক রঘুনাথ একদা এত ব্যাকুল হইলেন যে, পিতামাতার আজ্ঞা লইয়া, মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষে রথযাত্রীদিগের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে তাঁহার নিজ বস্ত্রাদি ও প্রভুর জন্য কাশীর কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি এক ঝালি পুরিয়া লইয়া রঘুনাথ গৌড়পথে পুরী চলিলেন। ঝালি বহন করিবার একজন লোক সঙ্গে গেল। পথে তাহার এক সঙ্গী জুটিল; তিনি কায়স্থ, নাম রামদাস বিশ্বাস। ইনি

"সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্য-প্রকাশ-অধ্যাপক
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক।"

চৈ. চ. অন্ত্য ১৩

অষ্টপ্রহর রামনাম জপ করেন; তিনি আসিয়া রঘুনাথের সঙ্গে

জুটিলেন এবং সুন্দর ব্রাহ্মণমূর্তি দেখিয়া তাহাকে পথে নানা ভাবে সেবা করিতে লাগলেন; এমন কি, মধ্যে মধ্যে রঘুনাথের ঝালি বহন করেন এবং সুযোগ পাইলে পদসেবা করিতে ছাড়েন না। রঘুনাথ ইহাতে বড় সঙ্কুচিত হইতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারিতেন না।

অবশেষে রঘুনাথ পুরীতে পৌছিয়া মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন। দণ্ডবৎ হইয়া রঘুনাথ যখন তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন, অমনি প্রভু তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসাদ দিয়া প্রভু তাঁহাকে সেদিন কাছে রাখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণের সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন, নিজ ভৃত্য গোবিন্দকে বলিয়া তাহার জন্য এক বাসা করিয়া দিলেন। সেখানে রঘুনাথ রথযাত্রা হইতে দোল পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আটমাস কাল থাকিয়া মহাপ্রভুর লীলারসে মহোল্লাসে বাস করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। চরিতামৃতে আছে,

"রঘুনাথভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রাঁধে সেই হয় অমৃতের সম।"

রঘুনাথের নানাগুণের মধ্যে এই রন্ধননিপুণতা একটি প্রধান গুণ, এ গুণ সকলের থাকে না। মহাপ্রভু তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইতেন এবং ভক্ত রঘুনাথও প্রভুর ভোজনের প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন।

এই ভাবে আট মাস কাল চলিয়া গেল, তখন প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিলেন, কারণ বিলম্বে হয়ত তাঁহার পিতামাতার সেবার ত্রুটি হইতেছিল। যাইবার কালে তাঁহাকে প্রধানতঃ তিনটি উপদেশ দিলেন;

বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন, একান্ত মনে বৃদ্ধপিতামাতার সেবা করিতে বলিলেন, আর কোন বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট ভাল ভাবে ভাগবত অধ্যয়ন করিবার উপদেশ দিলেন। তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য কে বুঝিবে? সর্ব্বশেষে পুনরায় একবার নীলাচলে আসিবার জন্য উপদেশ দিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে স্পর্শে রঘুনাথ প্রেম-বিকম্পিত হইয়া, স্বরূপাদি ভক্তগণের নিকট সজল নেত্রে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কাশীতে আসিয়া রঘুনাথ মহাপ্রভুর উপদেশগুলির একটিও ভুলিলেন না। একজন ভক্ত বৈষ্ণব অধ্যাপকের নিকট নিয়ত ভক্তিভাবে ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন। চারি বৎসর কালের মধ্যে একে একে তাঁহার পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিলেন। পুত্রের কর্ত্তব্যানুসারে তাঁহাদের শ্রাদ্ধকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া, অকৃতদার রঘুনাথ আকাশগামী বিহঙ্গের মত নির্মুক্ত হইয়া, এ জীবনের মত সংসার ত্যাগ করিলেন।

সর্ব্বারম্ভে তিনি পুনরায় নীলাচলে আসিলেন এবং সেখানে পুনরায় প্রভুর চরণ-প্রান্তে আটমাস কাল থাকিয়া সাধ্যসাধনতত্ত্বাদি সকল শিক্ষা লাভ করিলেন। এবার সে সংসার বিরাগী শিষ্যটিকে প্রভুর কিছুই অদেয় ছিল না। প্রভু তাহাকে পূর্ব্ব হইতে চিনিয় ছিলেন; তিনি যে ভাগবতের উপযুক্ত পাঠক হইবেন, তাহা অনুমান করিয়া কয়েক বৎসরাবধি তাহাকে দিয়া সেই শাস্ত্র অধিগত করাইয়া ছিলেন নীলাচলে গদাধর ভাগবতের পাঠক, তাঁহার ভাগবত পুঁথি দিনে দিনে অশ্রুজলে মুছিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে পাঠের ফল ভক্ত-হৃদয়ে মুছিয় যাইবার নহে। কিন্তু বৃন্দাবনে তেমন পাঠক নাই, অথচ সেখানে তেমন পাঠক না হইলে চলে না; তাই মহাপ্রভু রঘুনাথকে পাঠক

রূপে প্রস্তুত করিয়া বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁহাকে শ্রীধামে পাঠাইলেন। প্রভু বলিলেন,

"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাহা যাই রহ রূপসনাতন স্থানে॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণভগবান॥"

চৈ, চ, অন্ত্য, ১৩ শ

আদেশের ভাষার ভঙ্গি দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' একথাটি বলা আছে; তাঁহার লীলার বর্ণনা যে ভাগবতে তাহা পাঠ করিলে কৃষ্ণকথাই বলা হইবে, কৃষ্ণ তখন কৃপা করিবেন। রঘুনাথ আজ যে কৃপা লাভ করিলেন, তাহাই কৃষ্ণকৃপার সরণি। রঘুনাথ তাহা বুঝিলেন, অন্য সকল ভক্তে তাহা জানিতেন। এইবার মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের শেষ বিদায়ের দৃশ্য, তাহা অতি মনোরম। প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন, আর রঘুনাথ বারংবার পায়ে গড়াগড়ি যাইতেছেন। প্রভু তাঁহাকে উপহার দিলেন,—

"চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা
ছুটা পান বিড়া মহোৎসবে পাইয়া ছিলা॥"

তুলসীর দীর্ঘ মালা ভক্তের জন্য উপহার, আর পান বিড়া বোধ হয় যেন ভাগবত পাঠকের উপহার। ইষ্টদেবতার মত সেই দীর্ঘ মালা মাথায় করিয়া রঘুনাথ অবশেষে বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

(২)

বৃন্দাবনে।

রঘুনাথ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত বৃন্দাবনে আসিয়া রূপসনাতনের আশ্রয় লইলেন। উঁহারা চিরপরিচিতের মত এই নূতন ভক্তটীকে আপন জন করিয়া গোস্বামীদের গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া লইলেন। রঘুনাথ আসিয়া ব্রজপ্রবাসীর জীবনে এক নূতন তরঙ্গ তুলিলেন। গোস্বামীরা ইষ্ট-সেবা, জপসাধন এবং গ্রন্থলেখা লইয়াই থাকিতেন; তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে শাস্ত্র-বিচারই অধিক হইত, সাধারণের নিকট ভক্তি প্রচার তেমন হইত না। রঘুনাথ আসা অবধি শ্রী ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞানী বা মূর্খ, বৈরাগী বা গৃহস্থ - সর্ব্বজাতীয় লোকের নিকট কৃষ্ণকথার রসমাধুর্য্য বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, সরল ভাষায় লীলার কথা সকলের নিকট উপকথার মত উপভোগের বিষয় করিয়া তুলিলেন। রঘুনাথের আগমনের অব্যবহিত পর হইতে প্রত্যহ বিকালে ৺ গোবিন্দজীর মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যাসাসন পড়িত, উহাতে উপবিষ্ট হইয়া রঘুনাথ মধুর কণ্ঠে, শুক-মুখের গীত যে ভাগবতী কথা, তাহাই সকলকে শুনাইতেন।

সমগ্র মহাপুরাণগুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব প্রধান—গম্ভীর ভাষায়, মধুর কবিত্বে ও সতর্ক সিদ্ধান্তের সুন্দর সমাবেশে এই গ্রন্থের তুলনা নাই। ভাগবত পাঠ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহা বোধগম্য ও ফলপ্রদ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে চাই পাণ্ডিত্য—নতুবা শাস্ত্রের সমন্বয় হয় না, ভাষাকে জলের মত সরল করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ চাই ভাব ও চিন্তাশীলতা, নতুবা ইহার কবিত্বের মাধুর্য্য নিজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, পরকে বুঝান ত দূরের কথা। তৃতীয়তঃ চাই পাঠকের মধুর কণ্ঠ, নহিলে ভাষার

বক্তার মরমে প্রবেশ করিয়া শ্রোতাকে পুলকিত করিতে পারে না। চতুর্থতঃ চাই যাহাতে সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে, পুরাণ-পাঠকের তেমনই মধুর মুর্ত্তি, যাহা দেখিলে আপনি মাথা নোয়াইয়া পড়ে। পঞ্চমতঃ সর্ব্বোপরি পাঠক প্রকৃত ভক্ত না হইলে চলে না; আপনি না গলিলে কি পরকে গলান যায়? হৃদয়ের ভক্তিরস নয়ন পথে অশ্রুধারা য়, উচ্ছ্বসিত ভাষার মধ্য দিয়া শ্রোতার হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত করে; কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে এবং প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে; এইজন্য প্রারম্ভেই ভাগবতের প্রধান বিষয় যে কৃষ্ণ-কথা, তাহাকে শ্রোত্রমনোভিরাম" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভাগবত-পাঠক হইতে হইলে, এই যে প্রধান পাঁচটি গুণ, তাহার বগুলিই একাধারে রঘুনাথে ছিল। রঘুনাথ সুপণ্ডিত এবং বৈষ্ণব গুরুর নিকট নিয়মিত একাগ্র অধ্যয়নের ফলে ও অভ্যাসের বলে ভাগবত গ্রন্থকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রঘুনাথ ভাবপ্রবণ কবি, তাঁহার কোন গ্রন্থ থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার সমস্ত জীবনটিই কবিত্বময়; কবির হৃদয় লইয়া তিনি কাব্যের মাধুর্য্য অনুভব করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন। তৃতীয়তঃ রঘুনাথ নিজে যেমন স্বভাবতঃ কোকিল কণ্ঠ, তেমনই প্রকৃষ্ট বিধানে রাগ-রাগিনী শিক্ষা করিয়া সঙ্গীত-বিস্তার পারদর্শী ছিলেন। নিজ কর্ণে শুনিয়া কবিরাজ গোস্বামী রঘুনাথের স্বর-মাধুর্য্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥"

যাঁহার বাঁশীর সুরে ব্রজের নরনারী ত বটেই, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত আলোড়িত, আত্মবিস্মৃত, সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছুটিত, স্বর-লহরী তাঁহারই লীলারস মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে গিয়া সুগায়ক রঘুনাথ সমগ্র

শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে পাগল করিতেন, সভা মাঝে যে আনন্দের তরঙ্গ তাহা উঠিত উহার আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন চতুর্থতঃ রঘুনাথ যে সুপুরুষ ছিলেন, তাহা বলিয়াছি ; ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে তাঁহার সুকুমার দেহে যে রূপের প্রভা খেলিত, তাহা দেখিলে সকলে মুগ্ধ হইতেন। সর্ব্বশেষে রঘুনাথ ভক্তকুল-চূড়ামণি, ভাগবত পড়িতে গেলে প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িতেন, বিগলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার নেত্র রুদ্ধ হইয়া আসিত। আমার কথা কি শুনিবেন, যিনি ভাষার মধ্যে নিহিত করিয়া সংক্ষেপে নিগূঢ় তত্ত্ব অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার ভাষা কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া ভাবকে ফুটাইয়া দিয়াছে, সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের কথা শুনুন :—

"রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রু কম্প গদ্‌গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্ররোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে-বিহ্বল হয়, তবে কিছুই না জানে॥"

চৈ. চ. অন্ত্য ১৩শ।

কৃষ্ণের মাধুর্য্য বা তাঁহার লীলা-ভূমির সৌন্দর্য্যের কথা যখনই তিনি পড়িতেন বা পরের মুখে শুনিতেন, তখনই তিনি প্রেমে একান্ত বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইতেন।

এই রঘুনাথ আসিয়া যখন অপরাহ্নে গোবিন্দজীর মণ্ডপে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন বৃন্দাবনে নূতন ভাব-তরঙ্গ উঠিল গোস্বামী ও ভক্তেরা সকলে আসিয়া সে সভা শোভন করিতেন বৃন্দাবনে সংবাদ রটিল, শব্দ পড়িয়া গেল ; ক্রমেই শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি

হতে লাগিল। বিকাল হইলেই যুবা বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, ভক্ত-অভক্ত
লেই আসিয়া গোবিন্দের দ্বারে উপস্থিত হইতেন। "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ," "সাধু,
'রবে সে সভা মুহুর্মুহু ঝঙ্কৃত হইত; কত পাষাণ দ্রবীভূত হইত, কত
বান ডাকিত, কত শুষ্ক-হৃদয় মুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া উদ্বোধিত হইত।
রূপ ভাগবত পাঠ শ্রবণ, শাস্ত্রানুযায়ী কথকতা শোনা, বৃন্দাবনের
কের প্রকৃতির অনুরূপ আমোদ ও আরামের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।
নাথ যখন ভরত-বাক্যে ভারতভূমিকে মধুময় মঙ্গলময় করিতে
তে ভাগবত পুঁথি বন্ধ করিতেন, তখন সভামধ্যে কেমন হতাশের
বহিত; তিনি যখন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন, শত শত লোক
পদপ্রান্তে শিরঃ লুণ্ঠন করিত। কতজনে তাঁহার শিষ্য হইতে
ত, সকলকে তিনি শিষ্য করিতে চাহিতেন না। কিন্তু তিনি কাহারও
ক্তের হাত এড়াইতে পারিতেন না, কেহ কেহ ভক্তির পরীক্ষা
তাঁহার কৃপালাভ করিয়া দীক্ষা লইতেন। গৌড়ীয় ভাগ্যবান
তাঁহারই শিষ্য হইতেন, পশ্চিম দেশীয় লোকেরা গোপাল ভট্ট
ীর আশ্রয় লইতেন। সে অধিকার বিভাগের কথা পূর্ব্বে
ই।

"গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র।
গৌড়িয়া আইলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র॥"

অনুরাগবল্লী।

গোবিন্দজীর প্রথম মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং ভগ্ন দশায় পড়িয়াছিল;
সম্মুখে কোন মণ্ডপ ছিল না। রঘুনাথ তাঁহার এক ধনী ভক্তকে
গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং বিগ্রহের জন্য বংশী ও
কুণ্ডল প্রভৃতি মূল্যবান অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিলেন।
সম্মুখে সুন্দর জগমোহন গঠিত হইল। সেই স্থানে বসিয়া

রঘুনাথ নিজ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভাগবত ব্যাখ্যা ক
গিয়াছিলেন।*

মহাপ্রভুর যেমন আজ্ঞা, রঘুনাথ—তাহাই করিয়াছিলেন।
রূপসনাতনের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ছিলেন। f
নিজের নামে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, কোন নূতন কুঞ্জ
করেন নাই, কোন নূতন শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। ি
আসিয়া—

"গোবিন্দ চরণে কৈল আত্ম সমর্পণ
গোবিন্দ চরণার বিন্দ যার প্রাণধন॥"

রামানুজ লক্ষ্মণের মত তিনি রূপসনাতনের নিজ ভ্রাতা অনুপমের
অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি আনন্দময় রূপে বৃন্দাবনে আসিয়াছি
যতদিন জীবিত ছিলেন, বন্ধুভক্ত শিষ্যানুশিষ্য সকলকেই আনন্দধা
অভিনন্দিত করিয়া ছিলেন। শুধু প্রকাশ্য সভায় আসিয়া ভাগ
সুব্যাখ্যা করিয়া লোককে মোহিত করা নহে, তিনি নিজের
বসিয়াও মধুময় জীবন যাপন করিতেন। দিবসের অষ্ট প্রহর
পূজার্চ্চনায় ও কৃষ্ণকথায় ব্যাপৃত করিতেন। গ্রাম্যবার্ত্তা ও বৈ
নিন্দা মুখে আনিতেন না বা কানে শুনিতেন না; তিনি ভাবি
জগতের সকলেই সাধু, সকলেই কৃষ্ণ-ভজন করে। এ সংসারে
জালমসার সংস্পর্শে না আসিয়া এই সর্ব্বত্যাগী ভক্ত স্বচ্ছন্দ ইহলো
সার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চরমপথগামী হইলেন। সনাতন গে

* বহু বৎসর পরে ১৫১২ শকে এই মন্দির জীর্ণ দশায় পড়িলে, মহারাজ মা
বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোবিন্দজীর জন্য বিরাট মন্দির ও জগমোহন নির্ম্মাণ করি
তাহার বিবরণ রূপ গোস্বামীর জীবনবৃত্তে দিয়াছি।

পারগত বয়সে তনুত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার অদর্শন সহ্য করিবার জন্য রঘুনাথ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। নীলাচল হইতে বিদায় কালে মহাপ্রভু তাঁহাকে জগন্নাথ দেবের প্রসাদী চৌদ্দ হাত তুলসীর মালা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন; শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত , তিনি ঐ মালা গাছটি গলায় দিয়া ইষ্ট নাম জপ করিতে অনন্ত য় অভিভূত হইয়াছিলেন। সেদিন ১৪৭৬ শক, আশ্বিন মাসের । দ্বাদশী তিথি। ঐ তিথিতে বৃন্দাবনে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব া থাকে। মৃত্যুকালে রঘুনাথের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ নাই; গোস্বামী দের মধ্যে কেহ এত অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন নাই। গোবিন্দজীর রের অপর দিকে যে স্থান এক্ষণে চৌষট্টি মহান্তের সমাধি বা সমাজ । পরিচিত, সেই স্থানে রঘুনাথের সমাধি আছে।*

---

* ইহারই পার্শ্বে মথুরার প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী বা শেঠ ভ্রাতৃগণের প্রতিষ্ঠিত "শ্রীরঙ্গনাথ বিরাট মন্দির বর্ত্তমান। ইহাকে সাধারণতঃ শেঠদের মন্দির বলে।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

—— ——:*:-

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥"

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

—:*:—

[১]

বালক রঘুনাথ।

বৈদিক যুগে এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরাই আধ্যাত্মিকতায় সর্ব্বোচ্চ আরোহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহারাই ব্রহ্মবাদী ঋষি, তাঁহারাই হ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাকারক; তাঁহারাই ব্রহ্মদর্শী, তাঁহারাই হিন্দুর বেদোপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা; তাঁহারাই নষ্ঠ সাধক, তাঁহারাই নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে পরমতত্ত্বে লীন হইতেন; ত্যাগই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীই ভারতের গুরু, ত্যাগ ভিন্ন হ্মণ হইতেন না। সেই প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয় রাজন্যদিগের মধ্যে কেহ কহ সে উচ্চ স্তরের অংশীদার হইতেন; অন্ততঃ দুইজনের নাম করিতে ারি—মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও রাজর্ষি জনক—যাঁহারা ব্রাহ্মণকেও ব্রহ্মতত্ত্বের মন্ত্রোপদেশ দিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র স্বশক্তি-সাধনায় ব্রাহ্মণ হইয়া ীর উদ্ভাবন করেন, রাজর্ষি জনক ঋষিদিগকেও ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ য়াছিলেন।

আধুনিক যুগে বহু ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তকের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ভক্তিবাদ তবর্ষে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; শ্রীচৈতন্যদেব যখন সেই ভক্তিবাদের াধনে বৃন্দাবনে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বহু হ্মণ-শিষ্য গোস্বামিপদারূঢ় হইয়া সেই মতকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে

গিয়া ত্যাগের মহিমা সমুজ্জল করিয়াছিলেন। তখনও ব্রাহ্মণেতর জাতীয় কায়স্থ-বংশীয় দুইটি বঙ্গীয় রাজকুমার কঠোর ত্যাগের বিরাট আদর্শ এবং প্রগাঢ় ভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়েরও অত্যধিক শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। উঁহাদের একজন উত্তর বঙ্গের রাজকুমার এবং লক্ষপতির একমাত্র পুত্র নরোত্তম দত্ত এবং অন্যজন পশ্চিম বঙ্গের রাজন্য-বংশীয় লক্ষপতির একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস। "ঠাকুর মহাশয়" নরোত্তম বহু ব্রাহ্মণের পূজার্হ ছিলেন, তাঁহার কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বে বলিয়াছি * এবং যে রঘুনাথ বৃন্দাবনের গোস্বামী দিগের অন্যতম ও "দাস-গোস্বামী" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, দৈন্যের মহিমায় এবং সাধ্যসাধনের কঠোরতায় সকলে যাঁহার নিকট পরাজিত, তাঁহারই মধুর চরিত্রের ক্ষীণ আভাস দিয়া আমার এই সপ্ত-গোস্বামীর চরিত্র-চিত্রণের দুষ্প্রয়াস শেষ করিব।

বঙ্গদেশে রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধুনী গঙ্গা তাঁহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামক ত্রিধারায় পুনর্বিমুক্ত হইয়া স্নেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছেন, সেই "মুক্ত"-ত্রিবেণীর সন্নিকটে এই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত রাজার সপ্ত পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গম-স্থলে সাধনাসন পাতিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই তপঃ-ক্ষেত্রগুলি একত্রযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দু-রাজত্ব কালে এই স্থানে সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র ছিল। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী এবং উত্তরে সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত বলিয়া ইহা ক্রমে একটি বাণিজ্য বহুল সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্যে আছে :—

* এই পুস্তকের ৪০-৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য

"সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানাধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ খ্যাতি অনুপম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥"

মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামের সে সমৃদ্ধি ছিল। উহা তখন পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লইয়া একটী মুলুক্ বা খণ্ডরাজ্যে পরিণত হয়। পাঠানেরা যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে তাঁহাদের অন্ততঃ দুই শত বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যেও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় নাই। সপ্তগ্রাম মুলুকের বিলি ব্যবস্থা লইয়া সর্ব্বদা এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত যে উহাকে লোকে "বুলবগ্ খানা" বা বিদ্রোহস্থান বলিত। পাঠান সুলতানগণ স্বাধিকারভুক্ত দেশকে কতকগুলি মুলুক্ বা মহলে বিভক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বার্ষিক মোক্তা রাজস্ব আদায়ের অঙ্গীকারে প্রতিপন্ন লোককে ইজারা দিতেন। যাহারা এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, তাহাদিগকে সাধারণতঃ মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বলা হইত। মোগল আমলে এই সকল মুলুক্ লইয়া এক একটি সরকার গঠিত হয় এবং মজুমদারেরা জমিদার হন। এখন একটা পরগণার আংশিক অধিকারীকেও জমিদার বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে দশ বা ততোধিক পরগণা অন্তর্ভুক্ত থাকিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি; তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মুলুক এবং বার্ষিক বারলক্ষ টাকা মোক্তা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইজারা লইয়া ছিলেন দুই জন মৌলিক কায়স্থ—দুই ভ্রাতা, হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস। পাঠান আমলে বঙ্গের বহুস্থানে মৌলিক কায়স্থগণ অভিযান-পরায়ণ উপনিবেশিক, জাতিরক্ষক সাহসী বীর এবং প্রবল পরাক্রান্ত শাসকরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহারাই গুরু পুরোহিত রূপে বহু ব্রাহ্মণের

এবং আত্মীয় কুটুম্বরূপে বহু কুলীনের আশ্রয় দাতা ছিলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধনও সেই জাতীয় কায়স্থ বীর; তাঁহাদের পিতৃপুরুষের কোন বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন বিশেষ গুণ, সম্মান বা প্রতিপত্তি না থাকিলে অসংখ্য রাজানুগৃহীত পাঠান আমীরের কবল হইতে তাঁহারা কোন মুলুকের বন্দোবস্ত লইতে পারিতেন না। বন্দোবস্ত লইলেও তাঁহাদের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল, সে কথা পরে বলিতেছি। এই ভ্রাতৃদ্বয় "বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ" (চৈ, চ,) অর্থাৎ তাঁহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়া আট লক্ষটাকা লাভ থাকিত। ইহা ত শুধু ভূমি-করের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় শুল্ক হইতে তাহাদের আরও ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় হইত। সুতরাং তাহাদের মোট বার্ষিক আয় ১০।১২ লক্ষ টাকার কম নহে, উহা দেখিয়া কত জনের নেত্র-পীড়া জন্মিত। বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম হইতে এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদতুল্য বসতি বাটী ছিল। সেখানে সে প্রাসাদ এখন নাই, তবে রঘুনাথের পাটবাড়ী আছে। উহা বৈষ্ণবভক্তগণের তীর্থস্থল।

দাস ভ্রাতৃদ্বয় এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া আত্মবিস্মৃত হন নাই। উভয় ভ্রাতাই ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সৎকার্য্যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া দানশীল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। "গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা" বলিয়া প্রবাদ-বাক্য এই যশঃকীর্ত্তন করিত। কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন।

"মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রামদিয়া করেন সহায়॥" চৈ. চ. মধ্য ১৬শ

নদীয়া অঞ্চলের বহুব্রাহ্মণ উঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি বা সাময়িক বৃত্তি পাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। বিপুল তাঁহাদের বিভব, ধর্ম্মে তঁাহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভরা তাঁহাদের যশঃ, রাম লক্ষ্মণের মত তাঁহারা অভিন্ন-হৃদয়—অভাব তাঁহাদের কিছুরই ছিল না। কেবল মাত্র বহুকাল পর্য্যন্ত উভয়ে অপত্যস্নেহে বঞ্চিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ হিরণ্য একেবারেই নিঃসন্তান, কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস। তিনি সম্ভবতঃ ১৪১৬ শকে বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্যাত্মা পিতা দান-ধর্ম্মে খ্যাত, এই পুত্র দৈন্য-ধর্ম্মে সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন; পিতা ক্রিয়াকর্ম্মে জাকজমকে অতুল সম্পদ লুটাইয়া দিতেন, পুত্র কামিনী-কাঞ্চনের অঞ্চল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় নিষ্ঠুর ভাবে দেহ-নির্য্যাতন করতঃ নশ্বর জীবনের অতিরিক্ত সদ্ব্যয়ই করিয়াছিলেন। পিতৃপুণ্য পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া সুকৃতি-সাধনের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা বিশিষ্ট ভাবেই অর্জ্জন করিয়াছিল।

পুত্রবাৎসল্যের একমাত্র সুপাত্র এবং বিপুল বিত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই রঘুনাথ; রাজোচিত সম্পত্তির মালিক তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত রাজপুত্রই চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁহাদের ঘরে এক সাত্ত্বিক ধার্ম্মিককে আনিয়া দিয়াছিলেন। রঘুনাথের শৈশব কাল হইতে সকলেই তাহার পরিচয় পাইতেন। শৈশবই পরিণত বয়সের আভাস দেয়। রঘুনাথের মুখে, চাহনিতে, ভাব-ভঙ্গিতে এক শান্ত সুশীল সৌম্যভাব প্রকাশ পাইত; সুখাদ্যে অরুচি, বেশভূষায় অনাদর, ক্রীড়া-কোলাহলে অতৃপ্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইতেন। চরিতামৃতে আছে:—

"সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥"

বিষয়-বিলাসে উদাসীন হইলে কি হয়, বাল্য হইতে রঘুনাথের তীক্ষ্ন প্রতিভা এবং পাঠাভ্যাসে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তখনও বঙ্গদেশে সংস্কৃতের বড় আদর ছিল; শুধু নবদ্বীপ নহে, সপ্তগ্রামে ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থানে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার আদর্শ পীঠ ছিল। হিরণ্য গোবর্দ্ধন উভয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহারা রঘুনাথকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য সুব্যবস্থা করিলেন। বহুসংখ্যক বিদ্বানকে বৃত্তিভুক্ গৃহশিক্ষক রাখিয়া উঁহারা স্বচ্ছন্দে সে ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে রীতি, সে আদর্শ এ দেশের নহে। বিলাসের কোলে পালিত হইলে প্রকৃত মানুষ গড়ে না, ধনীর পুত্রকে শিক্ষিত না করিয়া গর্ব্বিত ও পথভ্রষ্ট করা হয়। সেজন্য গোবর্দ্ধন প্রাচীন হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে পুত্রটিকে গুরুগৃহে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহাদের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত বলরাম আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর গ্রামে ছিল। তাঁহাকেই রঘুনাথের আচার্য্য-গুরু নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহারই গৃহে বালককে রাখিয়া দিলেন। সেখানে অন্য শিক্ষার্থীর মত সাধারণ পানাহারে সন্তুষ্ট থাকিয়া বালক রঘুনাথকে বিদ্যার্জ্জন করিতে হইত। তাহাতে উঁহার কোন কষ্টবোধ ছিল না, কারণ ঐরূপ কঠোর জীবনের জন্য পূর্ব্বজন্ম হইতে তিনি প্রস্তুত ও অভ্যস্ত ছিলেন।

আচার্য্য বলরাম কেবল পণ্ডিত নহেন, তিনি ধার্ম্মিক ও সাধুসেবক ছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী কেহ নিকটে আসিলে, উঁহারা তাঁহার গৃহে আশ্রয়ের আমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দে অধিষ্ঠান করিতেন। রঘুনাথ সেই গৃহে থাকিয়া যেমন শাস্ত্র-শিক্ষা করিতেছিলেন, তেমনই ভক্তোচিত দীনতা ও সেবাধর্ম্ম অভ্যাস করিবার স্বাভাবিক সুযোগ পাইলেন। রঘুনাথ সে সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যতে তাঁহার মধুময় স্তবাবলীর রচনা-কৌশলে প্রমাণিত হয়। আচার্য্যের গৃহে কোন

ভক্ত বা সাধু আসিলে গুরুশিষ্যে তাঁহার সেবা করিতেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়াও মানুষের জীবনের গতি কিরূপে স্বাভাবিক পথে নিয়ন্ত্রিত হয়।

এমন সময়ে রঘুনাথের বয়স যখন ৯।১০ বৎসর মাত্র, তখন হরিদাস ঠাকুর বেণাপোলের লীলা সাঙ্গ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই চাঁদপুরে উপনীত হইলেন। * বলরাম তাঁহাকে পরমযত্নে নিজগৃহে আনিলেন এবং তাঁহার জন্য বাহিরে একখানি ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

> নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
> বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাপন॥
> রঘুনাম দাস বালক করে অধ্যয়ন।
> হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দর্শন॥"

বালক রঘুনাথ যখনই যান, তখনই দেখেন নির্জ্জন কুটীরে ঠাকুর হরিদাসের জপ-ঝঙ্কার বা কীর্ত্তন চলিতেছে; বিরাম নাই, অবসাদ নাই, একনিষ্ঠ সাধকের নামজপ দিবারাত্রি চলে, নচেৎ যে সংকল্পানুযায়ী সংখ্যা পূর্ণ হয় না। এ বড় মহান্ দৃশ্য! এই অলৌকিক আদর্শের ছাপ রঘুনাথের কোমল হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গেল। পরিণত বয়সে তাঁহার যে কঠোর ভজন নিষ্ঠা জন্মিয়াছিল, দিবসের ৬০ দণ্ডের মধ্যে ৫৬ দণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহার ভজনে যাইত, সে নিষ্ঠার উৎপত্তির কারণ এইখানে। হরিদাসের কেমন এক সুদৃষ্টি রঘুনাথের উপর পড়িল। তিনি ভিক্ষা-নির্ব্বাহের জন্য আচার্য্যগৃহে আসিলে প্রত্যহ অধ্যয়ন-নিরত সেই বালককে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, কত স্নেহ দেখাইতেন। অতি শুভক্ষণে

* ইনি ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর, যিনি সাধারণতঃ যবন হরিদাস নামে পরিচিত। "ভক্ত-প্রসঙ্গের" প্রথম খণ্ডে তাঁহার জীবনবৃত্ত লিখিয়াছি। হরিদাস ঠাকুরের চাঁদপুর আগমন প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকের ৫২-৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এই পরম ভক্তের কৃপালাভ করিয়া অলক্ষিত শক্তি সঞ্চারের ফলে রঘুনাথের ভবিষ্যৎ পথ উন্মুক্ত হইল। উত্তরকালে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই রঘুনাথের শিষ্য হন; যখন তখন গুরুর মুখের কথা শুনিয়া তিনি অনেক তথ্য জানিয়াছিলেন, অনেক গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। গুরুদেবের নিজ বাল্য-জীবন সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধিৎসাবলে যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যালোকে সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত। সেই সত্যনিষ্ঠ ভক্তলেখক নিজে লিখিয়া দিয়াছেন:—

"হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে॥"

রঘুনাথের প্রাণে নূতন তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া হরিদাস ঠাকুর চলিয়া গেলেন। অল্পদিন মধ্যে চৈতন্য-চরিত্রের নূতনধ্বনি বঙ্গময় রাষ্ট্র হইল। রঘুনাথ আকুল হইয়া বিদ্যার্জ্জন বন্ধ করিলেন, বাতুল হইয়া সে ধ্বনির পাছে ছুটিলেন।

[২]

বাতুল রঘুনাথ।

অল্পবয়সেই গৌরাঙ্গদেবের কথা রঘুনাথ শুনিয়াছিলেন এবং নাম শুনিয়াই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত হিরণ্যগোবর্দ্ধনের বিশেষ পরিচয় ও সৌহৃদ্য ছিল, চক্রবর্ত্তী মহোদয় উহাদিগকে আপন ভ্রাতার মত দেখিতেন। প্রভু শিশুকালেই উঁহাদিগকে দেখিয়াছিলেন এবং আজ্জা বলিয়া ডাকিতেন। উভয় পরিবারের এই প্রকার ঘনিষ্ঠতার জন্য নবদ্বীপের সকল সংবাদ দুই ভ্রাতা পাইতেন এবং রঘুও জানিতেন। গৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের কথা প্রচার

হইল। কিছুদিন পরে তাঁহারা হঠাৎ শুনিলেন গৌরাঙ্গ কাটোয়ায় আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে গিয়াছেন। এই সংবাদে উভয় ভ্রাতা বিশেষ বিচলিত হইলেন। কিন্তু রঘুনাথের বাতুলতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইল। তিনি আর সেই নবীন সন্ন্যাসীকে না দেখিয়া ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়া ছুটিয়া শান্তিপুরে আসিলেন, এবং জীবনে এই প্রথমবার শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ করিলেন।

তখন সংকীর্ত্তন-তরঙ্গে শান্তিপুর আন্দোলিত হইতেছিল, কত স্থান হইতে কত শত শত লোক নূতন সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল। রঘুও উহাদের একজন, তিনি প্রেমাবিষ্ট বাতুলের মত দৌড়িয়া গিয়া প্রভুর রাতুল চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। পরিচয় পাইবা মাত্র প্রভু চিনিলেন, রঘুকে বড় আদর করিলেন। তখন তিনি কয়েকদিন শান্তিপুরে থাকিয়া প্রভুর সঙ্গলাভ করিলেন, অদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজনের সুযোগ পাইলেন। কি যেন এক দিব্য অজ্ঞাত শক্তিতে উভয়ের প্রাণে প্রাণে মিলন হইল। রঘুনাথ প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন। প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলে রঘুনাথ এক প্রকার উন্মত্তের মত অশ্রু-প্লাবিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

ক্রমে তাঁহার বাতুলতা আরও বাড়িতে লাগিল। এ যে বিরহ-বিদগ্ধ প্রেমিকের ভাব, এভাব একবার জাগিলে ভক্তপ্রাণ মানুষকে সহজে ছাড়ে না। রঘুনাথ আহার নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গৃহে বসিয়া শুধু গৌরাঙ্গের রূপ চিন্তা করিতেন। ভিতরে বাহিরে জাগিয়া ঘুমাইয়া শুধু গৌরাঙ্গই দেখেন। কৃষ্ণ-বিরহে ব্রজ-গোপীগণের যাহা হইয়াছিল, রঘুনাথেরও তাহাই হইল। পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠতাতের প্রাণের প্রাণ স্নেহের পুত্তলী যে রঘুনাথ, তাঁহারই এই দশা দেখিয়া উঁহারা বড় উদ্বিগ্ন

হইলেন। বিশেষতঃ এই প্রেমিক সর্ব্বদাই শুধু পলায়ন করিয়া নীলাচ
যাইবার চেষ্টা করিতেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম প্রহরী রাখিতে হইল
রঘুনাথের নিজের মুখে শুনিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইক তারে রাখে রাত্রি দিনে।
চারিসেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে॥"

রাজার ছেলে, তাহার পাহারার ব্যবস্থাও রাজার মত হইল। নানাজাতী
১১ জন লোকে তাঁহাকে পলাইবার পক্ষে বাধা দিয়া, নানা প্রবোধ দি
রক্ষা করিতে লাগিলেন! শুধু তাহাই নহে, রঘুনাথ মনের আকাঙ্
জানাইলেন, তখন তাঁহাদের কুলগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য * আসি
তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। তখন হইতে রঘুনাথ নিয়মমত মন্ত্রজপ করিতে
লাগিলেন বটে, কিন্তু সংসারে মন বসিল না। এই সময় (১৪৩৩ শক
তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। এই অল্পবয়সেই তাঁহার অভিভাবকগ
অনেক সন্ধান করিয়া একটি উন্মুখ-যৌবনা পরমাসুন্দরী কন্যার স
তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তবুও রঘুনাথের ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্ত
হইল না; তিনি প্রভুর সহিত দেখা হওয়ার পর হইতে অত্যুগ্র উৎক
লইয়া চারিবৎসর কাটাইলেন।

* ইনি সুপণ্ডিত ও প্রেমিক ভক্ত। উপাধি ছিল তর্কচূড়ামণি। ইনি এক
শান্তিপুরে হরিদাস ঠাকুরের নিকট বিচারে পরাজিত হওয়ার পর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য
নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ("অদ্বৈত-প্রকাশ" ৭ম অধ্যায়, মৎ-সম্পাদিত সংস্ক
৭৪-৭৬পৃঃ) যদুনন্দন যে রঘুনাথের গুরু তাহা কবিকর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটে
শিবানন্দ সেনের উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। (ভ, র, ৩য় তরঙ্গ, ১১০পৃঃ চৈ, চ, অন্ত্য

"আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেব প্রিয়—
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং॥"

প্রভু নীলাচলে গিয়া কয়েক মাস পরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হন, তাহাতে প্রায় দুই বৎসর অতীত হয় ; তৎপরে আরও দুই বৎসর নীলাচলে থাকিয়া বৃন্দাবন যাইবার কল্পনায় যাত্রা করিয়া গৌড়-রামকেলি পর্য্যন্ত যান ; সনাতনের উপদেশে সে যাত্রায় বৃন্দাবন না গিয়া ফিরিয়া শান্তিপুরে আসিয়া ৭ দিন অবস্থিতি করেন। সেই বার্ত্তা শুনিবা মাত্র রঘুনাথ একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; তাহা দেখিয়া হিরণ্য গোবর্দ্ধন বহু লোক ও দ্রব্যাদি সঙ্গে দিয়া পুত্রকে শান্তিপুরে পাঠাইলেন। পুনরায় সাক্ষাৎ হইল ; রঘুনাথের আকর্ষণ ও উৎকণ্ঠা বাড়িল। তাঁহার একমাত্র চিন্তা, কেমন করিয়া রক্ষকের হাত এড়াইয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইবেন। তখন

"সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন।
শিক্ষা-রূপে কহে তারে আশ্বাস-বচন ॥
স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধু-কূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।*
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া ॥

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাস-কৃত "বৈরাগ্য-নির্ণয়" গ্রন্থে দেখিতে পাই,

"জ্ঞান শুষ্ক মর্কটঞ্চ কুল যুক্ত তথৈব চ।
বৈরাগ্য পঞ্চধা ইতি কথ্যন্তে মাং বিধানতঃ ॥"

অর্থাৎ জ্ঞান, শুষ্ক, মর্কট, কুল ও যুক্ত—এই এই পাঁচ প্রকার বৈরাগ্য, তন্মধ্যে মর্কট বৈরাগ্যের লক্ষণ এই—

"মর্কট বৈরাগী কহি, সর্ব্বত্যাগ করি।
ইন্দ্রিয় চরায় সঙ্গে লয়ে দিব্য নারী।"

প্রকৃত অর্থ এই, মর্কট বা বানরের তুল্য বৈরাগ্য। বানরেরা অরণ্যবাসী, গৃহহীন, নিঃসঙ্গ, নিরামিষভোজী, অসঞ্চয়ী এবং যদিচ্ছালাভসন্তুষ্ট অর্থাৎ যখন যাহা পায়,

অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥"
চৈ, চ, মধ্য ১৬শ

শ্রীচৈতন্য এখানে ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী করিয়া বিষয়ি-পুত্রকে অতি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে গীতায় অর্জ্জুনকে কর্ম্মসন্ন্যাসের ক্রমগুলি শিখাইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যও সেইভাবে রঘুনাথকে প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রঘুনাথ সংসারে আছেন, কোন কর্ম্ম করেন না, শুধু হা হুতাশ করেন, আর ছাড়িয়া পালাইবার জন্য পাগল হন, ইহাই সাধন-পথের প্রকৃত সোপান নহে। কর্ম্মই জ্ঞান-মার্গের প্রথম সোপান এবং প্রথম অবস্থা; প্রকৃতিবশে সকলকেই করিতে হয়; কর্ম্ম করিতে করিতে দেখা যায়, সকাম কর্ম্মে সুখ-শান্তি নাই; তখন বিষয়াসক্তি হ্রাস হয়, নিষ্কাম কর্ম্মের স্পৃহা জন্মে নিষ্কাম কর্ম্মাভ্যাসই দ্বিতীয় অবস্থা। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত-শুদ্ধি হয় অর্থাৎ তৃতীয় অবস্থায় পৌছান যায়। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে শ্রীভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করা যায়, আত্মোৎসর্গ করা যায়, তখন আর পাপে মতি যায় না; পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পাপও

তাহাতেই সন্তুষ্ট। সুতরাং বাহিরে বৈরাগ্যের সব লক্ষণগুলি তাহাদের আছে; কিন্তু ভিতরে ইহারা বহু স্ত্রীতে আসক্ত, অত্যন্ত স্ত্রৈণ, অত্যধিক সন্তানস্নেহযুক্ত। ইহাদের এইরূপ বৈরাগ্যের নাম মর্কট-বৈরাগ্য। ভিতরে নিষ্ঠা নাই, বাহিরে বৈরাগীর মত ছদ্মবেশ, অত্যন্ত বিষয়াসক্তি, এইরূপ বাহ্য লোক দেখানো বৈরাগ্যের নাম মর্কট-বৈরাগ্য। মহাপ্রভু এইরূপ বৈরাগ্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এরূপ অপরাধী বৈরাগীকে তিনি কখনও ক্ষমা করিতেন না। "শ্রীবৈরাগ্য নির্ণয়" বৈষ্ণবসঙ্গিনী-কার্য্যালয়ের সংস্করণ ৩-৪, ৩৮-৪৪ পৃঃ

াহাকে স্পর্শ করে না।* ইহাই চতুর্থ বা চরমাবস্থা, এই অবস্থায়
সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। উত্তরকালে শুধু এই রঘুনাথ কেন,
সপ্ত গোস্বামীর কথা বলিতেছি, তাঁহারা সকলেই এই চরমাবস্থারও পর
গিয়া পরমপদে লীন হইয়াছিলেন।

কিন্তু এখন রঘুনাথের জীবনের আরম্ভ, তাঁহার যাহাতে চিত্ত-শুদ্ধি-
াভের পথ পরিষ্কৃত হয়, সেই জন্যই শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন "রঘুনাথ,
স্থির হও অর্থাৎ গীতায় যাহাকে 'স্থিতধী' বলা হইয়াছে, তুমি সেই
বে বিষয়াবর্ত্তের মধ্যে স্থির হইয়া কর্ত্তব্য কর, ব্যাকুল হইও না। কর্ম্ম
কে করিতেই হইবে, সোপানের পর সোপান পার হইয়া তবে চরম
থের পথিক হওয়া যায়। অনর্থক লোক দেখানো বাহ্য বৈরাগ্যে
নাই; অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য ভাবে অর্থাৎ যেটুকু বিষয় ভোগ
করিলে নয় এইভাবে বিষয় ভোগ কর; অন্তরে ইষ্ট-নিষ্ঠা থাকুক,
হিরে লোকের সঙ্গে সমাজে যেভাবে চলা ন্যায়ানুমত, সেইভাবে চলিতে
ক. এইভাবে চলিলে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে, তুমি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা
ইবে।" এ অতি সুন্দর উপদেশ; গৃহস্থ বৈরাগীর পক্ষে এমন উপদেশ
দুর্ল্লভ। অল্পকথায় সহজ ভাষায় এই আদর্শ উপদেশের সারমর্ম্ম
নভাবে প্রকটিত করার ক্ষমতা ছিল প্রাচীন যুগে ব্যাসদেবের এবং
নব বৈষ্ণব-যুগে কবিরাজ গোস্বামীর।

এই উপদেশ বাণী শুনিয়া রঘুনাথ আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু তিনি
নীলাচলে যাইবেন, সেই উৎকণ্ঠার মীমাংসা হইল না। সেজন্য
প্রভু সংক্ষেপে সে কথাও বলিয়া দিলেন। "রঘুনাথ, আমি গিয়াই

---

* ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"
গীতা, ৫ম-১০

বৃন্দাবন যাত্রা করিব, ফিরিয়া আসিলে তখন তুমি কোন ছলে নীলাচলে চলিয়া যাইয়াও। কি সুযোগে তুমি যাইতে পারিবে, তাহা তখন কৃষ্ণ-কৃপায় তোমার মনে আপনি জাগিবে। কৃষ্ণ যাহাকে কৃপা করেন, তাহাকে কি কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারে?" * এইবার রঘুনাথ শান্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং "মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি বিষয়ীর প্রায়" হইয়া প্রভুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সংসারে মন দিলেন, বিষয়-কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতা মাতা হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, পরিবারভুক্ত সকলেই মনে বড় সুখ পাইলেন।"

রঘুনাথ এখন বয়স্ক এবং যোগ্যপুত্র; তাঁহার এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত বিষয়ের অধিকাংশ ভার তাঁহার উপর দিলেন, কারণ একে তাঁহারা প্রাচীন তাহাতে এইভাবে সম্পূর্ণ ভার দিলে যদি রঘুনাথের মন ভাল করিয়া বিষয়ে নিবিষ্ট হয়। এই ব্যবস্থা সময়োচিত হইয়াছিল, নহিলে সম্পত্তি রক্ষাই দুঃসাধ্য হইত, সেই কথাই এখানে বলিতেছি।

হিরণ্য গোবর্দ্ধন কর্ত্তৃক সপ্তগ্রাম মুলুক্ বন্দোবস্ত লওয়ার পূর্ব্বে এক মুসলমান চৌধুরী উহার মোক্তাদার ছিলেন; তাহার যে রাজস্ব দিবার অঙ্গীকার ছিল, উহার কিছুই দিতেন না, নিজে মুসলমান আমীর বলিয়া সুলতানের উপর প্রশ্রয় লইতেন। এই জন্যই হিরণ্যের সহিত বন্দোবস্ত হইল; চৌধুরীর সময় প্রজার মধ্যে বিদ্রোহই

* বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিও কোন ছলে।
সে ছলে সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে॥" চৈ, চ,

হইত অর্থ আদায় হইত না। তিনি এখন * দেখিলেন হিরণ্য-
লক্ষ টাকা দিয়াও আটলক্ষ ভোগ করেন, ইহাতে তাহার চক্ষু
য়া গেল। মুলুক তিনি ফিরাইয়া পান না পান, হিরণ্যের যাহাতে
থাকে, এজন্য সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলেন। তিনি
রণ্যদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য সৈন্যসহ উজীর পাঠাইলেন।
বিরাজ গোস্বামী সুলতানের নাম করেন নাই, শুধু 'রাজঘরে
কফিয়তি করিয়া উজীর আনিলেন' এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু
১৪৩৭ শকের (১৫১৫ খৃঃ) কথা, তখন সুলতান হুসেন শাহ
ৌড়ের একাধীশ্বর। তিনি নূতন রাজ্যজয় বা বাকী মহলে রাজস্ব
দায়ের অভিনব ব্যবস্থা করিয়া রাজকোষের আয় বৃদ্ধির জন্য বিশেষ
ইত ছিলেন। উজীর আসিবার প্রাক্কালেই হিরণ্য গোবর্দ্ধন গৃহ
গ করিয়া গা ঢাকা দিলেন। উজীর কাহাকেও না পাইয়া রঘু-
কে বাঁধিয়া গৌড়ে লইয়া গেল। নির্ভীক রঘুনাথ ইহাতে কিছুমাত্র
লিত হইলেন না। গৌড়ে লইয়া রঘুনাথকে কারাগারে রাখা
া; বৎসরাধিক পূর্ব্বে গৌড়ের কারাগারে সনাতন গোস্বামীকে
কতে হইয়াছিল, উহার ও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৪২৯ শক)
দাস ঠাকুর গৌড়ের কারাগৃহে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।
র রঘুনাথের পালা। তাঁহাকে প্রত্যহ দরবারে আনিয়া ভৎর্সনা
। হইত, নির্য্যাতনের ভয় দেখান হইত, কিন্তু কেহ মারিত না;
ণ হিরণ্যদাস কায়স্থ জাতীয়, অতি বুদ্ধিমান ও চক্রীলোক, তাহাকে
টু মনে মনে ভয় ছিল।

"বিশেষ কায়স্থ বুদ্ধি অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর॥"

* চরিতামৃতে চৌধুরী সাহেবকে "তুড়ুক" বলা হইয়াছে।

রঘুনাথ আর এ ভাবে থাকিতে পারেন না। তিনি অবশেষে কৌশল অবলম্বন করিয়া বিনয় দ্বারা সুলতানকে পরাজয় করিলেন। তিনি বলিলেন "আমার পিতা ও জ্যেঠা তোমার দুই ভাই, আমি তোমার পুত্র তুল্য; তুমি দেশের রাজা সকলের পালক, আমরা তোমার পাল্য, পরের মিথ্যা কথা শুনিয়া আমাকে অনর্থক নির্যাতন করিয়া তোমার লাভ কি; তুমি জেন্দাপীর, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, তুমি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিলে অন্যকে কি বলিব?" ভক্তের সুকণ্ঠে এই বিনয়গর্ভ বচন শুনিয়া হুসেন শাহের মন আর্দ্র হইল, বাস্তবিক তিনি অতি উদার-হৃদয় নৃপতি ছিলেন। তাঁহার দাড়ি বাহিয়া অশ্রু বিন্দু ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিলেন "তোমার জ্যেঠা আটলক্ষ টাকা ভোগ করে, আমাকে কিছু দিলে কি ভাল হয় না; তুমি যাও, এই সব কথা বলিয়া কিছু রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিও।" রঘুনাথ উদ্ধার পাইলেন; গৃহে আসিয়া জ্যেষ্ঠতাতকে বলিয়া প্রতিশ্রুতি মত ব্যবস্থা করিলেন। সকল গোলমাল মিটিয়া গেল। রঘুনাথ বিষয়ের কর্ত্তা না হইলে বোধ হয় ইহা হইত না।

এই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপ থাকিতে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি মূর্খ নীচ পতিত দরিদ্র সকলকেই প্রেমসুখে ভাসাইবেন, নিত্যানন্দও যদি তাঁহার সঙ্গে সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে বসিয়া থাকেন, তবে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। এজন্য তিনি নিত্যানন্দ স্বরূপকে বঙ্গদেশে গিয়া সর্ব্বজাতীয় পতিত অধমকে উদ্ধার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে নিত্যানন্দ পার্ষদ ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। এবং সর্ব্বাগ্রে গঙ্গাতীরে পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিত নামক ভক্তের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি একাধিক্রমে

মাস থাকিয়া সে দেশের লোক হরিনামে পাগল করিয়া তুলিলেন। কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ সাধারাণ লোককে হরিনাম দিয়া ভাবাবেশে আকুল করিতে হয়, "অক্রোধ পরমানন্দ" নিত্যানন্দ তাহাতে স্বভাব-সিদ্ধ। তাঁহার মূর্ত্তিতে কি দিব্য ভাব ছিল, মুখের কথায় কি মধু ছিল, কীর্ত্তনে কি মদিরা ছিল, হাস্যরসে কি চটুলতা ছিল যে, যখনই কেহ তাঁহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত, তখনই সে কেমন ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের লোক নাচিয়া উঠিত, সব ফেলিয়া তাঁহার সঙ্গ লইবার জন্য ছুটিত, আর দেশময় লোকারণ্য হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ঘনান্দোলিত হইয়া সে অঞ্চলে বিজয়ী সেনাপতির মত এই অপরূপ অবধূতের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিত। চৈতন্য-ভাগবতে (অন্ত্য, ৫ম) পাণিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যদ্ভুত লীলা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে লীলার বৈদ্যুতিক শক্তিতে তিন মাস কাল সে স্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্মৃতের মত ছিলেন।

"নিতানন্দ স্বরূপের প্রেম দৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥"
"তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কাহারো না স্ফুরে॥"

চৈ, ভা, অন্ত, ৫ম

সেই অসাড় দেশে যখন এইভাবে নূতন প্রেমের সঞ্চার হইল, সে বার্ত্তা রঘুনাথ শুনিলেন। তাঁহারই হাতে বিষয়ের সকল ভার অর্পিত, তিনিই এখন সপ্তগ্রামের মুলুকপতি, পাণিহাটি সেই মুলুকের অন্তর্গত এবং উহা সপ্তগ্রাম হইতে বেশী দূরে নহে। সংবাদ শুনিয়া প্রভুদর্শনের আশায় রঘুনাথ লোকজন ও যথেষ্ট অর্থ সঙ্গে লইয়া পাণিহাটি

যাত্রা করিলেন। গিয়া দেখিলেন, গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় উচ্চ বেদিকার উপর ভাস্করতুল্য জ্যোতির্ম্ময় নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া আছেন। রঘুনাথ দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার সময় লোকে তাঁহার নাম করিল। তৎক্ষণাৎ প্রভু এই ভক্তকে চিনিলেন, কারণ শ্রীচৈতন্যের মুখে ইহার সকল সকল সংবাদ পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছিলেন। সুরসিক দয়াল প্রভু নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত তাহাকে মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন।

"শুনি প্রভু কহে, চোরা, দিলি দরশন।
* আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥"

চৈ, চ, অন্ত্য ৬

রঘুনাথ থতমত খাইলেন, কাছে আগুয়াইতে পারিতেছিলেন না, তখন কৌতুকী প্রভু তাঁহাকে টানিয়া লইয়া তাঁহার মাথায় চরণ তুলিয়া দিলেন, আর বলিলেন "চোরা, * তুমি চোরের মত আত্মগোপন কর, বিষয়ীর মত চল ফের কিন্তু ভিতর তোমার কৃষ্ণময়। তুমি পলাইয়া পলাইয়া দূরে থাক; এ লুকোচুরী আর খাটিবে না। আজ্ তোমাকে দণ্ড দিব, তুমি আজ্—

"দধি চিড়া ভাল মতে খাওয়াও মোর গণে।"

রঘুনাথ মাথা পাতিয়া সে দণ্ড গ্রহণ করিলেন। বিচারক বা দণ্ডিত উভয়েরই ইচ্ছা বিষয়ীর অর্থের যদি সদ্ব্যবহার হয়, ত হইয়া যাউক।

---

* শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় "চোরা" কথার এই অর্থ করিয়াছেন, "পরের ধন অপ্রকাশ্যে গ্রহণ করে ও তাহা গোপনে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সেই চোরা। রঘুনাথের অন্তর কৃষ্ণভক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে লোক দেখান বৈরাগ্য গোপন করিয়া, প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া ফেলিয়াছেন।" শ্রীমৎ দাস গোস্বামী, ৪০-৪১ পৃঃ।

ঘুনাথ দেশের মালিক; লোকজন বা অর্থের তাঁহার অভাব নাই; ৎক্ষণাৎ চারিদিকে লোক পাঠাইয়া খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিলেন, তাঁহার ান্তরিক ভক্তিনিষ্ঠা সকল কার্য্যের সহায় হইল। অর্থ যাহা লাগে াগুক, খাদ্যদ্রব্য চাই। তাই অল্প সময় মধ্যে পর্ব্বত প্রমাণ চিড়া, ারে ভারে দধি ও দুগ্ধ এবং চিনি কলা ও পাত্রাদি সংগৃহীত হইয়া াসিল। মহোৎসবের শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ সজ্জন ও সর্ব্বজাতীয় দেশের াক ভাঙ্গিয়া আসিল। প্রভুর গণকে ভোজন করান বড় সোজা ব্যাপার হে, ভক্ত অভক্ত দেশসুদ্ধ সকল লোকই তাঁহার গণ। ভোগ-সামগ্রীর ্যবস্থা মত আয়োজন হইলে, প্রভু আসিয়া উহা নিবেদন করিলেন; াগ্যবান বৈষ্ণব কেহ কেহ দেখিলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সশরীরে সে হোৎসবে আসিয়া ভোগের প্রসাদ দিয়াছিলেন।

গঙ্গার চড়ায় দিন ভরিয়া এই পুলিন-ভোজনের বিরাট উৎসব চলিল। াহার নাম "চিড়া-দধি মহোৎসব।" রঘুনাথকে দণ্ড করিবার ছল হইতে াহার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া, ইহাকে "দণ্ড-মহোৎসব" ও বলে। এখনও প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের সেই শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে, পাণিহাটিতে সেই াহ্নবী তীরে, প্রভু নিত্যানন্দের উপবেশন-পবিত্রীকৃত সেই বৃক্ষবেদিকায় ঘুনাথের স্মৃতিকল্পে এই "দণ্ড-মহোৎসব" হইয়া থাকে। সেই সুবৃহৎ টবৃক্ষ এখনও দীর্ঘজীবী হইয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রাচীন কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে।

উৎসবান্তে প্রভু রঘুনাথকে ডাকিয়া পরদিন প্রাতে প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্লাবিত নেত্রে রঘুনাথ বলিলেন,

"মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্যলাভ কর আশীর্ব্বাদ॥"

প্রভু তাহাই করিলেন, আশীর্ব্বাদানে বলিলেন "অচিরে তোমার চৈতন্য-চরণ-লাভ ঘটিবে। অন্তরঙ্গ ভৃত্যের মত তিনি চরণপ্রান্তে তোমাকে রাখিবেন।"

এই উৎসবে কেবল ভক্তগণকে দধি চিড়া খাওয়াইয়া তৃপ্ত করা নহে, রঘুনাথ দানশৌণ্ডিকের মত প্রচুর অর্থের যতটুক সদ্ব্যয় করা যায়, তাহা করিয়াছিলেন। তিনি প্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া সমাগত সকল বৈষ্ণবের প্রণামী অর্থ দিলেন। তাহাও কম নহে, প্রভুকে না বলিয়া তাঁহার ভাণ্ডারীর নিকট গচ্ছিত রাখিলেন একশত মুদ্রা ও সাত তোলা সোনা, রাঘব পণ্ডিতকে একশত মুদ্রা ও দুই তোলা সোনা এবং অন্য সকল বৈষ্ণবের প্রত্যেককে বিচার মত ন্যূন সংখ্যা ২৲ দুই টাকা হইতে ২০৲ কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত প্রণামী দিলেন। অসংখ্য বৈষ্ণবের সমাগম হইয়াছিল, কত টাকা যে শুধু এই প্রণামী বাবদ ব্যয়িত হইল, তাহার গণনা করা যায় না।

রঘুনাথ গৃহে ফিরিলেন। তিনি জানিতেন,' প্রভুর আশীর্ব্বাদ কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। সুতরাং তাহার নীলাচলে' যাইবার সময় সমাগত, এই ভাবিয়া তিনি আবার ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। গৃহে ফিরিবার সময়ই তিনি উন্মত্তপ্রায়'। বাটীর অভ্যন্তরে আর গেলেন না, রাত্রিতে দুর্গা-মণ্ডপে শয়ন করিতে লাগিলেন ; পুনরায় দিবারাত্রি রক্ষকগণ সতর্কভাবে তাঁহাকে পাহারা দিতে লাগিল। এই সময় রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী, বঙ্গদেশের বহু ভক্ত জগন্নাথ দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেছিলেন ; সে শব্দ রঘুর কানে আসিল, তিনি উহাদের সঙ্গ ধরিবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু পলাইবার সুযোগ কই ?

মহাপ্রভু শান্তিপুরে রঘুনাথকে বলিয়া গিয়াছিলেন, সুযোগের অভাব হইবে না। তাহাই হইল। একদা শেষরাত্রিতে রঘুর দীক্ষাগুরু যদুনন্দন আচার্য্য আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন ; আচার্য্যের বাটীতে ঠাকুর-সেবক ব্রাহ্মণটি তাঁহার কথা শুনেন না, দুইদিন ঠাকুর পূজা করিতে যান না ; রঘুনাথ দেশের জমিদার, তিনি গিয়া ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিলে কাব্যোদ্ধার হয়, প্রাতে ঠাকুর পূজার ব্যবস্থা হয়, এইজন্য চারিদণ্ড রাত্রি

থাকিতে আচার্য্য আসিয়াছিলেন। ডাকিবামাত্র রঘুনাথ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন, দৈবক্রমে তখন শেষ রাত্রিতে রক্ষকেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগ্রত থাকিলেও সম্ভবতঃ গুরুর সঙ্গে যাইবার বাধা দিতে পারিত না। পথে গিয়া রঘু বলিলেন "আমি ঠাকুরের বাড়ী গিয়া তাঁহাকে পাঠাইতেছি, সেখানে আপনার যাইবার প্রয়োজন কি?" আচার্য্য সেইরূপই বুঝিয়া বাড়ী গেলেন, সুতরাং রঘুনাথ উন্মুক্ত হইলেন! তিনি ঠাকুরকে বলিয়া দিয়া সেই মুহূর্ত্তে নীলাচলের পানে উধাও হইয়া ছুটিলেন এবং চিরজীবনের মত গৃহত্যাগ করিলেন।

[৩]

স্বরূপের রঘুনাথ

রঘুনাথ পলায়ন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন, কেহ পশ্চাতে আসে কিনা চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজপথ ছাড়িয়া উপপথ ধরিয়া একদিনে ৩০ মাইল পথ গেলেন, সন্ধ্যাকালে এক গোয়াল বাথানে পৌছিয়া রাত্রিবাস করিলেন। গোয়ালেরা তাঁহাকে উপবাসী দেখিয়া দুগ্ধপান করিতে দিল। প্রভাতে উঠিয়া তিনি ছত্রভোগ, সরাণ ও কোগ্রামের পথে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কত কঙ্কর-কণ্টকে পথে তাঁহার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইল, কতস্থানে তপ্ত বালুকায় ঝলসিয়া গেল, কত শ্বাপদ-সঙ্কুল জঙ্গলপথে অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রিদিন উন্মত্তের প্রায় ছুটিয়া ছুটিয়া, অবশেষে ১৮ দিনের পথ ১২ দিনে অতিবাহন করতঃ রঘুনাথ পুরুষোত্তমধামে পৌছিলেন; পথে ৩ দিন মাত্র ভোজন করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট ৯ দিন তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল।

এই কয়দিনেই তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল অস্থিসার হইয়া গেল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। এইভাবে শ্রান্ত, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শ্রীধামে পৌছিয়া রঘুনাথ গিয়া শ্রীচৈতন্ত-চরণে নিপতিত হইলেন।

মুকুন্দ দত্ত তাঁহার পরিচয় দিবামাত্র মহাপ্রভু উঠিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গনদান করিলেন; রঘুর প্রাণ জুড়াইয়া গেল, সকল কষ্টের সকল আকুলতার পরিসমাপ্তি হইল। স্বরূপাদি * সকল ভক্ত আসিয়া একে একে এই নবাগত ভাগ্যবান ভক্তকে স্নেহের কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভু বলিলেন "রঘুনাথ, এইবার শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিয়া বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।"

রঘুনাথ উত্তর করিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ জানিনা তোমার কৃপাই আমাকে উদ্ধার করিল, এই মাত্র মানি।" আজ্ রঘুনাথ বাস্তবিকই ভববন্ধ হইতে মুক্ত, এইরূপ মুক্তাবস্থায় জীবের ভজনে অধিকার হয় এবং ইহাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সোপান। তাই রঘুনাথের দৈন্তোক্তি শুনিয়া মহাপ্রভুর হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইল; যে সকল ছাড়িয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে, তাহার সদ্গতি করিয়া দেওয়াই তাঁহার দয়ার রীতি। তিনি তখনই স্বরূপ-দামোদরকে কহিলেন,

"এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥

---

* ইঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম স্বরূপদামোদর, পূর্ব্ব নাম পুরুষোত্তম লাহিড়ী। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী ভেটাদিয়া গ্রামে ইঁহার বাস। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের সময়ে কয়েকদিন ইঁহাদের গৃহে ছিলেন; পুরুষোত্তম কাশী হইতে পাঠ সমাপন করিয়া পরে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিত্যসঙ্গী হন; তিনি "প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত রসের সাগর।" স্বরূপের কড়চায় মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে। *
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে॥"

চৈ. চ. অন্ত্য ৬

স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ; যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনই গুরুগম্ভীর ভাবময় রসজ্ঞ ভক্ত। প্রভু নিজেই বলিতেন, নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব ও ব্রজের লীলারস-রহস্য তাঁহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের দৃঢ়তার বিষয় তিনি বুঝিয়াছিলেন। এইরূপ ভজননিষ্ঠ সাধকই গূঢ়তত্ত্ব অনুশীলনের অধিকারী, সুতরাং রঘুর উপযুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর। এজন্য প্রভু তাঁহার এই প্রিয় পদার্থটিকে আদর করিয়া সেই মর্ম্মী ভক্তের করে সমর্পণ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, প্রিয় ভক্তটিকে যথোচিত আদরযত্ন বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা সুযোগ তাঁহার নাই; এজন্য রঘুনাথের একান্ত মঙ্গল বিধানের জন্য, তাঁহাকে পুত্রবৎ ভৃত্যবৎ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দরিদ্রের নিজপুত্রকে ধনীর গৃহে পোষ্যপুত্র করিয়া দিবার মত, রঘুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া স্বরূপকে দেওয়া হইল। সেইদিন হইতে যতকাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন, তিনি "স্বরূপের রঘুনাথ" নামে সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। ভক্তিরত্নাকরে (তৃতীয় তরঙ্গ) আছে, নীলাচলে গিয়া শ্রীনিবাস এই স্বরূপের রঘুনাথকে না দেখিয়া কাঁদিয়া অত্যাকুল হন। দিগ্বিজয়ী

---

* তিনজন রঘুনাথের একজন রঘুনাথ ভট্ট। তিনি পরে বৃন্দাবনে ভট্ট-গোস্বামী নামে খ্যাত। দ্বিতীয় রঘুনাথ বৈদ্য, যিনি নিত্যানন্দগণভুক্ত, চৈতন্য ভাগবতে যাঁহাকে "রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্ত রসময়" বলিয়া বর্ণনা আছে। তৃতীয়, এই রঘুনাথ দাস।

আলেকজেণ্ডার পৃথিবীর অধীশ্বর নামে কীর্ত্তিত হওয়া অপেক্ষা দার্শনিক আরিষ্টটলের শিষ্য রূপে পরিচিত হইতে অধিক গৌরব অনুভব করিতেন। মহাপ্রভু এইভাবে ভক্তরূপ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া স্বরূপ ও রঘুনাথ উভয়ের মহিমা বাড়াইলেন। কবিরাজ গোস্বামী সত্যই লিখিয়াছেন,

"ভক্তি-মহিমা বাড়াইতে ভক্ত-সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে॥"

রঘুনাথ পথে বহুদিন উপবাস করিয়া বড় অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিছুদিন ভালরূপে সন্তর্পণ করিবার জন্য মহাপ্রভু নিজভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন। রঘুনাথ সমুদ্রস্নান ও ৺জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর পাতের প্রসাদ খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। তিনি মাতাপিতা ও বিষয়বিত্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তিনি যে মাতাপিতার স্নেহ পাইলেন, যে প্রেমধনে ধনী হইলেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। সকল ভক্ত রঘুর ভাগ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, কিন্তু এ সৌভাগ্য কি শুধু এই জীবনেরই সাধনার ফল? ভক্তমাল-গ্রন্থে রঘুনাথ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। আসিবার সময় পথক্লেশে এবং অতিরিক্ত উপবাসে কয়েকদিন মধ্যে রঘুনাথের খুব জ্বর হইল এবং অষ্টাহ লঙ্ঘন করিয়া সে জ্বর ত্যাগ পাইলে, সাধারণতঃ সকল রোগীর যেমন হয়, রঘুর নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য ভোজনের লোভ হইল। কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ভিন্ন তিনিত খাইতেও পারেন না। তাই মনে মনে নানারূপ আহার্য্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া প্রভুর উদ্দেশে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেন এবং তৃপ্তি অনুভব করিলেন। প্রভু পরদিন স্বরূপকে বলিলেন, রঘু তাঁহাকে অতিরিক্ত ভোজন করাইয়াছে বলিয়া তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে। রঘু

তাহা শুনিয়া অন্তরে বড় আনন্দ উপভোগ করিলেন। ইহা অদ্ভুত কিছু নহে; শ্রাদ্ধতর্পণে আমাদের প্রদত্ত পানাহার পিতৃপুরুষেরা বাস্তবিকই সম্ভোগ করিয়া থাকেন। প্রভু সম্ভোগ করিবেন, তাহা বিচিত্র কি?

কয়েকদিন মধ্যে রঘুনাথ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলেন। স্বরূপকে দিয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই এই কয়দিন মধ্যে প্রভু ত আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন উপদেশই দিলেন না?" তখন

"হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইহঁ তাহা জানে॥
গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ॥"

চৈ, চ, অন্ত্য ৬,

মোটামুটি প্রভু সকল কথাই বলিলেন, কেবল নিগূঢ় তত্ত্বশিক্ষা দেওয়ার ভার রহিল স্বরূপের উপর। সেই জন্যই ত তিনি স্বরূপের হাতে রঘুকে দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত প্রভু এখন যে উপদেশ দিলেন, তাহাও সংক্ষেপে অতি সার কথা, রঘুনাথ উহা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতেন। গ্রাম্য কথা কহা বা গ্রাম্যবার্ত্তা শোনার গণ্ডী তিনি পার হইয়া আসিয়াছেন। ভাল খাওয়া বা ভাল পরার কোন সাধ থাকিলে, তিনি

লক্ষপতির সম্পদ ছাড়িয়া আসিতেন না। চরিতামৃতে অন্যত্র আছে "আজন্ম না ছিল জিহ্বার রসের স্পর্শন" এবং তিনি এখন হইতে "ছিণ্ড কানি কাঁথা বিনা বসন" পরিতেন না। তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া এব তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া, নিজে নিরভিমান হইয়া সর্ব্বজীবকে সম্মানিত করতঃ, শ্রীচৈতন্যের সারোপদেশ অনুসারে কি ভাবে হরিনাম কীর্ত্ত করিতে হয়, কি কঠোর নিয়ম অভ্যাস করিয়াছিলেন এই রঘুনাথ, তাহ আমরা পরে দেখিব।

এদিকে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিলে তাঁহার পিতামাতা অত্যন্ত ব্যাকু হইলেন। রঘু যে ছুটিয়া নীলাচলের দিকে পলাইয়া গিয়াছেন, উহ তাঁহার পিতা বুঝিলেন, কিন্তু মায়ের প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানে না পূর্ব্বে যখন রঘু বাড়ী থাকিতে বারংবার পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন তাহার মাতাই তাহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বলেন। কিন পিতা তাহার উত্তরে কি বলিয়াছিলেন, শুনুন,—

> "ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
> এ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
> দড়ীর বাঁধনে তারে রাখিব কি মতে।
> জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥"
>
> চৈ, চ, অন্ত্য ৬।

বাস্তবিকই, পিতা জন্মের কারণ বটে, কিন্তু পুত্রের ভাগ্যের কারণ তাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। রঘু সেই পূর্ব্ব পুণ্যফলে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন তবুও পিতা পুত্রের অনুসন্ধানের জন্য পত্র সহ দশজন লোককে উড়িষ্যা পথে শিবানন্দ সেনের নিকট পাঠাইলেন। কুলীনগ্রাম বাসী এই প্রসি ভক্ত প্রভুর আদেশে প্রতি বৎসর রথযাত্রীদিগের সকলের পথের ব্যয়ব্যব

করিয়া উহাদের সঙ্গে নীলাচলে যাইতেন। লোকেরা ঝাকুরায় আসিয়া শিবানন্দকে পত্র দিল। কিন্তু রঘু সে পথে আসেন নাই, সুতরাং কোন সন্ধান না পাইয়া উহারা ফিরিয়া গেল। তখন গোবর্দ্ধনের গৃহে ক্রন্দন রব উঠিল। কয়েকমাস পরে যখন শিবানন্দ ফিরিয়া বাড়ী আসিলেন, তখন পুনরায় গোবর্দ্ধন লোক সহ পত্র পাঠাইয়া, রঘুর নীলাচলে আসিবার ও পরবর্ত্তী কঠোর জীবনের সকল খবর পাইলেন। তাহা শুনিয়া পুত্রের জন্য কিছু অর্থ ও দ্রব্যাদি পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। পর বৎসর যখন যাত্রীরা রথযাত্রায় আসিতেছিলেন, তখন গোবর্দ্ধন উহাদের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ ও একটি ভৃত্যকে চারিশত মুদ্রা ও আহায্য দ্রব্যাদি সহ পাঠাইয়া দিলেন। রঘু উহা পাইলেন কিন্তু অর্থ দিয়া কি করিবেন, বুঝিয়া পাইতে ছিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, ঐ অর্থ তিনি প্রভুর সেবায় ব্যয়িত করিবেন। প্রতিমাসে দুইদিন করিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাউপচারে খাওয়াইতে লাগিলেন। ভক্তাধীন প্রভু তাহাতে অমত করিতে পারেন না। দুই বৎসর এইভাবে নিমন্ত্রণ চলিল। পরে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু একদিন স্বরূপকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ উত্তর দিলেন, বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করা রঘু অন্যায় মনে করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। প্রভু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ বিষয়ীর অন্ন খাইলে মন মলিন হয়, কৃষ্ণ-স্মরণ হয় না। সুতরাং রঘু ভালই করিয়াছেন।

প্রভুর উপদেশমত নিজের খাদ্যপানের নিয়ম রঘুনাথ কঠোরতম ভাবে পালন করিতে ছিলেন। প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ তাঁহাকে প্রসাদান্ন দিতেন। কয়েকদিন পরে রঘু তাহা ছাড়িয়া দিলেন। দশদণ্ড রাত্রির পর শ্রীজগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া তিনি মন্দির প্রাঙ্গণের সিংহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইতেন, নিষ্কিঞ্চন ভক্ত দেখিয়া যদি কেহ কিছু দিতেন, তবে রঘুনাথ

তাহাই ভক্ষণ করিয়া বা চর্ব্বণ করিয়া, অথবা কেহ কিছু না দিলে উপবাস থাকিয়া, নামজপে রাত্রিযাপন করিতেন।

"দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।
সিংহদ্বারে খাঁড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করয়ে চর্ব্বণ॥"

এইরূপ অযাচক বৃত্তি বৈরাগীর ধর্ম্ম। রঘুনাথ তাহা আচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন; কারণ ইহাতেও একটা দোষ আছে। অন্নার্থী ব্যক্তি সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবে

"অয়মাগচ্ছতি অয়ংদাস্যতি, অনেনদত্তং অয়মপরঃ।
সমেষ্যত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি, নদত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি।

ইনি আসিতেছেন, ইনি কল্য আমাকে অন্ন দিয়া ছিলেন, আজও দিবেন এই অন্য এক ব্যক্তি, ইনি দিবেন না। এই আবার আর একজন আসিতেছেন, ইনিই দিবেন; না, ইনি দেন নাই, দিবেন না। ভিক্ষা স্থানে এরূপ সংকল্প বিকল্প করা ভিক্ষার্থীর উচিত নহে। এজন্য রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়িয়া দিলেন।

"প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥"

রঘু তখন হইতে মধ্যাহ্নকালে সত্রে গিয়া মাঁগিয়া খাইতে লাগিলেন এবং যথালাভ উদর পূরণ করিয়া ভজনানন্দে দিনক্ষয় করিতেন। জিহ্বার লালসা থাকিলে কৃষ্ণসাধন হয় না। মহাপ্রভুর নিজের কথা এই :—

"জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

সত্রে মাঁগিয়া খাইয়াও রঘুনাথের কঠোরতার সাধ মিটিল না। কারণ

টহাতেও দোষ আছে, চাহিতে হয়, পরের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়ত বা কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া নিজে খাইতে হয়। এবার নি এক নূতন ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে কাহারও অনুগ্রহের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না বা কাহারও আহার্য্য নিজে লইয়া খাইতে হইবে না। শ্রীজগন্নাথের দ্বারে দোকানীরা প্রসাদান্ন বিক্রয় করে। সব অন্ন নিত্য বিক্রয় হয় না, কতক পচিয়া যায়। উহা তাহারা গাভীদিগের সম্মুখে ফেলিয়া দেয়। দুই তিন দিনে সেই পচা ভাতে এমন দুর্গন্ধ হইত যে, অনেক সময় তৈলঙ্গী গাভীগুলিও উহার সড়া গন্ধে খাইতে পারিত না। রঘুনাথ সেই ভাত ঘরে আনিয়া বহু জলদিয়া ধুইয়া ধুইয়া উহার মধ্যে একটু শক্ত দৃঢ় ভাতের মাজি যাহা পাইতেন, তাহাই তিনি লবণ দিয়া খাইতেন। * এ যে কি নিদারুণ কঠোর বৈরাগ্য, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। যখন তাঁহার প্রথম জীবনের ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যের কথা মনে হয়, তখন তাঁহার এই কঠোরতা দেখিয়া চমকিত হইয়া নেত্রজল বর্ষণ করিতে হয়। যেমন রঘুনাথ, তেমনই তাঁহার গুরুদেব স্বরূপ। তিনি আসিয়া এক দিন রঘুনাথকে এই ভাত খাইতে

---

* যথা চরিতামৃতে :—

"প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুইতিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেইভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥
ভিতরেতে দড় ভাত মাজি যেই পায়।
লুণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥"

অন্ত্য, ৬ষ্ঠ।

দেখিয়া কিছু মাঁগিয়া খাইলেন এবং বলিলেন, "রঘু, তুমি প্রতিদি এই অমৃত ভক্ষণ কর, আমাদিগকে দাও না, এ তোমার কি প্রকৃতি গোবিন্দের নিকট সংবাদ পাইয়া, পরদিন প্রভু সময়মত স্বয়ং আসি বলিলেন "রঘুনাথ! তুমি কি খাও, আমাদিগকে দেওনা কেন? ইহা বলিয়াই স্বহস্তে লইয়া একগ্রাস ভক্ষণ করিলেন, আর একগ্রা লইতে যাইতেছেন এমন সময় স্বরূপ তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন এব "প্রভু! ইহা তোমার যোগ্য নয়" বলিয়া কাড়িয়া লইলেন, খাইতে দিলেন না। এই ভাবে রঘুর জীবন চলিতে লাগিল।

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামে একজন ভক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীধামে আসিয়াছিলেন। তিনি একটি গোবর্দ্ধনশিলা ও একছড় গুঞ্জামালা আনিয়া মহাপ্রভুকে উপহার দেন। এই দুই অপূর্ব্ব বস্তু লাভ করিয়া তিনি অতীব তুষ্ট হন। শিলাটি কখনও হৃদয়ে ধরেন কখনও নাকে চোকে স্পর্শ করান, কখনও বা শিরে রাখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেন। মালা গলে পরিয়া, শিলাকে তিনি কৃষ্ণ-কলেবর মনে করিয়া সেবা করিতেন। এইরূপে তিন বৎসর গেল। অবশেষে এই দুই পরম বস্তু তিনি কৃপাবশে ভজন-নিষ্ঠ ভক্ত রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অর্পণ করেন। তিনি রঘুকে বলিলেন, শিলা তুমি কৃষ্ণ-বিগ্রহের মত সাত্ত্বিকভাবে জল ও তুলসী মঞ্জরী দিয়া পূজা কর, অচিরাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবে।" দুই দিকে দুইটি পত্রযুক্ত তুলসী-মঞ্জরীর আটটি দিয়া প্রত্যহ পূজা করিতে প্রভু রঘুনাথকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সেবার উপকরণ যতই সামান্য হউক, রঘুনাথ তাহা কোথায় পাইবেন? স্বরূপ দামোদর দীন ভক্তের উপযুক্ত উপকরণ গুলি নিজেই প্রিয়শিষ্যকে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। সে উপকরণ আর কিছুই নহে, আসনের জন্য একখানি পিঁড়া, বসন ও

আস্তরণের জন্য এক এক বিতস্তি প্রমাণ দুইখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র এবং জলের জন্য একটি কুঁজা। স্বরূপ তাঁহাকে প্রত্যহ অষ্টকৌড়ি মূল্যের খাজা সন্দেশ দিয়া শিলায় ভোগ দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু দীনাতিদীন রঘুনাথের ত পয়সা কড়ি কিছুই নাই, তিনি প্রত্যহ অষ্টাকৌড়ি কোথায় পাইবেন? স্বরূপ তখন গোবিন্দকে প্রত্যহ এইরূপ খাজা সন্দেশ পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

এইভাবে রঘুনাথের নিত্যপূজা চলিতে লাগিল। তত্ত্বজ্ঞ স্বরূপ এই দুই প্রিয়বস্তু দানের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তাঁহার রঘুনাথকে বুঝাইয়া দিলেন। শিলা পূজায় কৃষ্ণপূজাই হইতেছে, উহার ফলে তিনি কৃষ্ণকৃপা লাভ করিবেন এবং প্রভু এই গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়া প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছেন, তিনি যেন বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্দ্ধন শৈল-সমীপে বাস করেন। আর গুঞ্জামালা দিয়া তাঁহাকে রাধিকা-চরণে স্থান দেওয়া হইল।

"শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধন।
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকা-চরণ ॥"

পূজার আয়োজন উপকরণ যখন সকলই জুটিল, তখন রঘুনাথ নিত্য পূজা দ্বারা বড় সুখী হইতেছিলেন; ষোড়শোপচারে পূজা করিলেও মনের তেমন সুখ হয় না।

"জল তুলসী দিয়া সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥"

গৌরাঙ্গ-চরণ সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে চিন্তা করিয়া রঘুনাথ প্রাত্যহিক জপ ও সাধন ভজন নিয়মমত করিতে লাগিলেন। এই কঠোর সাধনায় তাঁহার দিবসের ছাপান্ন দণ্ড অতিবাহিত হইত, অপর চারিদণ্ডের মধ্যে তাঁহার আহার নিদ্রাশৌচাদি সকল কৃত্য সমাহিত হইত। আর তাহার এই নিয়ম তিনি এমন কঠোর ভাবে পালন করিতেন যে,

পাষাণের রেখার মত কোনদিন তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারিত না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী দৃঢ়তার সহিত লিখিয়া গিয়াছেন—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে॥

চৈ, চ, অন্ত্য ৬

দিনের পর দিন এইরূপ কঠোর নিয়মে সাধন ভজন করিয়া ষোল বৎসরকাল নীলাচলে থাকিয়া রঘুনাথ দাস অন্তরঙ্গ সেবন করিলেন। সাধ্য-সাধনের সকল তত্ত্ব তিনি স্বরূপের নিকট শিখিয়াছিলেন। প্রেম রসের যে সব নিগূঢ় রহস্য তিনি গুরুকৃপায় অবগত হইয়া প্রত্যক্ষানুভূত করিয়াছিলেন, তাহাই পরে বৃন্দাবনে অন্তরঙ্গ ভক্ত-সমাজে গুপ্ত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তাহাই তদীয় শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কতক কতক সতর্ক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবকে উপহার দিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,

"চৈতন্যের লীলা রত্ন সার, স্বরূপের ভাণ্ডার
তিহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ
সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত, রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥"

চৈ. চ, মধ্য ২

রঘুনাথ ১৬ বৎসর কাল নীলাচলে থাকিবার পর অকস্মাৎ (১৪৫৫ শক) শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রকট হইলেন। অকাল জলদ-পটলের মত মহাবিরহ-কালিমায় নীলাচলের সে নীলাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অল্পদিন মধ্যে স্বরূপ দামোদরও সে বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তখন রঘুনাথ সে শোক-দাবদাহে দগ্ধ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

"প্রভুর বিয়োগে স্বরূপের অদর্শন।
মহাদুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন॥"
ভ. র. ৩য় তরঙ্গ।

[৪]

রাধাকুণ্ডের রঘুনাথ।

গৌরাঙ্গ-বিরহে একান্ত শোকখিন্ন হইয়া রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিলেন। আসিবার আদেশ ছিল, তাই আসিলেন, না আসিয়া পারেন না। কিন্তু মনে মনে সংকল্প করিয়া আসিলেন, শ্রীরূপ সনাতনের চরণবন্দনা করিয়া গোবর্দ্ধনে যাইবেন এবং সেই পাহাড়ের উপর হইতে ভৃগুপাত করিয়া অর্থাৎ অত্যুচ্চ শীর্ষ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সে সাময়িক সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল না; আসিবামাত্র রূপ সনাতন তাঁহাকে আপনাদের তৃতীয় ভ্রাতার মত স্নেহ করিয়া কিছুদিন নিকটে রাখিলেন এবং নানাভাবে বুঝাইয়া তাঁহাকে সংকল্প হইতে বিরত করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহারা রঘুনাথের মুখে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সর্ব্বপ্রকার লীলা-সাধনার গল্প শুনিতেন এবং সেই ভক্তিরসতত্ত্ব

২২—

লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চৈতন্য-লীলা প্রকৃত তত্ত্ব স্বরূপের মত কেহ জানিতেন না এবং তিনিও তাহার সারমর্ম প্রিয়ভক্ত রঘুনাথকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। নীলাচলে প্রভুর শেষাবস্থা গম্ভীরা লীলার গূঢ়রহস্য রঘুনাথ স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দে নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ভক্ত-হৃদয়ে যেভাবে উহার আদর্শ প্রতিফলিত ও দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাই তি সবিস্তারে এই সময় রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামীদিগের নিকট অভিব্যক্ত করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তখন বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন এবং পা রঘুনাথের চরণান্তিকে সর্ব্বদা বাস করিতেন। তিনি ঐ সকল কথা সারাংশ তাঁহার অমর গ্রন্থে যেখানে সেখানে নানাপ্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন রঘুনাথের বৃন্দাবন আসিবার কথা এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ;
এইত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবন।
আসি রূপ সনাতনের কৈলা দরশন॥
তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর॥"

আদি, ১০ম।

এইভাবে কিছুদিন গেল। রঘুনাথের আন্তরিক বেদনা একটু কমি এবং তিনি দেখিয়া শুনিয়া একটু সুস্থ হইলেন। মধুর রসের আলোচন নীলাচলে যেমন স্বরূপের সঙ্গে হইত, বৃন্দাবনে আসিয়া সেইরূপ আলোচন রূপ গোস্বামীর সঙ্গে হইতে লাগিল। এই তত্ত্বের প্রকৃত আলোচন

।তে রূপের মত কেহ ছিলেন না; তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও নীলমণি" এই মাধুর্য্য-তত্ত্ব লইয়া লিখিত। শ্রীরূপ রঘুনাথের নিকট ক তত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূত দৃষ্টান্তের কথা শুনিলেন এবং শাস্ত্রোদ্ধার রিয়া অনেক বিষয় সমর্থন করিয়া, অনেক বিষয় রঘুনাথকেও নূতন শিক্ষা । তদবধি রূপগোস্বামী রঘুনাথের গুরুস্থানীয় হইলেন।

এই সময়ে রূপের নিকট একটি নবাগত শিক্ষার্থী ছিলেন, তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি (২৩১-২ পৃঃ)। এই চিরকুমার আজন্মভক্ত শ্রীনিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ গোস্বামীর আশ্রয় লন এবং তাঁহার নিকট ভক্তিসাধনার সারগর্ভ উপদেশ পান। এই জন্য রূপকে তাঁহার প্রথম গুরু বলিতে পারি। শেষে যখন রঘুনাথ আসিলেন, তখন তাঁহার ভক্তিবিভোর মধুর ভাব এবং সাধন-মার্গের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণদাস মুগ্ধ হন। ই তিনি প্রাণপণে রঘুনাথের সেবাযত্ন করিতেন। তাহাই দেখিয়া, খন রঘুনাথ গোবর্দ্ধনে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন, রূপগোস্বামী ই কৃষ্ণদাসকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। ইহার অর্থ ই, তাঁহাকে রঘুনাথের করে সমর্পণ করিলেন, রঘুনাথ হইলেন কৃষ্ণদাস বিরাজের দ্বিতীয় গুরু। * কৃষ্ণদাস যে রঘুনাথের শিষ্য, তাহা তিনি জ গ্রন্থে নানা স্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

---

* রঘুনাথ-প্রসঙ্গে প্রেম-বিলাসে আছে :—

"হেন বৈরাগ্য রাধিকার প্রিয় কেবা আছে।
কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে॥"

কিন্তু মহাত্মা শিশির কুমারের "অমিয় নিমাই চরিতে" দেখি, "অনেকের মনে স, আমাদেরও ছিল যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরু রঘুনাথ দাস; কিন্তু একখানি িক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভু হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস।"

"যাহার সাধন রীতি কহিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥"

এবং ষড়্গোস্বামীর সকলকেই তিনি "এই ছয় গুরু শিক্ষা-গুরু যে" আ বলিয়া কোটি নমস্কার করিলেও, তন্মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দের পর শ্রীরূ শ্রীরঘুনাথদাসকেই তিনি ইষ্ট গুরুরূপে বিশেষিত করিয়া নিজ বি গ্রন্থের প্রত্যেক কবিতার শেষে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন।

"শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে করি আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"†

শ্রীবৃন্দাবনে রঘুনাথ গোস্বামীদিগের সকলের "মিত্র" বলিয়া স্বী হন। শ্রীজীব তাঁহার লঘুতোষিণীতে সেইভাবেই রঘুনাথের প দিয়াছেন। সনাতন তাঁহার পরিচয় কালে "গৌড়কায়স্থকুলাব্জ-ভ পরম ভাগবত" বলিয়াছেন। এইভাবে সেই মিত্রবর কায়স্থ হইে অপর পাঁচজন ব্রাহ্মণের মত, গোস্বামীপদারূঢ় বলিয়া গৃহীত হন। তাঁহার সন্তোষ-বিধানের জন্য হরিভক্তি-বিলাসাদি মহাগ্রন্থসকল লি হয় বলিয়া উল্লেখিত আছে। ভক্তির রাজ্যে জাতি-বিভাগ নাই, জ

অর্থাৎ কবিরাজ গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থ ন নাম দেন নাই। বিশেষতঃ শিষ্যটির নিজ উক্তিতেই যখন স্পষ্টভাবে রঘুনাথ দা গুরু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন দেখি, তখন আমাদের ধারণার পরিবর্তন হইল না। বিলাসের মতে রঘুনাথ "শ্রীল কবিরাজের ভাবাশ্রয় ভজনের গুরু।" "শ্রীমৎদাস গো (রসিকমোহন) ১৪১-২ পৃঃ।

† "কেহ কেহ বলেন এখানে সংক্ষেপে বলিবার জন্য শ্রীরূপকে আদি শ্রীরঘুনাথকে অন্ত করিয়া শিক্ষা গুরু ছয় গোস্বামীরই উল্লেখ করিয়াছেন, ে শ্রীরূপাদি ছয়কেই শিক্ষাগুরু বলিয়াছেন।" চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত শ্রী চরিতামৃতের সংস্করণ, আদি, ৭৮ পৃঃ।

রণে কাহারও জন্মান্তরের বা ইহজীবনের সুকৃতি মলিনীকৃত হয় না। অকৃত্রিম কঠোর ভজননিষ্ঠা তাঁহাকে সর্ব্বজন-বরণীয় করিয়াছিল। রঘুনাথ মহাপ্রভু-প্রদত্ত গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন শিলা লইয়া বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি নিত্য জল তুলসী দিয়া সেই শিলারই পূজা তেন; তিনি অন্য কোন বিগ্রহের সেবা-স্থাপন করিয়া যান নাই। শিলা-বিগ্রহের সম্পর্কে গোবর্দ্ধন গিরিই তাঁহার উপাস্য; স্বরূপের তে সেই স্থানে গিয়া জীবনপাত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং নি রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে কিছুকাল থাকিবার পর, কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে ইয়া গোবর্দ্ধন যাত্রা করিলেন।

ব্রজমণ্ডলে শৈলরাজ গোবর্দ্ধন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থল এবং ব্রজবাসীদের পরম াদরের ও ভক্তির বস্তু। প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার গোবর্দ্ধনের পূজা পরিক্রমণ না করিলে তাহাদের মনের সাধ মিটে না। একদা শ্রীকৃষ্ণ বাসীদের চিরাচরিত ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া, এই গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত য়াছিলেন। তখন সেই স্থানের অধিবাসীরা সপ্তাহকাল এই পর্ব্বতের বাস করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের র পরীক্ষা দেন। সেইদিন হইতেই এই পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের বিরাট হরূপে ভক্ত-হৃদয় জুড়িয়া আছেন; প্রাচীনকাল হইতে তুষার-মণ্ডিত চল যেরূপ রজত-ধবল শিবলিঙ্গরূপে হিন্দুর নিকট প্রকটিত, বৌদ্ধযুগে স্তূপগুলি যেমন বুদ্ধমূর্ত্তিরূপে পূজিত, গিরিরাজ গোবর্দ্ধনও সেইরূপ রূপে ভক্তানন্দবর্দ্ধন করেন। নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র যাত্রীরা গিরির পূজা, ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ মত অনুভব করেন। রঘুনাথ এই গিরিবরের চরণতলে পৌঁছিয়া, শিলাকে ইষ্টমূর্ত্তি ভাবিয়া নিত্যপূজা করিয়াছেন, সেই শৈলকে দেখিয়া ভক্তিরসে সমাপ্লুত হইলেন। যাহা কল্পনা ছিল, তাহা

আজ সংকল্পে পরিণত হইল। এই গিরির চরণে শরণ লইয়া জীবন শে
করিবার জন্ত তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এই উপলক্ষ্যে তি
"গোবর্দ্ধনাশ্রয়" ও "গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা" নামক অতি সুন্দর দুইটি স্তু
রচনা করেন।

গোবর্দ্ধন পাদদেশে রঘুনাথ, যেখানে একদিন শ্রীচৈতন্তদেব উপবেশ
করিয়া শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড নামক প্রাচীন তীর্থ সরোবরের মহিমা কীর্ত্ত
করিয়াছিলেন, যেস্থানেকে এখনও লোকে "উপবেশন-ঘাট" বলে, তাহার
অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। সনাতন গোস্বামী এসময়
খুব স্থবির, বেশী গতিবিধি করিতে পারেন না। তিনিও এই সময়
গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর মহাদেবের পার্শ্বে বৈঠান নামক স্থানে একান্তে বসি
ভজন সাধন করিতেন (১৩৫ পৃঃ)। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনে আসিবার প
স্নেহশ্রদ্ধার টানে একদিন তিনি রঘুনাথকে দেখিতে আসিলেন। দেখিলেন
বৃক্ষতলে পড়িয়া রঘুনাথ জপসাধনে সমাধিমগ্ন আছেন; চারিদিকে জঙ্গ
সেখানে সর্ব্বদাই ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণ চলাফেরা করে। সনাতন
দেশের সকলের পরিচিত, তাঁহাকে দেখিতে ব্রজবাসীরা দৌড়িয়া আসিল
সনাতন উহাদের সাহায্যে রঘুনাথের জন্ত একখানি ভজন-কুটীর বাঁধি
দিয়া গেলেন। সনাতনের শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া এই নবাগত ভক্তের প্রতি
সকলের দৃষ্টি পড়িল।

যেখানে রঘুনাথের কুটীর হইল, সেই স্থানের নাম আরিট গ্রাম
কথিত আছে, একদা অরিষ্ট নামক অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে মহ
উৎপাত আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই স্থানে বধ করিয়াছিলেন
তদবধি ঐ স্থানকে অরিষ্ট বা আরিট গ্রাম বলে। প্রবাদ এই, বৃষব
করেন বলিয়া শ্রীমতীর তিরস্কারে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতীর্থ-সলিলে স্নান করিতে
হয়, এজন্ত তিনি পদাঘাত করিয়া যেখানে সর্ব্বতীর্থজল আনয়ন করেন

তাহাই শ্যামকুণ্ড এবং ঐ কুণ্ডে স্নান করিবার সময় শ্রীমতী ও তাঁহার সখীগণ শাস্ত্র-বাক্যমতে যে স্থান হইতে মৃৎপিণ্ড উত্তোলন করিয়া পরজলাশয়ে বা শ্যামকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ স্নান করেন, সেই স্থানই রাধাকুণ্ডে পরিণত হয়। রাধার মহিমায় সংস্পর্শে রাধাকুণ্ড অতীব পবিত্রতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্রনাভ মথুরামণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল সমূহ প্রকটিত করিতে চেষ্টা করেন। তদবধি শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দুইটি সুন্দর সরোবররূপে আরিট গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করে। কালক্রমে উহারা মজিয়া নিম্নভূমি হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। শ্রীচৈতন্য উহাদের বার্ত্তা ব্রজবাসীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পান নাই। অবশেষে তিনি ধান্যক্ষেত্রের স্বল্পজলে স্নান করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য কুণ্ডদ্বয়ের স্থানের ইঙ্গিত করেন। রঘুনাথ আসিয়া সেই সব সংবাদ শুনিলেন, ধ্যান-নিরত হইয়া স্বীয় হৃদয়ে অনুভূতি করিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ সমূহের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া স্বপ্নাবেশে উত্তর পাইলেন। * তিনি কুণ্ডদ্বয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু

---

* ব্রজভূমির বৃক্ষগুলিও পূর্ব্বতন যুগের ভক্ত মানব বলিয়া বৈষ্ণবদিগের নিকট স্বীকৃত ও পূজিত হন। সে কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। আমাদের এই আধুনিক যুগেই বঙ্গের প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশের সুসন্তান সার জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং স্বকৃত যন্ত্র-সাহায্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষের মত বৃক্ষেরও প্রাণ আছে, তাহাদেরও রক্তের মত রস সঞ্চালন হয়, তাহারাও আহার করে, হাসে, কাঁদে ও নিদ্রা যায়, তাহারাও আঘাতে যন্ত্রণা পায়, জর্জ্জরিত হয়। হিন্দু-ভারতে সর্ব্বত্র মানব-বিগ্রহের মত মহামহীরূহ হইতে ক্ষুদ্র তরুপর্য্যন্ত দীর্ঘজীবী বৃক্ষসকলের রীতিমত পূজা হয়, তাহাদের উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদিগকে উল্লঙ্ঘন বা তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ করা পাপের কার্য্য বলিয়া শাস্ত্র-শাসন মানিতে হয়।

খনন কার্য্যের জন্য যে অর্থ-সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা তিনি কোথায় পাইবেন ? তাঁহার যাহা সাধ্য করিতে লাগিলেন, সজল নেত্রে ভগবানের নিকট এই লীলাকুণ্ড দুইটির আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা চলিতেছিল। ভক্তাধীন ভগবান কি সে প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া পারেন ? অচিরে এক ধনী ভক্ত তীর্থযাত্রায় বদরিকাশ্রম গিয়া বহু অর্থদিয়া শ্রীনারায়ণের চরণে প্রণাম করেন। রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, যেন কেহ তাঁহাকে বলিতেছেন "এই অর্থ লইয়া তুমি বৃন্দাবনে অরিষ্টগ্রামে যাও, সেখানে এক ভক্তচূড়ামণি রঘুনাথদাসকে দেখিতে পাইবে, তাহাকে বলিও এই অর্থদিয়া তিনি যেন শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করিয়া উহা জলপূর্ণ করেন।"* মহাজন তাহাই করিলেন। রঘুনাথ অর্থ পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন, ভগবানের দান মাথায় করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা কুণ্ডদ্বয়ের উদ্ধার সাধন করিলেন। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"

বাস্তবিকই তিনি ভক্ত প্রার্থীদিগের অভীষ্ট সামগ্রী নিজে বহন করিয়া দিয়া যান। অর্জ্জুন মিশ্র প্রভৃতি ভক্তের জীবনে দেখিতে পাই, শ্রীভগবান

বৃন্দাবনে যাহাতে কেহ বৃক্ষ না কাটে, তজ্জন্য বাদশাহের নিকট হইতে আদেশ পত্র লওয়া হয়, স্বাভাবিক ভাবে সে আদেশ যে এখনও পালিত হইতেছে, সে কথা স্থানান্তরে বলিয়াছি। (২২৮ পৃঃ) অধ্যাত্ম-জগতের উচ্চস্তরে অবস্থিত উন্নতচরিত্র ভক্তমানবের এই বিশ্বের সকল জীব বা পদার্থের সহিত স্বীয় হৃদয়যন্ত্র মিলাইয়া দিয়া যে তারবিহীন তাড়িত-যন্ত্রের মত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, গোস্বামীদিগের মত মহাভক্তগণ যে বৃন্দাবনের তরুরাজির হৃদয়ের কথা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিতে পারিতেন, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র মনে করি না। হিন্দুর জন্মান্তর-বাদে পরজন্মে নির্জ্জীব হওয়াত বটেই, বৃক্ষ বা পাষাণরূপে আবির্ভূত হওয়াও বিস্ময়ের বিষয় নহে। শ্যামকুণ্ডের উত্তর কূলবর্ত্তী পাঁচটি বৃক্ষ পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া রঘুনাথের নিকট আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।

* রসিকমোহন কৃত "শ্রীমৎ দাস গোস্বামী", ১৩০-৪ পৃঃ

ভক্তকে তাহার অভীষ্ট শুধু প্রদান করেন না, নিজে বহন করিয়া আনিয়া গৃহে পৌছাইয়া দেন। রঘুনাথের বেলায়ও তাহাই হইল। একান্ত প্রার্থনার শক্তিই এইরূপ; এই শক্তির বলে পাশ্চাত্য দেশেও বহুজন-হিতকর বিরাট প্রতিষ্ঠান সমূহ মহাপ্রাণ ব্যক্তিদিগের অযাচিত দানের বলে চলিতেছে।

কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার কার্য্য স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হইল। শ্যামকুণ্ডের মধ্যস্থলে বজ্রনাভ নিজনামে একটি পৃথক্ কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন, রঘুনাথের তত্ত্বাবধানে যখন খনন কার্য্য চলিতেছিল, তখন বজ্রনাভ কুণ্ডের আবিষ্কার হওয়ায় শ্যামকুণ্ডের পরিচয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। কিছুকাল পরে কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাধাকুণ্ডেরও খনন কার্য্যশেষ হইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। এখনও প্রতিবৎসর ঐ তিথিতে উৎসব হয়। রাধাকুণ্ডের পশ্চিমদিকের গ্রামখানির নাম রাধাকুণ্ড। এই জন্য রঘুনাথ "রাধাকুণ্ডের রঘুনাথ" বা "দাস-গোস্বামী" বলিয়া খ্যাত হন। কুণ্ডদ্বয় যখন জলপূর্ণ হইল, তখন চতুর্দ্দিকে সংবাদ রটিল, অমনি লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া দুইটি সরোবরে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে লাগিলেন। তাহারা নবাগত রঘুনাথকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া ও ধন্যবাদ দিয়া সেই সাধক ভক্তের যশোরাশি ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত করিয়া দিলেন।

রাধাকুণ্ড হইতে শ্যামকুণ্ড একটু দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত হইলেও উভয়কে পাশাপাশি বলা যায় এবং উভয়ের পরস্পর সংযোগ আছে। শ্যামকুণ্ডের উত্তরতীরস্থ স্থান রাধাকুণ্ডের উত্তরাংশের ঠিক পূর্ব্বগায়ে সন্নিবিষ্ট। ঐ স্থানে, শ্যামকুণ্ডের কূল হইতে অনতিদূরে রঘুনাথের ভজন কুটীর নির্ম্মিত হয়। তদীয় শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীর উহারই উত্তরভাগে সংস্থিত। শ্যামকুণ্ডের উত্তরকূলের ঘাটের নাম

পঞ্চপাণ্ডবঘাট, কারণ ঘাটের উপরিস্থিত পাঁচটি বড় বৃক্ষ রঘুনাথের নিকট আপনাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। এই বৃক্ষগুলির একটু উত্তর-পশ্চিম কোণে রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস ও ভূগর্ভ গোস্বামীর চিতা সমাধি একত্রযোগে বিরাজিত।*

কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারকার্য্য সাধিত হইলে, সমগ্র রাধাকুণ্ডই একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হইল। এবং চারিদিকে অসংখ্য ভক্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দির, কুঞ্জ বা ভজন-কুটুরী স্থাপিত হইতে লাগিল। কূলে কূলে কত বিগ্রহের নামে ঘাট নির্ম্মিত হইল, এবং সন্নিকটে রাধাবল্লভ রাধাবিনোদ, মদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মিত হইল। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী ইঁহাদেরও পৃথক্ পৃথক্ ভজন-কুটুরী ছিল। শুধু কুণ্ডেশ্বর মহাদেব নহেন, আরও ছয়টি মহাদেবের মন্দির চারিদিকে স্থাপিত আছে। রঘুনাথের সাধনা-গৌরবে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে সকল ভক্তেরা তাঁহার সান্নিধ্য কামনা করিয়া এইস্থানে আসিয়া স্বীয় স্বীয় ইষ্টভজনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতেন। রঘুনাথ আসিয়া রাধাকুণ্ডকে দ্বিতীয় বৃন্দাবন করিয়া তুলিলেন।

আর সেই দ্বিতীয় বৃন্দাবনের নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া রঘুনাথ পাষাণের রেখার মত অক্ষুণ্ণভাবে নিজের প্রাত্যহিক সাধনভজনের নিয়মিত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস এইভাবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

"সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম॥

---

* শ্রীব্রজমোহন দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত "ব্রজদর্পণ" ১৬-২৮ পৃঃ
কবিরাজ গোস্বামীর কুটুরীর পূর্ব্বভাগে একটি বৃক্ষ প্রসিদ্ধ ভক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট "কাশীবাসী" ব্রাহ্মণ বলিয়া আপন পরিচয় দেন।

রাধাকুণ্ডে

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি মন্দির।

৩৪৬ পৃঃ

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন ॥
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ *
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান ॥ †
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে ॥"

চৈ, চ, আদি, ১০ম।

অর্থাৎ তিনি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করিতেন। শতবার জপের পর এক এক বার প্রণাম করিতেন বলিয়া মোট সহস্র বার প্রণাম করা হইত; তিনি পূর্ব্বদৃষ্ট বা শ্রুত দুই সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশে প্রণাম করিতেন। এইরূপ জপ প্রণতির সংখ্যা পূরণ ত হইতই, তৎসঙ্গে ভক্তির আবেশে তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির মানস পূজা করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে এই উভয়ের সম্মিলিত মূর্ত্তিই শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁহাতে রসরাজ কৃষ্ণ এবং মহাভাব (হ্লাদিনী শক্তি রাধা) এই উভয়ের একাত্মভাব হইয়াছে। এজন্য রঘুনাথ ধ্যানে যেমন রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি সেবা করিতেন, নিজের জীবন্ত স্মৃতিতে সেইরূপ প্রহরেক কাল গৌরাঙ্গদেবের লীলার কথা চিন্তা করিয়া রসাস্বাদন করিতেন। সাধন-মার্গে অগ্রসর হইয়া বৈষ্ণব সাধকেরা পূর্ব্ব লীলার এক এক সখীর ভাবাভিনয় করিয়া রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপের সেবা করিতেন। এই ভাবে রঘুনাথের পরিচয় হইয়াছিল, রতিমঞ্জরী বা

---

* পাঠান্তর "চরিত্র-চিন্তন"।

† এই শ্লোকে দুইটি পাঠান্তর আছে; "আপতিত" স্থলে "অপতি" অর্থাৎ অবগাহন স্নান না করিয়া কূল হইতে জলক্ষেপ করিয়া পরিশুদ্ধি। বর্ণনার ভাবে কিন্তু অবগাহন স্নানই বোধ হয়। দ্বিতীয় পংক্তিতে "দান" স্থলে "মান"। উহাতে অর্থ আরও ভাল হয়। শুধু আলিঙ্গন নহে, সকলকে যথোপযুক্ত প্রণামাদি করিতেন।

রসমঞ্জরী সখী। মঞ্জরী নামক অন্তরঙ্গ সখীগণ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে যুগলরূপের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব সাধকেরাও তাহাই করিতেন। দাস্যসখ্যাদি যেভাবেই ভগবানের সেবা করা যায়, তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মাহুতি দেওয়া হয় না। মধুর রসই সকল রসের চরমোৎকর্ষ। ইহারই অপর নাম শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস। স্ত্রী যেমন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে পতি-সেবায় উৎসৃষ্ট করিতে পারেন, দাসীভাবে সখীভাবে সর্ব্বদা আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে পতির উপভোগের সামগ্রী করিতে পারেন, এমন আর কেহ পারে না। এইভাবে আপনাকে স্ত্রীরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়া ভগবানকে পতিরূপে সেবা করাই ভক্তমাত্রের চরম সাধনা। বৈষ্ণব-ভক্তের মতে এই ব্রহ্মাণ্ডে পুরুষ মাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; জীবমাত্রই তাঁহার উপভোগের পদার্থ, পতিপরায়ণা রমণী তুল্য। মীরা বাঈ একদা বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ গোস্বামীকে এই কথাই শুনাইয়া দিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর পুরুষ কে আছে? এজন্য শাঙ্করিক অদ্বৈতবাদে বলে "আমিই ঈশ্বর, আমিই শিব," অর্থাৎ জীবকে শিবতুল্য বলিয়া কল্পনা করিতে দেয়, তাহা বৈষ্ণব মতের একান্ত বিরোধী। বৈষ্ণবেরা শাঙ্করিক মতে বেদান্তাদির ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত কর্ণে শ্রবণ করিতে চান না।

নিজকে সখী কল্পনা করিয়া পতিভাবে ভগবৎ সেবাকেই বলে অন্তরঙ্গ সেবা। স্বরূপ দামোদর তাঁহার প্রিয়শিষ্য রঘুনাথকে যোগাচারে অভ্যস্ত করিয়া প্রত্যক্ষভাবে নানা নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া এইরূপ মানস-সেবার অধিকারী করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট এই বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম উপদেশ পাইলেন। পরে রাধা কুণ্ডের তীরে বসিয়া আমরণ কঠোর নিয়মে সেই সব শিক্ষানুসারে সাধন ভজন করিতেন। তিনি ললিতার দাসীরূপে সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণ সেবায় বিভোর থাকিতেন। এইজন্য প্রেম-বিলাসে আছে,

"শৃঙ্গারে ললিত রসে অধিক নিপুণ।
নিশিদিনি সহায় করে ললিতার গুণ॥" *

প্রে, বি, ১৮শ।

তিনি যে পুরুষ তাহা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বদা দাসীভাবে শ্রীরাধার কৃপাপ্রার্থী হইতেন।

"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকে॥"

"ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং স্মরামি রাধাং মধুরস্মিতাস্যাং
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং, ততোমমান্যাস্তি গতি র্ন কাঽপি।"

এইভাবে তাঁহার মুখ হইতে সুললিত সংস্কৃত ছন্দে বহুসংখ্যক এইরূপ বিলাপসূচক স্তব নির্গত হয়। ঐ স্তবের মধ্যে তাঁহার সেই দাসীভাব, দাসীরূপে শ্রীমতীকে সাজাইবার, সেবা করিবার কথা, শ্রীরাধার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, ও ক্রোধে ক্রোধের উদ্রেক হইবার কথা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত দেখা যায়।

রঘুনাথ বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ বা বিরহদশায় তাঁহার সখীগণ যেভাবে তাঁহার প্রতি সমদুঃখিনী হইয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করিতেন, রঘুনাথও অন্তর্দ্দশায় সেইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। সে সময়ে কেহ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলে, তাঁহার আত্মবিস্মৃত ভাবের উত্তর হইতে উহা বুঝা যাইত। এই অবস্থার কথাই "ভক্তমালে" আছে—

"আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥"

* "তন্মানভঙ্গ বিষয়ে সদয়ে জনোঽয়ং॥
ব্যগ্রঃপতিষ্যতি কদা ললিতা পদান্তে"॥ বিলাসকুসুমাঞ্জলিস্তোত্র।

রূপগোস্বামী ললিত-মাধব নাটক রচনা করিয়া রঘুনাথকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলম্ভ লীলা অতি বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রঘুনাথ সে পুস্তক পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন। এই জন্ম তাঁহার সন্তোষ-বিধানের উদ্দেশ্তে শ্রীরূপ ব্যগ্রতা সহকারে "দানকেলি-কৌমুদী" নামক ভাণিকা প্রণয়ন করিয়া তাঁহার করে অর্পণ করেন (১৯০ পৃঃ)। প্রতিষেধক ঔষধের মত উহাতে পূর্ব্ব উপদ্রবের নাশ হইল, পুস্তক পাইয়া রঘুনাথ সুস্থ ও সুখী হইলেন। শ্রীরূপ গ্রন্থারম্ভ ও উপসংহারের আশীর্ব্বচনে এই কথার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন।

একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলে, তাঁহার তপঃ-প্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই সাধকের জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তাঁহারা যেন স্থির হইতে পারেন না। একজনের জন্ম সমগ্র দেশ উন্মুখ হয়, ধন্ম হয়, পূণ্যময় হয়। সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে সকলের প্রাণে এক নূতন ভাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। রূপ সনাতন যত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্ততা ভুলিয়া সময়ে সময়ে ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন; গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও ভূগর্ভ গোস্বামী তাঁহার নিকটেই ভজন-কুটিরে থাকিতেন; শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা যে যখন শ্রীধামে আসিতেন, রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্ম ব্যাকুল হইতেন। শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা মাতা এই প্রিয়ভক্ত শিষ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া রাধাকুণ্ডে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, এখনও রাধাকুণ্ডের উত্তর-তীরে জাহ্নবাঘাট বর্ত্তমান। দৈন্তাবতার রঘুনাথ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাতাকে বলিয়াছিলেন,

"বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাঁসো লাজভয়।
কিগুণে চৈতন্য-পদ দিবেন অভয়॥
একদিন না করিনু চরণ-সেবন।
তথাপি চরণ মাঁগো হেন দীনজন॥
জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি।
দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥"

প্রে, বি. ১৬শ বিলাস।

রঘুনাথের সাধনের সাধ আর মিটে না। ঠাকুরাণী তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জাহ্নবা দেবীর সে অশ্রুজল বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা জাহ্নবীর মত রঘুনাথের সকল জন্মজ্বালা নাশ করিয়াছিল।

রঘুনাথের প্রাণের আবেগ তাঁহার রচনায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থ লিখিবার জন্য তাঁহার রচনা নহে, সাধন ভজনে যখন তিনি মাতোয়ারা থাকেন, তখন তাঁহার প্রাণের কবাট খুলিয়া যাইত, অন্তরের উচ্ছ্বাস তাঁহার পাণ্ডিত্যের সাহায্য লইয়া সুললিত স্তবরাজিতে আত্মপ্রকাশ করিত। রঘুনাথের তিনখানি গ্রন্থকে * গ্রন্থ না বলিয়া তাঁহার স্তব ও ভাব-সংগ্রহ মাত্র বলা যাইতে পারে। উহার মধ্যে স্তবাবলীতে ২৯টি স্তব আছে, সবগুলি সুন্দর সংস্কৃতে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় তিনি সুপাণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও গোবর্দ্ধন উপলক্ষ্যে তাঁহার কবিত্বপূর্ণ স্তবের কথা বলিয়াছি;

* "রঘুনাথ গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়॥
শ্রীদাম-চরিত মুক্তা-চরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর॥ ভ, র, ১ম, ৫৯ পৃঃ

অবশিষ্টগুলিতে তাঁহার বিলাপ, প্রার্থনা, সংকল্প ও উৎকণ্ঠার অতি স্বচ্ছ সরল সুন্দর বর্ণনাই আছে। দৈন্যের সুরে অকপট ভাবে হৃদয় দ্রব করিয়া স্তবলহরী কিরূপে নিঃসৃত হইতে পারে, রঘুনাথের ভাষায় তাহার অতুলনীয় আভাষ পাই। রঘুনাথের কতকগুলি বাঙ্গালা পদও। অনেকগুলি বোধহয় বিলুপ্ত হইয়াছে, দুই চারিটি এখনও পাওয়া যায়। *

রঘুনাথ নীলাচলে থাকিয়া আহার বিষয়ে যেরূপ কঠোর সংযম সাধন করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোন প্রকারে সাধন-জীবন রক্ষার নিমিত্ত তিনি অন্নপান গ্রহণ করিতেন, ক্ষুধাতৃষ্ণার কোন প্রভুত্ব ছিল না। মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পর তিনি অন্নও ত্যাগ করিলেন, ফল আর গব্য খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেন। বৃন্দাবনে আসিয়া ব্রজফল খাইতেন বটে, কিন্তু গব্যের মধ্যে অল্প পরিমাণ ঘোলই তাঁহার পানীয় ছিল। চরিতামৃতে আছে :—

"অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥" † আদি ১০ম

রাধাকুণ্ডতটে আসিয়াও এইরূপ আহারে দিন যাইত। সাধন ভজনেই যাইত দিবার ৫৬ দণ্ড, বাকী মাত্র চারি দণ্ডে আহার নিদ্রা শৌচাদি সব সারিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত অন্য একটি ব্রজবাসী ভক্ত সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সুযোগ মত পাতের দোনায় করিয়া মাঠা আনিয়া মুখের কাছে ধরিতেন, কিন্তু তিনি অনেক সময় অন্তর্দ্দশায় এমন বিহ্বল থাকিতেন, যে কি খাইতেছেন তাহারও জ্ঞান

* পরমভক্ত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় স্বরচিত "শ্রীমৎ-দাস গোস্বামী" পুস্তকে অনেক সংস্কৃত স্তব অনুবাদ সহ বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, তিনি রঘুনাথের দুই তিনটি বাঙ্গালা পদও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† আট তোলায় এক পল হয়, সুতরাং ঘোলের পরিমাণও বড় বেশী হইলে আধসের মাত্র কল্পনা করিতে পারি।

থাকিত না। এই ভাবে তাঁহার প্রায় ২০ বৎসর গেল; এমন সময়ে সনাতন অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার শোকে রঘুনাথ এমন কাতর হইয়া পড়িলেন যে, কিছুদিন খাদ্য ত্যাগ করিয়া শুধু জলপানে জীবন রাখিয়া ছিলেন। কিছুদিন পরে রূপের অন্তর্ধানে তাঁহার হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া গেল, কয়েকদিন জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া নেত্র-জল নিক্ষেপ করিলেন। এই তীব্র কঠোরতায় কি ভাবে এই দীর্ঘজীবী সাধকের জীবন রক্ষা হইত, তাহা আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞান-পরিধির বাহিরে। রূপসনাতন অগ্রে যাত্রা করিলে, তাঁহার প্রাণ আর দেহে থাকে কেন বলিয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেন। ক্রমে ক্রমে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইতেছিল, অস্থি-চর্ম্মসার দেহ-যষ্টি যেন বাতাসে হেলিয়া পড়িত, কিন্তু তবুও সাধন-ক্রিয়ার নিয়মের ব্যত্যয় হইত না। দুই চারিদিনে একবার কিছু খাইতেন।

"অতিক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারিদিনে ॥
যদ্যপিও শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ-ক্রিয়া সব সমাপয়;
নিয়ম-নির্ব্বাহ যৈছে যে চেষ্টা অন্তরে।
সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে ॥"

ভ, র, ৬ষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ।

দেখিতে কেন, ভাবিতে গেলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। যাহা হউক শোকাবেগ ক্রমে উপশান্ত হইল। ক্রমে আরও ২৫।২৬ বৎসর চলিয়া গেল। শ্রীভগবানের আরতির সেই জীবন-প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতে লাগিল। কৃষ্ণদাস তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া চরিতামৃত লিখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রভুর কথা অতি সংযত সংক্ষেপে সরল সত্যনিষ্ঠ তুলিকায় যেভাবে আঁকিলেন, অন্য কোন শিল্পীর পক্ষে

তাহা অসাধ্য। শেষে বিষ্ণুপুর হইতে গ্রন্থ-চুরির সংবাদ আসিল, জরাতুর ও নানারোগগ্রস্ত কৃষ্ণদাস সে শোক সহিতে না পারিয়া একদিন রাধাকুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিলেন; তখন রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার উত্তোলিত অচেতন দেহ কোলে লইয়া পুত্রশোকাক্রান্ত পিতার মত কত যে বিলাপ করিলেন, তাহাতে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। যাঁহারা সংসারের সর্ব্ববিধ পাশমুক্ত, তাঁহারা যে এমন স্নেহে গলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বপ্রেম এইরূপ বিলাপ ও অশ্রুধারা দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়! কর্ণানন্দ গ্রন্থে যাহাই বর্ণিত থাকুক, সম্ভবতঃ এই সময়েই গুরুদেবের কোলে শুইয়া কবিরাজ গোস্বামী স্বেচ্ছায় মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন। ইহার পর আর রঘুনাথ অধিকদিন ধরাধামে ছিলেন না। তাঁহার বয়স এক্ষণে প্রায় ৯০ বৎসর। জীবন-প্রদীপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র স্নেহও অবশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা নিভিয়া যায় নাই। সম্বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৫০৫ শকের আশ্বিনী শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে রঘুনাথ রাধাকুণ্ড-তটে পড়িয়া রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে, শ্রীরাধাচরণে স্থান লাভ করিলেন। শেষ দৃশ্য এইরূপ:—

"রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, নেত্রে প্রেম-অশ্রু পড়ে,
রাধাপদ করয়ে স্মরণ।"*

এখনও প্রতি বৎসর রাধাকুণ্ডে ঐ তিথিতে রঘুনাথের সমাধি-মন্দিরের সন্নিকটে তাঁহার তিরোধান উৎসব হয়। তাঁহার নিত্যপূজিত গোবর্দ্ধন শিলাটি এক্ষণে বৃন্দাবনে ৺ রাধাবিনোদ-মন্দিরে সম্পূজিত হইতেছেন।

সমাপ্ত

* বিদ্যাভূষণ মহোদয় একখানি হস্তলিখিত সূচক-গ্রন্থ হইতে এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সপ্ত গোস্বামী

-:০:-

সময়ের নির্ঘণ্ট

শক	খৃষ্টীয়	বিষয়
১৩৫৬	(১৪৩৪)	শ্রীহট্ট-লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম।
১৩৭২	(১৪৫০)	খুলনা-বুড়নের অন্তর্গত কলাগাছি গ্রামে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্ম।
১৩৮৭	(১৪৬৫)	বাকলায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর জন্ম।
১৩৯০	(১৪৬৮)	হরিদাস ঠাকুরের গৃহত্যাগ।
১৩৯২	(১৪৭০)	বাকলায় শ্রীরূপ গোস্বামীর জন্ম।
১৩৯৫	(১৪৭৩)	বীরভূমের অন্তর্গত একচক্রা গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম।
ঐ	ঐ	বাকলায় রূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভ বা অনুপমের জন্ম।
১৪০৫	(১৪৮৩)	যশোহর-তালখড়ি গ্রামে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর জন্ম।
ঐ	ঐ	শ্রীসনাতন গৌড়-রাজমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৪০৭—ফাল্গুনী পূর্ণিমা (১৪৮৬—১৮ই ফেব্রুয়ারী)—নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্ম।

শক	খৃষ্টীয়	বিষয়
১৪১৪	(১৪৯২)	শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের এবং শ্রীহট্ট-লাউড়ে অদ্বৈত-শিষ্য ঈশান নাগরের জন্ম।

শক	খৃষ্টীয়	বিষয়
১৪১৫	(১৪৯৩)	হুসেন শাহ গৌড়ের বাদশাহ হন।
১৪১৬	(১৪৯৪)	সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্ম।
১৪২২	(১৫০০)	শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেলগুণ্ডী গ্রামে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর জন্ম।
১৪২৫-৬	(১৫০৩-৪)	শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ। লোকনাথ, তপনমিশ্র ও পুরুষোত্তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১৪২৬	(১৫০৪)	গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাগ্রহণ
১৪২৭	(১৫০৫)	কাশীধামে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর জন্ম।
১৪৩০	(১৫০৮)	নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ।
১৪৩১	(১৫০৯-১০)	শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর গৃহত্যাগ, নবদ্বীপে আগমন ও বৃন্দাবন যাত্রা।
১৪৩১	(১৫১০)	কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণ, শান্তিপুরে রঘুনাথ দাসের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের নীলাচল যাত্রা।
১৪৩২-৩	(১৫১০-১২)	শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ ও শ্রীগোপাল ভট্টের প্রতি কৃপা।
১৪৩৩	(১৫১১)	রামকেলিতে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম।
১৪৩৫-৩৬	(১৫১৩-১৪)	শ্রীচৈতন্যের গৌড়-রামকেলি ও শান্তিপুর ভ্রমণ, রূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ এবং রঘুনাথ দাসের সহিত দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ ও উপদেশ দান।

শক খৃষ্টীয় বিষয়

১৪৩৬ (১৫১৪) শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন যাত্রা ও শ্রীরূপ গোস্বামীর গৃহত্যাগ।

১৪৩৭ (১৫১৫) শ্রীসনাতনের গৃহত্যাগ। প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপের সাক্ষাৎ ও দীক্ষা, কাশীধামে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীসনাতনের সাক্ষাৎ ও দীক্ষালাভ।

১৪৩৭ (১৫১৬) শ্রীসনাতনের বৃন্দাবন যাত্রা; শ্রীমহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন; শ্রীরূপের গৌড়ে গমন ও বল্লভের গঙ্গাপ্রাপ্তি।

১৪৩৯ (১৫১৭) শ্রীরূপের নীলাচলে গমন ও অবস্থিতি। বর্দ্ধমান ঝামটপুরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম। পানিহাটিতে "দণ্ড-মহোৎসব" ও রঘুনাথের গৃহত্যাগ।

১৪৪০ (১৫১৮) শ্রীসনাতনের নীলাচলে গমন। চাকন্দি গ্রামে শ্রীনিবাসের জন্ম।

১৪৪০ (১৫১৯) শ্রীসনাতনের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন ও শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎ।

১৪৪৫ (১৫২৩) বর্দ্ধমান-কোগ্রামে শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের জন্ম।

১৪৪৭ (১৫২৫) নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের মহাপ্রস্থান।

১৪৫২ (১৫৩০) শ্রীজীবের নবদ্বীপে আগমন, শ্রীনিত্যানন্দ সহ সাক্ষাৎ ও কাশীযাত্রা।

১৪৫৩ (১৫৩১) শ্রীগোপাল ভট্টের বৃন্দাবনে আগমন।

১৪৫৪ (১৫৩২) শ্রীরূপের ইষ্টবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজীর আবিষ্কার ও শ্রীরূপ কৃত "বিদগ্ধ মাধব" নাটক সমাপ্তি।

১৪৫৫ (১৫৩৩) আষাঢ় মাসে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট। শ্রীরঘুনাথ দাসের বৃন্দাবনে আগমন।

শক	খৃষ্টীয়	বিষয়
১৪৫৫	(১৫৩৪)	শ্রীসনাতন কর্তৃক শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও সেবা-স্থাপন।
১৪৫৬	(১৫৩৪)	শ্রীগোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠা।
১৪৫৭	(১৫৩৫)	শ্রীজীবের বৃন্দাবনে আগমন।
ঐ	ঐ	কুমারহট্টে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম।
১৪৫৯	(১৫৩৭)	শ্রীরূপ কৃত "ললিত মাধব" নাটক সমাপ্তি।
১৪৬২	(১৫৪০)	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান।
১৪৬৩	(১৫৪১)	শ্রীরূপ কৃত "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু" গ্রন্থ সমাপ্তি। খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্তর্দ্ধান।
১৪৬৪	(১৫৪২)	শ্রীগোপাল ভট্ট কর্তৃক শ্রীরাধারমণ বিগ্রহের এবং শ্রীজীব কর্তৃক শ্রীরাধা-দামোদর বিগ্রহের সেবারম্ভ।
১৪৭২	(১৫৫০)	শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অন্তর্দ্ধান।
১৪৭৬	(১৫৫৪)	শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীরূপের অন্তর্দ্ধান। শ্রীসনাতন কৃত "বৈষ্ণবতোষণী" টীকা সমাপ্তি।
১৪৭৬-৮	(১৫৫৪-৬)	শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দের বৃন্দাবনে আগমন।
১৪৯০	(১৫৬৮)	শ্রীহট্ট-লাউড়ে ঈশান নাগর কৃত "শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ সমাপ্তি।
১৪৯৭	(১৫৭৫)	শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরকৃত "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" ও শ্রীলোচন দাস কৃত "শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থ রচনা।
১৫০০	(১৫৭৮)	শ্রীজীব কৃত "লঘু তোষণী" টীকা সমাপ্তি।
১৫০৩	(১৫৮১)	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ সমাপ্তি।

শক খৃষ্টীয় বিষয়

১৫০৪ (১৫৮২) শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গে শ্রীজীব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-গ্রন্থসমূহ বঙ্গদেশে প্রেরণ, বিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরি ও উহার উদ্ধার; বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব দীক্ষা; রাধাকুণ্ড তীরে কবিরাজ গোস্বামীর দেহত্যাগ।

১৫০৪ (১৫৮৩) খেতরীর মহোৎসব।

১৫০৫ (১৫৮৩) রাধাকুণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব।

১৫০৬-১০ (১৫৮৩-৮৮) মধ্যে কোন সময়ে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৫১০ (১৫৮৮) শ্রীজীব কৃত "গোপাল-চম্পূ" গ্রন্থ সমাপ্তি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোধান।

১৫১২ (১৫৯০) মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ।

১৫১৮ (১৫৯৬) শ্রীজীবের অন্তর্দ্ধান।

১৫২২ (১৬০০) "প্রেম-বিলাস" গ্রন্থ রচনা।

১৫২৯ (১৬০৭) যদুনন্দন দাস কৃত "কর্ণানন্দ" গ্রন্থ রচনা!

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত

গ্রন্থাবলী

১। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড

আদিযুগ হইতে পাঠান আমলের শেষ পর্য্যন্ত উভয় জেলার বিস্তৃত ইতিহাস ও সুন্দরবনের বিবরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ) মূল্য ৪৲ টাকা।

২। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড

মোগল ও ইংরেজ আমলের সম্পূর্ণ ইতিহাস। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম রায়ের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত। প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৭২ খানি ছবি ও ৩ খানি ম্যাপ সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ৬৲ টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

৩। প্রতাপসিংহ

অর্থাৎ মিবারাধিপতি মহারাণা প্রতাপ-সিংহের জীবনবৃত্ত। সচিত্র বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা।

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী।
৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

হয় নাই। ফলতঃ কি ভক্ত, কি সৎসাহিত্যানুরক্ত সকলেরই কাছে এখানি আদৃত হইবে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—

"হরিদাস ঠাকুর পাইয়া পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছি এবং পদে পদে আপনার ভাষা, ভাব ও রচনারীতিতে মুগ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিতেছি। আমি প্রথমতঃ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছি যে, আপনি এই পুস্তকে ভক্তি ও ভক্তের মহিমা পরিস্ফুট করিতে যাইয়া সর্ব্বত্রই ভক্তের সেইভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন, নিজের বিশ্বাসের মধুময় ভাবের দ্বারা ঐ ভাবকে পদে পদে অপূর্ব্ব মধুর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ভক্ত ব্যতীত আর কেহই এমনভাবে ভক্তের ঐ ভাব পরিস্ফুট করিতে পারেন না।"

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—

(Amrita Bazar Patrika) we are pleased to note that the style and diction of this book are chaste and elegant and the mode of delineation of character is just in keeping with the tone and tenor to be found in such original works as "Chaitanya Bhagabat" and Chaitanya Charitamrita on which the book is wholly based."

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ-পত্রিকা—

"শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত না হইলেও তাঁহার প্রকৃত বৈষ্ণবতার অভাব নাই। তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব-ইতিহাস ও বৈষ্ণবতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি একজন ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হইলেও তাঁহার প্রাণটি ভক্তি-রসে আপ্লুত এবং ভক্তচরিতানুশীলনে তাহার পরম প্রীতিই লক্ষিত হইল। তিনি প্রতাপসিংহের জীবনী লেখক আবার হরিদাস